পাঞ্চজন্য

গজেন্দ্রকুমার মিত্র



পাঞ্চজন্য

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

ষষ্ঠ মুদ্রণ, মাঘ ১৩৮৭

সপ্তম মুদ্রণ ভাদ্র ১৩৮৮

আঠারো টাকা

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে এস. এন.
রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও সুব্রত প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা ৯ হইতে আর. রায় কর্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের

পরম পূজনীয় স্বামী শিবস্বরূপানন্দ

ও

এই গ্রন্থের 'কথাসাহিত্য' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশকালে যেসব অগণিত পাঠিকা ও পাঠক আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে উৎসাহিত করেছেন—সকৃতজ্ঞ নমস্কারের সঙ্গে তাঁদের সকলকে।

॥ লেখকের অন্যান্য বই ॥

কলকাতার কাছেই
উপকণ্ঠে
পৌষ-ফাগুনের পালা
বহ্নিবন্যা
শুভ-বিবাহ কথা
রাত্রির তপস্যা
মনে ছিল আশা
জন্মেছি এই দেশে
একদা কী করিয়া
তব দক্ষিণপাণি
রজনীগন্ধা
স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্
নারী ও নিয়তি
পৃথিবীর ইতিহাস
পুরুষ ও রমণী
জ্যোতিষী
মালাচন্দন
কেতকীবন
নববধূ
মিলনান্ত
জীবন আরো বড়
বাহির-বিশ্ব
স্বপ্নসন্ধ্যা
বিধিলিপি (নাটক)
আনারকলি (নাটক)
শ্রেষ্ঠ গল্প
নীলকণ্ঠী
কিশোর গ্রন্থাবলী
কঠিন মায়া
পাও নাই পরিচয়

আদি আছে অন্ত নেই
তিনে একে চার
ছোট বড় ও মাঝারি
হায়নার দাঁত
কথা কল্পনা কাহিনী
সাধুসঙ্গ
তৃতীয় রিপু
চুনী হল রাঙা
সুখে থাকার কাল

বজ্রে বাজে বাঁশী
এক প্রহরের খেলা
দহন ও দীপ্তি
সমুদ্রের চূড়া
ভাড়াটে বাড়ী
স্মরণীয় দিন
যোগাযোগ
জীবন-স্বপ্ন
প্রভাত সূর্য
প্রেরণা
ছুটি
আবছায়া
রাত্রির সীমানা
জায়া নয় দয়িতা
হে নিরুপমা
রক্তকমল
কোলাহল
চাঁদমালা
তিন-সঙ্গিনী
নবজন্ম
গল্প-পঞ্চাশৎ
বিজয়িনী
দেহ-দেউল
স্বপ্ন আমার জোনাকি
আকাশ-লিপি
রূপ-তরঙ্গিমা
পূর্বপুরুষ
আকাশের আয়না
আকাশের সীমা নাই
সেই রাজা সেই রাণী

মুখবন্ধ

মহাভারতের তথা শ্রীকৃষ্ণের কাল একালের থেকে অন্যরকম ছিল তা মনে করার কোন কারণ নেই। শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে বলেছেন—"যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত/অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥" সেই তিনি যখন ঐ কালে জন্মেছিলেন এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের তিনিই একরকম প্রধান নায়ক—তখন বুঝতে হবে যে ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান ভালরকমই ঘটেছিল, পৃথিবীর মানুষ অত্যাচারে অবিচারে দুঃখে কষ্টে 'ত্রাহি' 'ত্রাহি' করছিল। নইলে যাকে "ভগবান স্বয়ম্" বলা হয় তিনি অবতীর্ণ হবেন কেন ?

বস্তুত ভারতেতিহাসের কাল চিরকালই ঐ কাল। লোভ, অসূয়া, পরশ্রী-কাতরতা, দ্বেষ, হিংসা, কলহ, চণ্ডাল-ক্রোধ, শূন্যগর্ভ অহঙ্কার এবং আত্মনাশা বুদ্ধি—এই কি ভারত-ইতিহাসের সামগ্রিক ফলশ্রুতি নয় ?

এ অবস্থা থেকে ভারতকে রক্ষা করতে অনেকেই চেষ্টা করেছেন। সে অসাধ্যসাধনের প্রয়াস পেয়েছেন কেউ ধর্মের পথে, কেউ বা শৌর্যের পথে—অর্থাৎ গায়ের জোরে।

বাহুবলে সাম্রাজ্য স্থাপন করে বাইরে-থেকে-চাপিয়ে-দেওয়া কৃত্রিম একতায় আত্মতৃপ্তি লাভ করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণও কি ভারতকে তার পঙ্কশয্যা থেকে, নিত্য আত্মাবমাননা থেকে উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন সম্ভোগমত্ত মদগর্বিত কলহপরায়ণ মাৎস্যন্যায়ধর্মী নির্বোধ বিকৃত ক্ষাত্রশক্তির দূষিত অধীনতা দূর করে শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন সৎ মানুষের হাতে দেশের ভার তুলে দিতে, চেয়েছিলেন জনসাধারণের মনে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করতে ?

সেই জন্যেই কি নিকটাত্মীয়ের কারাগারে তাঁর জন্মগ্রহণ করা, সামান্য গোপালকদের গৃহে লালিত-পালিত হওয়া, একক শক্তিতে কংস বধ করে নিপীড়িত জনসাধারণের মনে আশ্বাস ও আশার সঞ্চার করা ?

সেই প্রশ্নেরই উত্তর সংগ্রহের চেষ্টা করেছেন লেখক এই গ্রন্থে।

শ্রীকৃষ্ণ যখন জন্মগ্রহণ করেছেন তখন ভারতের কী চেহারা আমরা দেখি !

মগধাধিপতি সম্রাট জরাসন্ধ ছিয়াশিটি রাজাকে এনে বন্দী করে রেখেছেন—আর চৌদ্দটি পেলে রাজমেধযজ্ঞ বা হত্যামহোৎসব সম্পন্ন করবেন।

কংসের মৃত্যুতে ক্রুদ্ধ জরাসন্ধ নাকি উনবিংশতিবার মথুরা আক্রমণ করেন। তাতে যাদবদের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি অবশ্যই হয়েছে, কিন্তু ঐ অঞ্চলের অধিবাসী জনসাধারণকে যে অবর্ণনীয় দুঃখদুর্দশা ভোগ করতে হয়েছে তার বিবরণ মহাভারতে লেখা না থাকলেও আমরা অনুমান করতে পারি।

সম্ভবত সেইজন্যই, তাদের কথা ভেবেই আরও, শ্রীকৃষ্ণ এই বিগ্রহ এড়াবার জন্য বহুদূরে দ্বারাবতী-রৈবতকে গিয়ে বসবাস করেছিলেন—জরাসন্ধের বিনাশের অপেক্ষায় বা তার আয়োজনে।

কালযবন, চেদীরাজ শিশুপাল, ভগদত্ত, পৌণ্ড্রক বাসুদেব, মদ্ররাজ, সিন্ধুরাজ প্রভৃতি সমসাময়িক নৃপতিদের যে রূপ দেখি, সে-সময়কার যেসব যুদ্ধবিগ্রহ দিগ্বিজয়যাত্রা প্রভৃতির বিবরণ পাই—তার কিঞ্চিন্মাত্রও যদি সত্য হয়, তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে সে-সময় সাধারণ দেশবাসীর অবস্থা একালের চেয়ে সুখকর ও শান্তিময় ছিল না, যতই কেন না জীবনযাত্রার উপকরণ সুলভ ও সহজপ্রাপ্য হোক।

সুতরাং—"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্/ধর্মসংস্থাপনার্থায়" শ্রীকৃষ্ণের যে প্রচেষ্টা—তার কারণ, তার পিছনে পুরুষোত্তমের যে বেদনা ও ক্ষোভ—তা উপলব্ধি করতে অসুবিধা হয় না। সেই বিরাট প্রচেষ্টার বিপুল আয়োজন, এক অমানুষিক মানুষের অবিশ্বাস্য প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিকৌশল, পরিকল্পনার কল্পনাতীত বিশালতা, লোকোত্তর মনোবল—তার সাফল্য ও তার ব্যর্থতাই বর্তমান গ্রন্থের উপজীব্য।

পরিশেষে নিবেদন, এটি উপন্যাস মাত্র, জীবনী নয়।

এই মহামানব যে রূপে লেখকের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়েছেন—সেই রূপই দেবার চেষ্টা হয়েছে এই গ্রন্থে। এ শ্রীকৃষ্ণ লেখকের কল্পনার, ধারণার মানুষ—বুঝি তার ইচ্ছাতুর স্বপ্নেরও। এর মধ্যে ঐতিহাসিক পারম্পর্য, পৌরাণিক অতিশয়োক্তি বা মুগ্ধ স্তুতিগান খুঁজতে গেলে হয়ত হতাশ হতে হবে।

"মনুষ্যধর্মশীলস্য লীলা সা জগতঃ পতেঃ।
অস্ত্রাণ্যনেকরূপানি যদরাতিষু মুঞ্চতি॥
মনসৈব জগৎসৃষ্টিং সংহারঞ্চ করোতি যঃ।
তস্যারিপক্ষক্ষপণে কোহয়মুদ্যমবিস্তরঃ॥
তথাপি যো মনুষ্যাণাং ধর্মস্তমনুবর্ততে।
কুর্বন্ বলবতা সন্ধি হীনৈর্যুদ্ধং করত্যসৌ॥
সাম চোপপ্রদানঞ্চ তথা ভেদং প্রদর্শয়ন্।
করোতি দণ্ডপাতঞ্চ কচ্চিদেব পলায়নম্॥
মনুষ্যদেহিনাং চেষ্টামিত্যেবমনুবর্ততঃ।
লীলা জগৎপতেস্তস্য ছন্দতঃ সংপ্রবর্ততে॥

বিষ্ণুপুরাণ, (৫ম অংশ, ২২ অধ্যায়)

জগৎপতি হইয়াও যে তিনি শত্রুদের প্রতি অনেক অস্ত্রনিক্ষেপ করিলেন, ইহা তিনি মনুষ্যধর্মশীল বলিয়া তাঁহার লীলা। নহিলে যিনি মনের দ্বারাই জগতের সৃষ্টি ও সংহার করেন, অরিক্ষয় জন্য তাঁহার বিস্তর উদ্যম কেন? তিনি মনুষ্যগণের ধর্মের অনুবর্তী, এজন্য তিনি বলবানের সঙ্গে সন্ধি ও হীনবলের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। কাম, দান, ভেদ প্রদর্শনপূর্বক দণ্ডপাত করেন, কখনও পলায়নও করেন। মনুষ্যদেহীদিগের ক্রিয়ার অনুবর্তী সেই জগৎপতির এইরূপ লীলা তাঁহার ইচ্ছানুসারেই ঘটিয়াছিল।

[অনুবাদ—বঙ্কিমচন্দ্র]

"মহাভারতের সবচেয়ে রহস্যময় পুরুষ কৃষ্ণ। বহু হস্তক্ষেপের ফলে তাঁর চরিত্রেই বেশী অসংগতি ঘটেছে। মূল মহাভারতের রচয়িতা কৃষ্ণকে ঈশ্বর বললেও সম্ভবত তাঁর আচরণে অতিপ্রাকৃত ব্যাপার বেশী দেখান নি। সাধারণত তাঁর আচরণ গীতাধর্মব্যাখ্যাতারই যোগ্য, তিনি বীতরাগভয়ক্রোধ স্থিতপ্রজ্ঞ লোকহিতে রত। কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁর যে বিকার দেখা যায় তা ধর্মসংস্থাপক পুরুষোত্তমের পক্ষে নিতান্ত অশোভন, যেমন ঘটোৎকচ বধের পর তাঁর উদ্দাম নৃত্য এবং দ্রোণবধের উদ্দেশ্যে যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যাভাষণের উপদেশ।…সর্বত্র ঈশ্বররূপে স্বীকৃত না হলেও কৃষ্ণ বহু সমাজে অশেষ শ্রদ্ধা ও প্রীতির আধার ছিলেন এবং রূপ শৌর্য বিদ্যা ও প্রজ্ঞার জন্য পুরুষশ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হতেন।"

রাজশেখর বসু

[মহাভারতের ভূমিকা]

গ্রন্থারম্ভ

॥ ১ ॥

সাধারণত রাত্রি প্রভাত হওয়ার পরও বহুক্ষণ, প্রায় চার-পাঁচ দণ্ডকাল কোন কিছু লক্ষ্য করার মতো অবস্থা থাকে না বলদেবের। থাকার কথাও নয়। রাত্রে যে পরিমাণ সুরা তিনি উদরস্থ করেন, তাতে অপর কোন সামান্য ব্যক্তি হলে কয়েকদিনই হয়ত অচৈতন্য হয়ে থাকত। অমিতবীর্য হলধরের তেমন কোন বৈলক্ষণ্যই দেখা যায় না, শুধু একটু আত্মস্থ হয়ে থাকেন মাত্র ; অনেক সময়—জেগে আছেন অথবা বসে বসেই আবার নিদ্রিত হয়ে পড়েছেন—বোঝা যায় না।

কিছুকাল এইভাবে থাকার পর তিনি হুঙ্কার দিয়ে উঠে পুনরায় সুরা প্রার্থনা করেন। এ নিত্য-নৈমিত্তিক। এটুকু প্রয়োজনও। রেবতীও তা জানেন, সে ব্যবস্থা হাতের কাছে গুছিয়েই রাখেন। তবে বলদেব না চাইলে দেন না। কারণ এমন এক-আধবার হয়েছে, হাতের কাছে এগিয়ে ধরতে—'প্রাপ্তিমাত্রেণ' তা পান করেছেন, সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র অবহিত না হয়েই—এবং যথাসময়ে অর্থাৎ কিছু পরেই আবার প্রাত্যহিক অভ্যাসমতো হুঙ্কার দিয়ে উঠেছেন।

তবে সে ঐ একবারই। এটুকুর প্রয়োজন হয় তাঁর প্রকৃতিস্থ হওয়ার জন্য, সুরাপায়ী মাত্রেই তা জানেন। তার একটু পরে সহজ দৃষ্টি মেলে চারিদিকে চান। কোন কিছু অনাচার বা অনিয়ম দেখলে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন, সহজ জীবন-যাত্রার লক্ষণে প্রসন্ন হন। অতঃপর প্রাতঃকৃত্য, তৈলমর্দন, স্নানাদি চলে সাধারণ ভাবেই—অভ্যাসের পথ ধরে।

কিন্তু আজ তার কিছু ব্যতিক্রম ঘটল। বোধ করি অগণিত রথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি, কয়েক শত অশ্বের হ্রেষা, ভারবাহী অশ্বতরদের অসহিষ্ণু ক্ষুরনিক্ষেপ ইত্যাদির অনভ্যস্ত ও কর্কশধ্বনিতেই তাঁর প্রভাতী আধতন্দ্রার ব্যাঘাত ঘটে থাকবে। তিনি বিনা প্রাথমিক সুরাপানেই দুই আয়ত রক্তচক্ষু বিস্ফারিত করে প্রাসাদ-প্রাঙ্গণের দিকে তাকালেন। তারপর কতকটা অসহায় ভাবেই চিরসঙ্গিনী রেবতীর সন্ধানে পিছন দিকে মুখ ফেরালেন।

রেবতী কাছেই ছিলেন। চোখও পড়ল ; তবু চিনতে কিছু বিলম্ব হল।

প্রাভাতিক সুরাটুকু দেহাভ্যন্তরস্থ না হলে কিছুই ভাল করে দেখতে পান না তিনি। নিতান্ত অনুমানেই, রেবতী যথাস্থানে থাকবেন ধরে নিয়েই প্রশ্ন করলেন, 'ব্যাপার কি প্রিয়ে, এত কোলাহল কিসের? কোথাও কি কোন যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে? কোন মূঢ় মরণেচ্ছু শত্রু কি এ রাজ্য আক্রমণ করেছে? এ তো মনে হচ্ছে রণসজ্জারই আভাস।'

রেবতী হাসলেন। বললেন, 'গ্রাম্য মেয়েরা বলে শুনেছি—"যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই" তা আপনারও দেখছি সেই ভাব। আপনারা কোথায় যাবেন—রাজ্যজয়ে কি রমণীজয়ে—সে খবর কি আমরা রাখব নাকি?'

'আমরা যাব? আমরা কোথায় যাব? সে কি! কে বললে এ কথা? কই, আমি শুনি নি তো।'

'সে আবার কি! সেই আয়োজনই তো হচ্ছে শুনেছি। যুদ্ধযাত্রা হলে অবশ্যই এই মাত্র দুই তিন শত লোক যেত না।...এ যা দেখছি, আপনাদের দেহরক্ষী, সূপকার, গাত্রসংবাহক, তৈলমর্দক, শয্যাকর ও সাজকরদেরই সমারোহ। খাদ্যও তো সেই মতো সঙ্গে যাচ্ছে দেখছি। মথুরার কঠিন পিঠ্ঠিভরী ও শর্করাবহুল লাড্ডু প্রস্তুত হয়েছে, ঘৃত, ক্ষীরপিণ্ডক*, যবচূর্ণ গোধূমচূর্ণ—যা যাচ্ছে, এই দুই তিন শত লোকের মতোই।...আপনি তো আমাকে কোন সংবাদই জানান না, মনেও থাকে না আপনার—এসব সংবাদ আমাকে অপরের কাছ থেকেই সংগ্রহ করতে হয় চিরকাল—'; রেবতীর কণ্ঠস্বর ঈষৎ অভিমানে গাঢ় হয়ে আসে বলতে বলতে, আগে হলে রোদনরুদ্ধই হয়ে উঠত, এখন এসব ঔদাসীন্যে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন তাই অতটা আর হয় না, তবু অভিমান একটু হয় বৈকি!—'তাই ভগ্নী রুক্মিণীর কাছে সংবাদ নিতে গিয়ে শুনলাম, আপনারা নাকি পাঞ্চাল দেশে যাত্রা করছেন, আজ দ্বিতীয় প্রহরের প্রথম ভাগেই। নাকি কোন স্বয়ম্বর সভার নিমন্ত্রণ এসেছে, তাই—'

'স্বয়ম্বর সভা! সে কি! আমরা স্বয়ম্বর সভায় যাব আর কি করতে! এ কি তোমারই মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটল—না আমার?...না, কই, আমার পানপাত্র দাও দেখি, তন্দ্রার জড়তাটা কাটুক ভাল ক'রে, নইলে তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

---

* পেঁড়া

'তন্দ্রার জড়তা' কাটার পর ভাল ক'রে তাকিয়েও যে বিশেষ কিছু বুঝলেন, তা নয়। তবে আয়োজনটা যে যুদ্ধযাত্রার নয়, সেটুকু বোঝা গেল একবার মাত্র দৃষ্টিপাত ক'রেই। সেনাপতি সেনানায়কদের কাউকেই দেখা যাচ্ছে না, অস্ত্রসম্ভারের বৃহদাকার যানগুলি অনুপস্থিত—চারিদিকে শুধুই ব্যক্তিগত সেবকদের ভিড়। আর কিছু সৈন্য যা ঘোরাফেরা করছে তাও নিতান্তই দেহরক্ষী শ্রেণীর। যতদূর মনে হয় পাঁচ শতর বেশি হবে না। হয়ত আরও কিছু দৃষ্টিসীমার বাইরে আছে—এদিকে ওদিকে—তবে সে-ই বা কত আর হবে ? আর পাঁচ শত বড় জোর।

বিমূঢ় ভাবে কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'বাসুদেব ? বাসুদেব কোথায় ? তাকে ডাক দেখি, রহস্যটা পরিষ্কার হোক !'

রেবতীর ইঙ্গিতে জনৈক দাসী বাইরে গিয়ে কাকে কি বলে এল—সম্ভবত সেখানে কোন দৌবারিক অপেক্ষা করছিল, তাকেই পাঠাল বলদেবের বার্তা দিয়ে।

তবে তাকে যে বেশীদূর যেতে হয় নি তা বোঝা গেল ; বাসুদেবও নিশ্চয় এই পথেই আসছিলেন—কারণ, অর্ধদণ্ডেরও অল্পকালমধ্যে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ এসে দেখা দিলেন।

'আর্যের জয় হোক। দাদা আমাকে স্মরণ করেছেন ? আপনার শরীর ভাল আছে তো ? রাত্রে বেশ সুনিদ্রা হয়েছিল ?'

খুব নিরীহ ভালমানুষের মতো প্রশ্ন করেন বাসুদেব।

কিন্তু বলদেবের এ ধরনের ভদ্রতা-শিষ্টাচারের ধৈর্য নেই। তিনি ওসব গতানুগতিক প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে নিজেই সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন, 'এসব কি শুনছি, তুমি নাকি কোথায় স্বয়ম্বর সভায় যোগ দিতে যাচ্ছ ?'

খুব শান্ত ভাবে, ভ্রমসংশোধনের ভঙ্গীতে বাসুদেব বলেন, 'আমি না, আমরা যাচ্ছি বলুন।'

'আমরা—? কই, তা আমাকে বল নি তো! আমি তো কিছুই জানি না !'

জ্যেষ্ঠের প্রাপ্য মর্যাদা স্মরণ ক'রে একটু ভ্রূকুটিও করেন বলদেব।

'বলার তো সময় যায় নি। এখনও প্রস্তুত হবার মতো যথেষ্ট সময় আছে।··দ্বিপ্রহরের পূর্বে যাত্রা করা যাবে না।···আপনার নিদ্রার ভাবটা কাটলেই সংবাদটা আপনার গোচরে আনব বলে অপেক্ষা করছিলাম, বস্তুত সেই উদ্দেশ্যে আসছিলামই এদিকে—'

তার পর ঈষৎ একটু হেসে বললেন, 'কাল জানিয়ে তো লাভও হ'ত না। সে-কথা আজ প্রভাত পর্যন্ত আপনার স্মরণ থাকত না।'

বলদেব একটা ঢোঁক গিলে বললেন, 'হুঁ। তা সে স্বয়ম্বর সভাটা কোথায়? কন্যাটি কার?'

'স্বয়ম্বর পাঞ্চাল দেশে, পাত্রী পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের কন্যা—কৃষ্ণা।'

'দ্রুপদের কন্যা?—ও, সেই হোমাগ্নিসম্ভবা মেয়েটি?'

'হ্যাঁ আর্য, সে-ই। এ স্বয়ম্বর সভা সব দিক দিয়েই তাৎপর্যপূর্ণ, বিশিষ্ট। মেয়েও সাধারণ নয়, স্বয়ম্বরের শর্তও সামান্য নয়। আপনার স্মরণ আছে কিনা জানি না—দ্রুপদ কৌরব তথা দ্রোণের কাছে লাঞ্ছিত হয়ে সন্তান-কামনায় যে যজ্ঞ করেন—তার পূর্ণাহুতি দেওয়ার সময় তাঁর মহিষী প্রস্তুত ছিলেন না বলে পুত্র ও কন্যা দুজনে শরীর পরিগ্রহ ক'রেই যজ্ঞাগ্নি থেকে বেরিয়ে আসে। সেই সময়ই দৈববাণী হয়, এই পুত্র দ্রোণাচার্যকে বধ করবে এবং এই কন্যা কুরুবংশের মহাভয়ের কারণ হবে।...মেয়েটি সব দিক দিয়েই অসাধারণ, শ্যামবর্ণা অথচ এমন অসামান্যা সুন্দরী মেয়ে নাকি ভূভারতে কোথাও নেই।...'

অসহিষ্ণু বলদেব বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্মরণ আছে। আমার এমন কি বিস্মরণের পরিচয় পেলে এর মধ্যে?' বোধ হয় স্মরণশক্তি বিষয়ক ইঙ্গিতটার মধ্যে তাঁর প্রবল সুরাসক্তি সম্বন্ধে একটা প্রচ্ছন্ন তিরস্কার ছিল বলেই বিরক্ত হয়ে উঠেছেন একটু, বললেন, 'তা সে স্বয়ম্বরের শর্তটা কি?'

বাসুদেব হাসলেন, মধুর কৌতুকের হাসি, বললেন, 'দ্রুপদ স্বয়ম্বর সভা-মণ্ডপের সর্বোচ্চ বিন্দুতে একটি লক্ষ্যবস্তু রেখেছেন, তার নিচে ঘোরবেগে একটি চক্র ঘুরবে; নিচের জলের মধ্যে ছায়া দেখে ঐ লক্ষ্যভেদ করতে হবে। অর্থাৎ এমন হিসাব করে শরনিক্ষেপ করতে হবে যাতে সেই ঘূর্ণ্যমান চক্রের সামান্য দণ্ড-ব্যবধান ভেদ ক'রে তা লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছয়। আপাতদৃষ্টিতে যা মনে হয় এক পলকের শতাংশরও কম সময়ে এই কাজ করতে হবে। দ্রুপদ ইচ্ছা ক'রেই এই পণ রেখেছেন—বোধ হয় কোন সাধারণ নৃপতি না তাঁর ঐ অসাধারণ কন্যারত্ন লাভ করতে পারে এই তাঁর অভিপ্রায়। যে ধনুতে শরসন্ধান করতে হবে—শুনেছি তাও বিশেষ ভাবে নির্মিত—সে ধনু ধরে তাতে জ্যা আরোপণ করাই দুঃসাধ্য।'

'হুঁ।' অনেকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করে বসে থেকে যেন বলদেব কথাগুলোর মর্মার্থ অনুধাবনের চেষ্টা করেন। তার পর বলেন, 'তা তুমি সেখানে যাচ্ছ

কেন ? তুমি কি রাজন্যসমাজে নিজের অস্ত্রশিক্ষার পরীক্ষা দিতে চাও, না আর একটি বধূ-গ্রহণের ইচ্ছা ? তোমার কি বিবাহের সাধ মেটে নি এখনও ?'

বিদ্রূপ-শল্যটা বেশ পরিষ্কার হয়ে উঠল বলদেবের কণ্ঠে।

কিন্তু বাসুদেব সে আঘাত গায়ে মাখলেন বলে বোধ হল না। বরং প্রশান্ত-গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'না আর্য। একই স্থানে কত লোক কত কী কাজে যায় ! দেবমন্দিরে কি শুধুই দর্শনার্থী আসে ? কেউ আসে দর্শন করতে, কেউ করাতে। কেউ পূজারী, কেউ বা ফুল কি পূজার সামগ্রী বিক্রি করতে আসে। দেবতা কি পুণ্য সম্বন্ধে তাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। এই স্বয়ম্বরের বার্তা পেয়ে ঐ যে দেশ-দেশান্তর থেকে বিবিধ পণ্যসামগ্রী নিয়ে কত লোক আসছে—সুদূর চীন থেকে, তারও ওদিকে অসুর ম্লেচ্ছদের দেশ থেকে স্বার্থবাহের দল—তারাও যেমন কিঞ্চিৎ লাভের আশায় যাচ্ছে, হয়ত ঐ অযোনিসম্ভবা হোমাগ্নিউদ্ভূতা আশ্চর্য কন্যাটিকে দেখারও কোন আগ্রহ বা কৌতূহল নেই তাদের ; আমিও তেমনি—সম্পূর্ণ অন্য উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। আমি যাচ্ছি বধূ নয়—বন্ধু খুঁজতে। যিনি এই দুঃসাধ্য-শর্ত পালন করতে পারবেন—সেই নবীন বীরের আশাতেই যে আমি পথ চেয়ে আছি দীর্ঘকাল।'

কথা শেষ করে একটি অতি ক্ষুদ্র দীর্ঘশ্বাস মোচন করলেন বাসুদেব।

কিন্তু এত কথা যে সম্যক অনুধাবন করতে পারলেন হলধর—বলে মনে হল না। তিনি একটু তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতেই উত্তর দিলেন, 'কে আবার—দুর্যোধনই জিতবে। আর তো কাউকেই দেখছি না।'

অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের অভিমানান্ধ পুত্র দুর্যোধন চিরকালই বলদেবের অনুগত—অন্তত সেই ভাবই বজায় দিয়ে চলে সে। দিনকতক গদাযুদ্ধ শিক্ষাও করেছিল ওঁর কাছে। সেই সময় থেকেই—কে জানে কেন, সম্ভবত শ্রীকৃষ্ণের মনোভাব সম্বন্ধে একটা অস্বস্তি বা সন্দেহ থাকাতেই—বেশী ক'রে উদার ও উদাসীন হলধরকে ধরে আছে। তাঁকেই সর্বদা চাটুবাক্যে তুষ্ট রাখার চেষ্টা করে।

শ্রীকৃষ্ণ তা জানেন। দুর্যোধন সম্বন্ধে অগ্রজের ধারণা পরিবর্তন করবারও চেষ্টা করেছেন অনেকবার—কিন্তু কোন ফল হয় নি। এই ধরনের মানুষ পৃথিবীতে অনেক আছে, চিরকালই থাকবে—যারা অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে দাবাগ্নির মতো জ্বলে ওঠে, আবার পরক্ষণেই শান্ত জলবৎ হয়ে যায় ; সংসারানভিজ্ঞ ; মানুষের মনের কুটিল গতিবিধির কোন অভিজ্ঞতাই নেই ; কেউ আশ্রিত বা অনুগত হলে কোন কারণেই তার সম্বন্ধে খারাপ ধারণা আনতে পারে না। পক্ষপাত একটা নিজের অজ্ঞাতসারেই থেকে যায়।

শ্রীকৃষ্ণ যেমন এ দুর্বলতার সংবাদ রাখেন—তেমনি অগ্রজকে জানেন বলেই তাতে বিচলিত হন না। অনুজ সম্বন্ধে বলদেবের অগাধ বিশ্বাস, অসীম আস্থা ওঁর ওপর। ভালও বাসেন, বোধ করি একটু সমীহও করেন। ওঁর বুদ্ধির তল পান না যে, তা প্রকাশ্যেই স্বীকার করেন। শ্রীকৃষ্ণর মতের বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে তিনি কিছু করবেন না কোন দিন—এ বিষয়ে ওঁর সন্দেহমাত্র নেই।

আজও কণ্ঠে যথেষ্ট জোর দিয়ে বলার পর একটু উৎসুক ভাবেই ভাইয়ের মুখের দিকে তাকান। সেখানে সমর্থন খোঁজেন।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ঘাড় নাড়েন, 'না, তার কর্ম নয়। সে বলদর্পী, ঈর্ষী, অহঙ্কারী, সেই জন্যই হঠকারীও, তাছাড়া ধনুর্বেদে সে খুব পারদর্শী নয় কোনকালেই। এ পণ যে জিতবে তার দৈহিক বল, অভ্যাস ও শস্ত্র-কৌশলের সঙ্গে স্থির বুদ্ধি, অসীম ধৈর্য, একাগ্র লক্ষ্য ও অস্ত্রক্ষেপণ এবং তার গতি সম্বন্ধে নির্ভুল জ্ঞান একান্ত আবশ্যক। এই গুণগুলি যার আছে তাকেই আমার প্রয়োজন, তারই সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি দীর্ঘকাল ধরে।'

'তার মানে তোমার ব্যক্তিগত ক্ষতি ও অপমানের শোধ তোলবার মতো একটা লোক খুঁজছ? নিজের যোগ্যতার অভাব স্বীকার করেও?'

বলদেব আবারও একটু ব্যঙ্গতীরাগ্র বেঁধাবার চেষ্টা করেন।

কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তীক্ষ্ণতর তীরের মতো শ্রীকৃষ্ণের উত্তর এসে যেন বিদ্ধ করে তাঁকে, 'দোষ কি? মানুষ মাত্রেরই তো এ স্বধর্ম। যেমন আত্ম-রক্ষার প্রবৃত্তিও তার সহজাত—তেমনি আঘাতকারীকে প্রত্যাঘাত করার ইচ্ছাও। যার নিজের সে শক্তি নেই, সে কৌশল অবলম্বন করবে বৈকি। "ব্যাঘ্রসনে নখেদন্তে নহেকো সমান, তাই বলে ধনুঃশরে বধি তার প্রাণ, কোন্ নর লজ্জা পায়?"···তবে শুধু তাও নয়, আমার অন্য লক্ষ্য, অন্য উদ্দেশ্যও আছে কিছু। বৃহত্তর এক লক্ষ্য।'

'কী লক্ষ্য?' সকৌতূহলে বলদেব প্রশ্ন করেন।

'যথাসময়ে তা আপনিই উপলব্ধি করবেন, সে গুপ্তমন্ত্রণা প্রকাশ করার সময় এখনও আসে নি। আর ইচ্ছা করলে আপনি এখনও জানতে পারেন, আপনার অসামান্য মনীষা, প্রজ্ঞা দৃষ্টি ইচ্ছা করে সুপ্ত রেখেছেন বৈ তো নয়, আপনি সচেতন হলে ত্রিকালের কোন কিছুই অজ্ঞাত থাকতে পারবে না।'

তারপরই যেন অকস্মাৎ বর্তমান কর্তব্য ও কার্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠেন তিনিও। অগ্রজকে অতিক্রম করে রেবতীকে সম্বোধন করেন, 'আর্যা, অন্তত দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হবার পূর্বেই যাতে যাত্রা করতে পারি সে বিষয়ে আপনি

এবার একটু সচেষ্ট হোন। আপনার আনুকূল্য ছাড়া তা হবার সম্ভাবনা নেই।'

'অর্থাৎ— ?' মুখ টিপে হেসে রেবতী প্রশ্ন করেন।

'অর্থাৎ দাদার প্রাত্যহিক কর্মগুলো—তৈলমর্দন, অঙ্গসংবাহন, স্নান, পূজা প্রভৃতি একটু ত্বরান্বিত না করলে—আহারাদি সেরে ঐ সময়ে যাত্রা করা যাবে না।'

এই বলে আর বাদানুবাদ বা বলদেবের কোন বক্তব্যের অবসর না রেখেই উভয়কে অবনত মস্তকে করজোড়ে প্রণিপাত জানিয়ে বাসুদেব তখনকার মতো বিদায় নেন।

॥ ২ ॥

'কী গো প্রিয়তমে, আমি স্বয়ম্বর সভায় যাচ্ছি জেনেও যে মুখভার করছ না, কিংবা রোগশয্যা গ্রহণ করছ না, বরং সতীসাধ্বী স্ত্রীর মতো সব গুছিয়ে দিচ্ছ—ব্যাপারটা কী ? আমি বড় শঙ্কিত বোধ করছি যে, মনে হচ্ছে আমার কপাল এবার পুড়ল, আমার প্রেমে তোমার অরুচি ধরে গেছে !'

সত্যিই বাসুদেবের প্রিয়তমা মহিষী সত্যভামা (একেই যা ভয় করেন তিনি, সমীহ করেন রুক্মিণীকে) তখন একটি বেত্রপেটিকায় স্বামীর নিত্য-প্রয়োজনীয় বিশেষ দ্রব্যগুলি সাজিয়ে রাখছিলেন। রাত্রে শয়নের পূর্বে হরিতকীচূর্ণ বটিকা গ্রহণের অভ্যাস আছে, সেগুলি স্ফটিকাধারে রাখতে হবে ; মুখশুদ্ধির জন্য লবণাক্ত শুষ্ক আমলকীখণ্ড প্রচুর দেওয়া আবশ্যক ; যেখানে-সেখানে জল গ্রহণ করেন না, অথচ রথচক্র-উৎক্ষিপ্ত ধূলিতে পিপাসা পাওয়া স্বাভাবিক, সাময়িক পিপাসা শান্তির জন্য তাই কতকগুলি অম্লরসাস্বাদিত শর্করাখণ্ড তৈরী করানো থাকে—সেগুলি লাক্ষারঞ্জিত ক্ষুদ্রতর মৃৎপাত্রে গুছিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া আছে বকুলের দন্তধাবনদণ্ড, স্বর্ণনির্মিতরসনামার্জনী আরও কত কী। এ কাজ দাসদাসীদের দ্বারা হয় না, প্রধানা দুই মহিষীই করে আসছেন চিরদিন। আগে রুক্মিণীই করতেন, ইদানীং—উগ্র প্রাথমিক প্রণয়াবেগ শান্ত হওয়ায়—সত্যভামা ধীরে ধীরে নবীনা প্রেয়সী থেকে সেবা-পরায়ণা গৃহিণীতে পরিণত হচ্ছেন দেখে—এবং স্বামী অধিকাংশ অবসরকালই সত্রাজিৎ-নন্দিনীর পুরে অবস্থান করেন দেখে—ভারটি ছেড়ে দিয়েছেন। দিনকতক জাম্ববতী নিজেই আগ্রহ করে এগিয়ে এসেছিল কিন্তু সে ছেলেমানুষ,

পিতার আদরিনী কন্যা—সব হিসাব ক'রে, প্রয়োজন বুঝে গুছিয়ে দিতে পারে না দেখে বাসুদেবই নিষেধ করেছেন।

সত্যভামা পেটিকা থেকে মুখ তুলে এদিকে চেয়ে অভয়কৌতুক হাস্যে উত্তর দিলেন, 'আর্যপুত্র, সমুদ্রে যার শয্যা তার শিশিরে কি ভয়? যে দিবারাত্র অগ্নিআবর্তে দগ্ধ হচ্ছে, সামান্য একটি স্ফুলিঙ্গ নিয়ে দুশ্চিন্তা তার পক্ষে হাস্যকর নয় কি?…শুনেছি পূর্বে অসংখ্য গোপকন্যা আপনার প্রসাদলাভে ধন্য হয়েছে, এখনও অগণিতপ্রায় সপত্নী নিয়ে ঘর করছি, জাম্ববতীর পরেও তো কতকগুলি এসে এই প্রাসাদে প্রবেশ করল দেখলাম—তার ওপর আর একটি যোগ হলে আর বেশী কি ক্ষতি?'

শ্রীকৃষ্ণ হাসলেন, তবে ঠিক অপ্রতিভের হাসি নয় সেটা, কৌতুকেরও না। কেমন এক ধরনের রহস্যময় গভীরতা সে হাসিতে। সেই সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিও হয়ে এল স্বপ্নাচ্ছন্ন। ধীরে ধীরে যেন স্বগতোক্তির মতো বললেন, 'তুমি তো জান সখী, আর কেউ না জানুক—তোমার আর রুক্মিণীর ভাল করেই জানা আছে—এদের অনেকের সঙ্গে আমার ভাল করে পরিচয়ই হয় নি। প্রাসাদে চলাফেরার সময় সাক্ষাৎ হলেও অনেককে আমি চিনতে পারি না।… দীর্ঘকালের, আজন্ম-আকাঙ্ক্ষা নাকি তাদের—কেউ বলে জন্মজন্মান্তরের—আমাকে স্বামীরূপে পাওয়া—তাদের সেই ঐকান্তিক কামনাই পূর্ণ করেছি মাত্র! কেন তারা চায় আমাকে, কেন চেয়েছে—? না শক্তিতে না বিত্তে আমি এমন কিছু অসাধারণ নই, মহারাজ-চক্রবর্তী বা ত্রিভুবনবিজয়ী বীর—কিছুই না। তবুও তারা কেন আমাকে কামনা করেছে—তা তারাই জানে!'

'জানি, জানি ঠাকুর, তোমাকে আর ঐ পুরাতন পুঁথি খুলে বসতে হবে না। কিন্তু রহস্য থাক্,—আসল কথাটা খুলে বল দিকি, তুমি কাকে খুঁজতে যাচ্ছ! সেইটে জানার জন্যেই ছট্‌ফট করছি! তোমাকে আমি চিনি, কে এ পণ জিতবে, কি জিততে পারে তা তুমি বিলক্ষণ জান, সেই বিশেষ ব্যক্তিটিকেই দেখতে যাচ্ছ!'

'আমার মানসজগতের কোন সুড়ঙ্গ পথটাই তোমার অজ্ঞাত নেই—সেই তো হয়েছে মহাবিপদ! কিছুই গোপন করা যায় না!' কৃত্রিম হতাশার নিঃশ্বাস ফেলেন বাসুদেব, তারপর বলেন, 'কে নয়, কাদের। পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা হবে বলেই যাচ্ছি।'

'সে কি!' সত্যভামা উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ান, 'তারা তো বারণাবতে দগ্ধ হয়েছে! তাদের কোথায় পাবে আবার?'

'ঐ ভাবে, মূঢ় দুর্যোধনের চক্রান্তে অকালে অপঘাত মৃত্যুতে প্রাণ দেবার জন্য পাণ্ডবরা সৃষ্ট হয় নি। বিশেষ উদ্দেশ্যেই তাদের জন্ম।...বারণাবতে জতুগৃহদাহের সংবাদ পাবার পর কি আমি নিশ্চিন্ত স্থির হয়ে ছিলাম তুমি মনে কর? আমি সেখানে গিয়েছিলাম, ভস্মরাশি সরিয়ে অস্থিগুলি দেখে এসেছি। ভাল করেই দেখেছি। ভীমের অস্থি হতে পারে এমন একটাও চোখে পড়ে নি।...না, তারা বেঁচে আছে। আর তা যখন আছে তখন এ স্বয়ম্বর সভায় নিশ্চিত আসবে—এইটেই আশা করছি।'

'কত রকমই জান তুমি! কত খবর রাখ, কত ভেবে কাজ কর। আশ্চর্য, এতকাল তোমার সেবা করছি, আজও তোমার চিন্তাভাবনার অন্ত পেলুম না! তুমি বলছিলে তোমার মানসরহস্য সব জানা হয়ে গেছে—এর চেয়ে বিদ্রূপ আর কিছুই হতে পারে না।...তোমার কোন রহস্যটাই জানতে পারি নি। হয়ত জ্যেষ্ঠা রুক্মিণী কিছু জানেন—তাও সন্দেহ হয়। সমুদ্রেরও তল আছে, হয়ত বা আকাশেরও সীমা থাকা সম্ভব—তোমার তলও নেই, সীমাও নেই!'

তারপর খুব কাছে এসে বলেন, 'আচ্ছা, সবাই বলে তুমি ভগবান। কেউ বলে তুমি তাঁর অষ্টাংশ*, কেউ বলে তুমিই পূর্ণ, পরমেশ্বর।...ঠিক করে বল না তুমি কী! অনেকবারই প্রশ্ন করেছি, এড়িয়ে এড়িয়ে গেছ। আমার কাছে বল—আমি কাউকে বলব না।'

শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি আবারও তেমনি রহস্যস্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে এল। এই রকম হয়ে যায় ওঁর দৃষ্টি মধ্যে মধ্যেই। এই সময়গুলোতে কেমন যেন ভয় করে সত্যভামার, মনে হয় এ যেন তাঁর পরিচিত প্রিয়তম স্বামী নয়, এ যেন আর কেউ, বিরাট কেউ—রহস্যময় কোন সত্তা। এই সব সময়ে ওঁর কণ্ঠস্বরও মৃদু গম্ভীর হয়ে ওঠে, তাতে কৌতুকের মাধুর্য বা বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা থাকে না, অতিমানবিক কোন শক্তির স্পর্শে যেন তা এক লোকোত্তর পরিবেশ সৃষ্টি করে, সেই অতি মৃদু কণ্ঠস্বরেও বাতাস যেন কাঁপতে থাকে, মনের মধ্যে গুরুগুরু শব্দ ধ্বনিত হয়।

আজও তেমনি ধীর মৃদু কণ্ঠে বলেন, 'এড়িয়ে যাই নি, ঠিকই বলেছি। তুমিই বুঝতে চেষ্টা করো নি সত্যভামা। ঈশ্বর সর্বজীবেই আছেন, সর্বত্রই আছেন। তাঁকে ছাড়া কি কেউ বা কিছু আছে? শুধু সেটা উপলব্ধি করতে পারে না লোকে। সেই বোধ যে যত জাগাতে পারে নিজের মধ্যে, সে-ই

* মহাভারত—শান্তিপর্ব দ্রষ্টব্য

তত শক্তিমান। যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে, সে বিশ্বাস, উপলব্ধি—সেই শক্তিকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাতে পারে—সে-ই তাঁর অবতার, সে-ই ভগবান।'

'তা তুমি তো এসব জান,' আজও যে সত্যভামা স্বামীর কথার তল পেলেন তা নয়, তাই ভাসা-ভাসা ভাবে কথাটার সূত্র ধরে বললেন, 'তোমার তো শক্তির জ্ঞানের শেষ নেই। তোমার যা উদ্দেশ্য তা তো তুমিই সফল করতে পার, তবে তুমি পাণ্ডবদের খুঁজে বেড়াচ্ছ কেন?'

'ত্যাখো, তা নয়।' বাসুদেব সস্নেহে সত্যভামার কটি বেষ্টন করলেন, 'বহু দিনে মানুষের এই ধারণা মজ্জাগত হয়ে গেছে যে রাজারা, ধনী ব্যক্তিরা যা ইচ্ছা তাই করতে পারে; এ বিধিনির্দিষ্ট বিধান, এর কোন প্রতিবিধান সম্ভব নয়। আমি দরিদ্র গো-পালকদের ঘরে মানুষ হয়েছি, নিরীহ সাধারণ মানুষদের সঙ্গে—বলদর্পী, স্বেচ্ছাচারী, অসংযমী কংসের ভয়ে জনসাধারণ—ওর প্রজারা সর্বদা কী শঙ্কাকণ্টকিত হয়ে থাকত—জীবন্মৃত হয়ে দিন কাটাত —তা আমি নিজে দেখেছি, অনুভব করেছি। এর যে কোন প্রতিকার হওয়া প্রয়োজন, ওদের দ্বারা যে এই অকারণ নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার অবিচারের প্রতিবাদ করা সম্ভব—তা ওরা কখনও ভাবতেও পারে নি। এই ভাবে, নির্বাধায় মার খাওয়াই তাদের ভাগ্যলিপি, এই ভেবেই মার খেত তারা।... আমি যে কংসবধ করেছি, সেটাকেও তারা অলৌকিক দৈবলীলা ভেবেছে, আমাতে ঈশ্বরত্ব আরোপ করে নিশ্চিন্ত হয়েছে। তাদের যে কিছু করণীয় থাকতে পারে, তাদের দ্বারাও এমন কাজ হতে পারে—তা কখনও ভাবে নি, এখনও ভাবে না। না-দেখা ভগবানের ওপর সব দায় চাপিয়ে দিয়ে চুপ করে বসে আছে।'

এই বলে একটু থেমে আবারও বললেন বাসুদেব, 'আমি সেইটেই দেখাতে চাই সকলকে। পাণ্ডবরা আজ যদি বেঁচে থাকে, বেঁচে আছে তা জানি—তারা এখন পথের ভিখারী—সহায়সম্বলহীন, গৃহহীন, ভিক্ষান্নজীবী। যদি তাদের দিয়েই এই মদগর্বিত, ঐশ্বর্যলোভী, ক্ষমতালোলুপ, চরিত্রহীন, পরশ্রীকাতর পাশব ক্ষাত্রশক্তিকে—যা অনাচারে অত্যাচারে দেশকে জর্জরিত করে তুলেছে, অগণিত দেশবাসীর রক্ত শোষণ করে স্ফীতোদর হয়েছে, দেশের মাথার ওপর বসে আছে—তা ধ্বংস করাতে পারি—তাহলে এই লক্ষ লক্ষ মূঢ় মূক জনসাধারণ বুকে বল পাবে। প্রেরণা পাবে এগিয়ে যাওয়ার, মাথা তোলার।'

'তারা তখন পাণ্ডবদের ওপরও ঈশ্বরত্ব আরোপ করবে, দৈবশক্তি দেখতে পাবে তাদের সাফল্যে।'

যাঁর স্বয়ম্বর—ইতিমধ্যেই তাঁর খ্যাতি, কিম্বদন্তীতে পরিণত হয়ে দেশ থেকে দেশান্তরে বিস্তার লাভ করেছে। অনন্যশ্রুত তাঁর জন্মবৃত্তান্ত, অলোকসামান্য তাঁর রূপ ও গুণ। শস্ত্রশাস্ত্রপারঙ্গম দ্রোণাচার্য পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের বাল্যবন্ধু। চরম দারিদ্র্যে নিপতিত দ্রোণ একদা সেই বন্ধুত্বের দাবীতে দ্রুপদের শরণাপন্ন হন। কিন্তু সেখানে সমাদরের পরিবর্তে পান চরম অনাদর—রূঢ় ব্যবহার। ক্রোধাভিভূত আচার্য হস্তিনাপুরে এসে শ্যালক কৃপাচার্যের গৃহে প্রায় অজ্ঞাতবাস করতে থাকেন। কুরু-পিতামহ স্বয়ং-মহাবীর ভীষ্ম সে সংবাদ পেয়ে তাঁকে আমন্ত্রণ করে এনে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর নাবালক পুত্রদের শস্ত্র শিক্ষার ভার অর্পণ করলেন।

সে শিক্ষা সমাপ্ত হ'লে কুমাররা, বিশেষ অর্জুন ও ভীম যখন অজেয় বীরে পরিণত হলেন তখন দ্রোণ গুরুদক্ষিণা দাবী করলেন—দ্রুপদের নিপাতন ও লাঞ্ছনা; এবং তা লাভও করলেন। সে অপমান ভুলতে না পেরে প্রতিহিংসা কামনায় দ্রুপদ এক কঠোর যজ্ঞানুষ্ঠান করলেন। জনশ্রুতি সেই যজ্ঞের পূর্ণাহুতি সমাপ্ত হ'তে যজ্ঞাগ্নি থেকেই এক কুমার ও কুমারীর আবির্ভাব হয়—ধৃষ্টদ্যুম্ন ও কৃষ্ণা। গণকরা বলেন, এই কন্যা থেকেই কৌরবদের মহাসর্বনাশ ঘটবে, এই পুত্র হবে দ্রোণের নিহন্তা।

হোমাগ্নি-নিষ্ক্রান্তা অযোনিসম্ভবা এ কন্যা পাবকশিখার মতোই দীপ্তিমতী, তেজস্বিনী। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি প্রাপ্তবয়স্কা, সর্বগুণে সকলের অগ্রগণ্যা। তাঁর শিক্ষাদীক্ষা, আচরণ, কথাবার্তা—বিনয়সম্পন্ন, ত্রুটিহীন। কী চারুকলায়, কী সঙ্গীতশাস্ত্রে, কী রাজনীতিবোধে বা কী সাংসারিক কর্মব্যবস্থায়—অতুলনীয়া এই কন্যার অধিকার ও নিপুণতা যেন সহজাত। আর রূপ? সেও তো রূপকথার রাজকন্যার মতোই—সুরনারীদুর্লভ, কল্পনাসীমাতীত। তিনি শ্যামবর্ণা হয়েও অপরূপা, তাঁর দেহবর্ণের স্নিগ্ধশ্রী দর্শককে আনন্দদান করে; অতিশয় সুদর্শনা; সজল মেঘপুঞ্জের মতো তাঁর নিবিড় কুঞ্চিত কৃষ্ণকেশ; তিনি সুস্তনী, পীনপয়োধরা; নীলোৎপল-পলাশের মতো আয়ত তাঁর দুই চক্ষু; রহস্য ও মোহময় তাঁর দৃষ্টি। তাঁর করতল পদতল ও ওষ্ঠ রক্তবর্ণ, তিনি হংসগদগদভাষিণী; কাশ্মীরী তুরঙ্গমীর মতোই সুগঠিত-দেহা, সুদর্শনা।

অ... ...তর তাঁকে লাভ করার শর্তও। সীতাস্বয়ম্বরের পর এক-সময় সত্যিই মনে ...ও রাখা হয় নি। মানুষের আগ্রহের এও এক কারণ। ...বে, আদৌ কেউ জিততে পারবে কিনা—এ কৌতূহল নৃপতি ...দনা থেকে সেনানায়ক, গুরু থেকে ছাত্র, পুরোহিত থেকে

* রূপবান নকুল...

ক্রীতদাস সকলকারই। ফলে—দ্রুপদ তো দেশে দেশে বার্তা পাঠিয়েছেনই, আমন্ত্রণপত্র নিয়ে দূত গেছে প্রায় সমস্ত রাজসভাতেই—লোকমুখে সংবাদ ছড়িয়েছে অনেক বেশী, অনেক দ্রুত। নিমন্ত্রণ পৌছবার পূর্বেই প্রস্তুত হয়েছেন রাজন্যবর্গ, এমন কি যাঁরা কোন আশা পোষণ করেন না—যথা ভূস্বামীর দল, অবস্থাপন্ন গৃহস্থ—যাঁদের সঙ্গতি আছে—তাঁরাও রবাহূত হিসেবে রওনা দিয়েছেন পাঞ্চালাভিমুখে। শুধু মজা দেখতে, কৌতূহল চরিতার্থ করতেই বেরিয়ে পড়েছেন তাঁরা। নিকটবর্তী দেশ থেকে সাধারণ গৃহস্থও বেরিয়েছেন কেউ কেউ, এমন কি স্নাতক বা শিক্ষার্থীও বাদ যায় নি।

আর এঁরা এসেছেন বলেই—আরও বহু জনসমাগম হয়েছে। বাণিজ্য ক'রে যৎকিঞ্চিৎ উপার্জন করতে এসেছে ব্যাপারীর দল; চারিদিকে রাজন্যবর্গের স্কন্ধাবারগুলি কেন্দ্র করে বাজার বসে গেছে, বিরাট এক ব্যস্ত নগরীর রূপ ধারণ করেছে। সুদূর চীনদেশ থেকে, তিব্বত থেকে, গান্ধারপারের অসুর ম্লেচ্ছ যবনদের দেশ থেকেও স্বার্থবাহর দল এসেছে বিবিধ বিচিত্র পণ্য নিয়ে। তাদের পণ্য বহন করতে, পশুপাল সংরক্ষণ করতে বেশ কিছু শ্রমিকও এসে পৌচেছে। খাদ্যবস্তুর অসংখ্য বিপণি খোলা হয়েছে, ইন্ধনের ব্যবসায়ে শত শত কাঠুরিয়া পৌছে গেছে আগেই। এমন কি কুম্ভকার, ভোজনপত্র-সরবরাহকারকদেরও ব্যবসা জোর চলছে। এতগুলি লোকের মনোরঞ্জন করতে বিভিন্ন স্তরের নটনটী নর্তক-নর্তকী বাজীকরের দলও পিছিয়ে নেই। সেই সঙ্গে কত যে ভিক্ষুক এসেছে, এসেছে সাময়িক ভিক্ষার্থীর দল—তার লেখাজোখা নেই।

রাজা দ্রুপদের দিক থেকেও আদর-আপ্যায়ন-সমাদরের ত্রুটি নেই। অভ্যর্থনা করার ভার নিয়েছেন স্বয়ং যুবরাজ দৃষ্টদ্যুম্ন। তিনি প্রতিদিন প্রতিনিয়ত নৃপতিদের প্রাসাদশিবিরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, অতিথিদের স্বাচ্ছন্দ্যবিধান ও তাঁদের অসুবিধা দূর করতে। পানীয় জলের সরবরাহ না ব্যাহত হয়; আবর্জনা ইত্যাদিতে অতিথি-অভ্যাগত এবং রবাহূত দর্শকদেরও না স্বাস্থ্যহানি ঘটে—সেদিকে দৃষ্টি রাখার জন্য পাঞ্চালরাজ কয়েকজন মন্ত্রী নিয়োগ করেছেন। নৃপতিদের সঙ্গে সেবক-পাচক-দাস-দাসী, শিবিকাবাহক, অশ্বরক্ষক, অঙ্গসংবাহক দেহরক্ষী প্রভৃতি যে অসংখ্য অনুচর এসেছে, তাদের খাদ্যাদি তারা সঙ্গেই এনেছে, পাঞ্চালরাজসভা থেকেও প্রচুর সিধা পাঠানো হচ্ছে। ফলে মহোৎসব পড়ে গেছে স্কন্ধাবারে।

সে সিধায় ধান্য গোধূম তৈল ঘৃত মাংস প্রভৃতি ভোজনের প্রধান উপকরণ তো থাকছেই—দুগ্ধ দধি মিষ্টান্নেও তার একটি বৃহদংশ রচিত হচ্ছে। সেই

সঙ্গে সুরা প্রভৃতি রুচিকর আকাঙ্ক্ষিত পেয়ও।

কিন্তু শুদ্ধমাত্র পানভোজনের ব্যবস্থা ক'রেই পাঞ্চালরাজসভা নিশ্চিন্ত ছিলেন না। অতিথিদের মনোরঞ্জন ও নৈষ্কর্ম্যজনিত ক্লান্তি অপনোদনেরও যথেষ্ট ব্যবস্থা করেছিলেন। নগরের পূর্বোত্তর দিকে বিশাল স্বয়ম্বর সভা নির্মিত হয়েছিল, তাকে কেন্দ্র করে চতুর্দিকে অতিথিদের জন্য সুরম্য বাসভবন, স্কন্ধাবার, বিপণি-শ্রেণী প্রভৃতি ; তারও পরে প্রাচীর, প্রাচীরের পরে পরিখা। সে প্রাচীর কয়েকটি দ্বার ও তোরণে সুশোভিত। সব মিলিয়ে সুবৃহৎ নগরীর রূপ ধারণ করেছে কিছু-পূর্বের রুক্ষ পার্বত্য প্রান্তর।

সভাস্থল এই নগরীর কেন্দ্রবিন্দু বলে সেখানেই নৃত্যগীত, নাট্যাভিনয়, মল্লযুদ্ধ, ভোজবাজি প্রদর্শন প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদের আয়োজন হয়েছিল। নানা দেশ থেকে নট, মঙ্গল-পাঠক বৈতালিক, পুরাণবক্তা, মহাবল মল্ল ও সুশিক্ষিত নর্তক এসেছিলেন। সভাস্থান চন্দনজল ছিটিয়ে ধূলিশূন্য ও সুবাসিত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ধূপ- ও অগুরুধূম তো আছেই। রাজন্যবর্গের বসার আসনগুলিও যথাসাধ্য আরামপ্রদ করা হয়েছে। এমন কি রবাহূত দর্শকদের জন্যও আছে শুষ্কশষ্পের উপর মেষলোমের আস্তরণের ব্যবস্থা, যাতে মৃত্তিকার কাঠিন্য না বোধ করে তারা। অভ্যাগতদের আসন স্তরে স্তরে উঠে গিয়ে সভামণ্ডপের আচ্ছাদন-বস্ত্র স্পর্শ করেছে প্রায়, স্বয়ম্বর বা নৃত্যগীত অভিনয় কোনটাই দেখার অসুবিধা নেই কোন প্রান্ত থেকেই। এই বিশাল সভার বিস্তার্ণ মধ্যক্ষেত্রে চন্দনদারুদ্বারা মঞ্চ নির্মিত হয়েছে অভিনয় ও নৃত্যগীতের জন্য। মল্ল-যুদ্ধের আয়োজন ভূমিতে। বস্তুতঃ সারাদিনই সেখানে কিছু-না-কিছু আমোদ-আহ্লাদের আয়োজন থাকছে—যার যখন ইচ্ছা এসে বসে কিছুকালের জন্য আনন্দ উপভোগ ক'রে যেতে পারে। এবং সে আয়োজন এক-আধদিনের জন্যও নয়। পূর্ণ এক পক্ষকাল ধরে চলল এই অভূতপূর্ব আনন্দ-বিতরণ মহোৎসব।

এ বিপুল গভীর জনারণ্যে কাউকে খুঁজে বার করা প্রায় অসম্ভব। বাসুদেব সে চেষ্টাও করলেন না। বিশিষ্ট যে সব অতিথি এসেছেন, বিভিন্ন দেশের নৃপতির দল—বিশ্বস্ত চর পাঠিয়ে তাঁদের একটা তালিকা সংগ্রহ করলেন শুধু। এর চেয়ে বেশী যোগাযোগ করার সাহস নেই, তাঁর শত্রু চারিদিকেই। কতক তাঁকে আমলই দেন না, সমান বলে স্বীকার করেন না, 'কংসের ক্রীতদাস' বলে বিদ্রূপও করেন ; কতক—যেমন মগধাধিপতি জরাসন্ধ,

চেদীরাজ শিশুপাল ও প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা ভগদত্ত প্রভৃতি তাঁর সম্বন্ধে বিদ্বিষ্ট। এঁরাই প্রধান, শক্তিশালী। একা জরাসন্ধর ত্রিশ অক্ষৌহিণী সৈন্য। সুতরাং সমধর্মী সমব্যথী দু-চারজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করলেন মাত্র।

আর যা করলেন, স্বয়ম্বর সভায় সভার কার্যারম্ভের অনেক পূর্বে গিয়ে পৌছবার ব্যবস্থা। স্বয়ম্বরের কাল নির্দিষ্ট হয়েছিল দ্বিতীয় প্রহরের মধ্যভাগ, কিন্তু প্রত্যূষকালেরও পূর্বে বলদেবের ঘুম ভাঙিয়ে, তার পরও অবিরাম তাগিদ দিয়ে তাঁর প্রাতঃকৃত্য স্নান পূজা প্রভৃতি সমাপন করিয়ে দধি ও দুগ্ধপিণ্ডকে সামান্য জলযোগ করে প্রথম প্রহরের অন্ততঃ চার দণ্ড অবশিষ্ট থাকতেই সভাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

সাধারণ জনতা অবশ্য তার বহু পূর্বেই পৌছে গেছে—বোধ করি রাত্রি-প্রভাত হবার আগেই এসে বসে আছে কেউ কেউ—সামনের দিকে দৃষ্টিসীমার মধ্যে আসন পাবার আশায়। বাসুদেব বা তাঁর অগ্রজ ও জ্ঞাতিদের সে চিন্তা ছিল না; পূর্বাহ্ণেই নৃপতিদের মর্যাদা অনুসারে স্থান চিহ্নিত করা হয়েছিল; যাদব ও বৃষ্ণিকরাও সে তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এত পূর্বে আসার কারণ অন্য। এতবড় চক্রাকার সভায় কে কোথায় বসেছেন, কে কে এসেছেন, কার কতটা সাফল্যের সম্ভাবনা—মাত্র একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নেওয়া সম্ভব নয়। এক প্রান্ত থেকে বিপরীত অপর প্রান্তের মানুষ-গুলোকে চিনতে পারাই তো দুরূহ ব্যাপার, পরিচয়ের বিশেষ লক্ষণগুলি লক্ষ্যই হয় না। আর, সেভাবে একে একে দেখা—সময়সাপেক্ষও বটে।

সভা না দেখেও আয়তনটা অনুমান করতে পেরেছিলেন বাসুদেব। সেই কারণেই এত আগে আসা তাঁর—যথেষ্ট সময় থাকতে। নৃপতিদের জন্য দুটি প্রবেশপথ নির্দিষ্ট ছিল—পূর্ব ও উত্তর দ্বার। শ্রীকৃষ্ণ সেই তোরণদ্বার দুটির দিকে দৃষ্টি রেখেই কে বা কারা আসছেন লক্ষ্য করতে লাগলেন।

এসেছেন ভারতের সর্বপ্রান্তের নৃপতিরাই। ক্ষুদ্র বৃহৎ কোন দেশ বা রাজ্যই বাদ যায় নি। মদ্র, মৎস্য, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর, অন্ধ্র থেকে সুদূর কেরল পর্যন্ত। তবে সকলেই কিছু গণ্য নন। যাঁরা সম্ভাব্য বিজেতা, তাঁদের সম্বন্ধেই কৌতূহল। হিসাবনিকাশ, ভবিষ্যদ্বাণী, এমন কি বাজি ধরাও—তাঁদের নিয়েই।

বলরামের অত আগ্রহ ছিল না, থাকার কারণও নেই। সূর্যোদয়ের বহু পূর্বে শয্যাত্যাগ করার ফলে বিগত রাত্রির সুরাপানের জড়তা কাটে নি তখনও। তিনি নিরাসক্ত উদাসীনবৎ চেয়ে বসে ছিলেন আর ঘন ঘন জৃম্ভন ত্যাগ করছিলেন। কেবল, অকস্মাৎ, অঙ্গাধিপতি কর্ণ সপারিষদ সভাগৃহে

প্রবেশ করতেই সোজা হয়ে বসলেন তিনি, অনুজকে বললেন, 'ওহো, এই তো কর্ণও এসেছেন দেখছি। কর্ণকে হিসেবে ধরা হয় নি তো। এ-ই—আসল লোক। কর্ণই লক্ষ্যভেদ করবেন—দেখে নিও।'

বাসুদেব তখনই কোন উত্তর দিতে পারলেন না। কারণ ঠিক সেই সময়েই আর একটি ঘটনা ঘটেছে—অন্তঃপুরের দিকের বস্ত্রাবরণ সরিয়ে কন্যাকে সভায় আনা হয়েছে।

এই দ্রৌপদী !!

বাসুদেব বিস্মিত হন কদাচিৎ। যে কারণে সাধারণ মানুষ বিস্ময় বোধ করে—সে কারণ তাঁর জীবনে বিশেষ ঘটে না। বহু জিনিসই তিনি বহু পূর্বেই অনুমান করে নিতে পারেন, বহু সম্ভাবনা তাঁর আশ্চর্য সহজ বুদ্ধিতে কল্পনা ক'রে নেন। বহু দূর-ভবিষ্যতে দৃষ্টি পৌছয় তাঁর—মানুষের মনের গহন অন্তঃপুরে তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অনায়াস গতিবিধি। কিন্তু আজ তিনিও বিস্মিত হলেন। ঠিক এ রকম কখনও ভাবেন নি, এমন যে দেখবেন তা ধারণা করেন নি। কল্পনা এত দূর পৌছয় নি।

অযোনিসম্ভবা, হোমাগ্নি-উদ্ভূতা এই কন্যা একেবারে কিশোরী রূপেই এই মর্ত্যে এসেছে—সেটা জানেন বৈকি। শ্যামাঙ্গী হলেও অসামান্যা অতুলনীয়া সুন্দরী—এও শুনেছেন। কিন্তু সব জানা ও শোনার বাইরের বস্তু এ। আজকের এ অভিজ্ঞতা সকল পূর্ব-অভিজ্ঞতার অতীত। সাধারণতঃ কোন তথ্য প্রচারিত হওয়ার সময় অনেক বেশী অলঙ্কার-যুক্ত হয়, অনেক বর্ণ-যুক্ত হয়—কিন্তু এখানে তা হয় নি, কারণ জনশ্রুতির শব্দবাহুল্য বাস্তব সত্যকে ধরতে পারে নি। কল্পনাকে কিছুটা জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করতে হয়—সাধারণ মানুষের কল্পনাশক্তি এতদূর পৌছতে পারবে না, আর পারবে না বলেই তা বাস্তবের কাছাকাছিও পৌছতে পারে নি।···

ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত মূক হয়ে গেলেন বাসুদেব।

বোধ করি তাঁর জীবনে এই প্রথম।

তাঁর মুখে ভাষা ছিল না সে-সময়, চোখে ছিল না পলক।

'এই দ্রৌপদী ! সেই পরমাশ্চর্য যজ্ঞলব্ধ কন্যা !'

আবারও মনে মনে উচ্চারণ করলেন একবার।

রূপ ?

হ্যাঁ, রূপসীও বটে। অসাধারণ, অসামান্য, অপার্থিব রূপসী—সুর-কন্যা-দুর্লভ রূপ—তাতে কোন দ্বিমত নেই। এমন রূপ তিনিও বেশী দেখেন নি।

তবে সেজন্য তাঁর এ বিস্ময় নয়। শুধু রূপই একমাত্র গণনীয় হলে এতখানি বিচলিত হতেন না তিনি।

তিনি বিস্মিত বিচলিত হয়েছেন অন্য কারণে।

তিনি দেখেছেন ঐ কন্যার ব্যক্তিত্ব। এত কাল এত মেয়ে দেখেছেন, বহু-নারী-বল্লভ বলে একটা অখ্যাতিই আছে তাঁর,—এমন ব্যক্তিত্ব, মনীষা ও বুদ্ধির এমন দীপ্তি আর কখনও তাঁর চোখে পড়ে নি।

শুধু আয়ত নীল পদ্মপলাশের মতো চোখ দুটিতেই নয়,—সুকুমার চারু ললাটের ভঙ্গীতেও স্থির তীক্ষ্ণ বুদ্ধি—সেই সঙ্গে কর্তৃত্ব করার, মানুষকে পরিচালন করার সহজাত শক্তি প্রকাশ পাচ্ছে। এ নারী শুধুমাত্র মানবী নয়, দেবীও নয়—এ আরও অনেক কিছু, অন্য কিছু। কোন পরিচিত বিশেষণে একে বিশেষিত করা যায় না, কোন বিশেষ বর্ণনায় একে ব্যঞ্জিত করা যায় না।

আশ্চর্য! এ-ই দ্রৌপদী!

আরও একবার বললেন বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে।

সঙ্গে সঙ্গে মনের কোন্ প্রত্যন্ত প্রদেশে এক লহমার জন্য একটা হতাশা-ঈর্ষা-মিশ্রিত ঈপ্সা জাগে যেন—এই মেয়ে যদি তিনি পেতেন! তাঁর উপযুক্ত জীবনসঙ্গিনী হতে পারত—সিংহের সিংহিনী। এ তাঁর কেবলমাত্র বিলাস-সহচরী নর্মসঙ্গিনী হ'ত না। একে পাশে পেলে এমন একক, এতটা অসহায় বোধ হ'ত না। উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য অন্য লোক খুঁজতেও হ'ত না।...

কিন্তু ঐ এক লহমাই। পলককাল মধ্যেই চিন্তাটা মনে উদয় হয়ে মনেই লয় পেল। মনকে কঠোর ভাবে শাসন করলেন বাসুদেব। যা হবার নয়, যা হবে না তা নিয়ে অকারণ মনের মধ্যে একটা অভাববোধ সৃষ্টি ক'রে লাভ নেই। এ মেয়ে স্রষ্টার বরে সংহাররূপিণী হয়েই জন্মগ্রহণ করেছে। যেখানেই যাক, যার ঘরেই যাক—তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। আর, যদি তাঁর অনুমান গণনা ভুল না হয়, পাণ্ডবরা জীবিত এবং এই সভায় উপস্থিত থাকে তো তাদের ঘরেই যাবে। তাতেই কাজ বেশী হবে তাঁর।

চিত্তকে সংযত করে প্রকৃতিস্থ হতে কয়েক লহমা সময় লাগল তাঁর। তারপর—তখনও অন্যমনস্কতায় ঘোরটা কাটে নি—সেইভাবেই অগ্রজকে উত্তর দিলেন, 'আপনিও মেয়েটাকে হিসেবে ধরেন নি। মেয়েদের আমি যতদূর জানি, এ মেয়ে কখনও সূতপুত্রকে বরণ করবে না। কর্ণ যদি সে চেষ্টা করেন—অকারণেই হাস্যাস্পদ হবেন।'

'তুমি যখন বলছ তখন আর সন্দেহ কি! তোমার থেকে মেয়েদের আর বেশী কে জানবে?'

সুযোগ পেয়ে বলদেব আর একবার বিদ্রূপ-শল্য বিদ্ধ করেন কনিষ্ঠকে।

॥ ৪ ॥

ভাগ্যক্রমে অঙ্গাধিপতির আসন বৃষ্ণিকদের আসন থেকে খুব দূরে পড়ে নি! কর্ণ চেয়েছিলেন বন্ধু ও পরম উপকারী লজ্জাত্রাতা দুর্যোধনের কাছে থাকবেন —কিন্তু রাজাদের মর্যাদা হিসাবে আসন নির্দিষ্ট হওয়ায় ওঁকে দূরে পড়তে হয়েছে। অঙ্গ কৌরবদের অনুগত করদরাজ্য মাত্র। সে-দেশের অধিপতি-শাসক স্বাধীন সার্বভৌম রাজাদের পংক্তিতে স্থান পেতে পারেন না।

কন্যা সভাস্থ হলেও অনুষ্ঠান আরম্ভ হতে কিছু বিলম্ব হ'ল। অনেক কিছু করণীয় তখনও করা হয়ে ওঠে নি, আয়োজনের অনেক ছোটখাটো কাজ বাকী। তাছাড়া তখনও ক্রমাগত লোক আসছে সভায়। ইতরজন বা দর্শকদের জন্য তত চিন্তা নেই, আর তারা তো পূর্বাহ্লেই এসে বসে আছে, নিমন্ত্রিত অতিথিরাই তখনও সকলে উপস্থিত হ'তে পারেন নি, বিপুল ঘণ্টা-নিনাদে ও ঘোষকদের উচ্চকণ্ঠ ঘোষণায় স্বয়ম্বরের অনুষ্ঠান এবার আরম্ভ হবে শুনে দ্রুত আসতে শুরু করেছেন। দ্বাররক্ষক ও আসননির্দেশকারকদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও অনেকে নির্দিষ্ট আসন খুঁজে পাচ্ছেন না। তাঁরা কেউ কেউ অসন্তুষ্টও; নিজেদের ত্রুটি ভুলে গিয়ে উচ্চকণ্ঠে হোতা তথা ব্যবস্থাপকদের ধিক্কার দিচ্ছেন। ফলে কিছুটা বিশৃঙ্খলা ও বিপুল কোলাহল দেখা দিয়েছে। দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রস্তুত হয়ে নিজের মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছেন বটে, কিন্তু এ অবস্থা শান্ত না হলে স্বয়ম্বর সম্পর্কিত শর্তাদি ঘোষণা করা সম্ভব হচ্ছে না।

অবস্থা বুঝে—এখনও অন্তত দণ্ড-দুই কাল সময় হাতে আছে হিসাব ক'রে নিয়ে—বাসুদেব নিজের আসন থেকে উঠে সপার্ষদ অঙ্গাধিপতি যেখানে বসে আছেন সেইদিকে অগ্রসর হলেন। বিস্মিত বলদেবের 'কোথায় যাচ্ছ' 'কোথায় যাচ্ছ' প্রশ্ন শ্রুতিগোচর হলেও—না হওয়ার ভাব দেখিয়ে একেবারে কর্ণের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে সৌজন্যসূচক অভিবাদন জানিয়ে কুশল প্রশ্ন করলেন, 'মহাবীর অঙ্গাধিপতির শারীরিক ও অন্যান্য কুশল তো? পারিবারিক সংবাদ সব শুভ?...এখানে কোন অসুবিধা হচ্ছে না?'

কর্ণ বিস্মিত হলেন। সামান্য পরিচয় মাত্র ওঁদের, বরং দুর্যোধনের শস্ত্রগুরু

হিসাবে বলদেবের সঙ্গে কয়েকবার আলাপের সুযোগ ঘটেছে—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বার-দুয়েকের বেশি সাক্ষাৎ হয়েছে বলে তো কৈ মনে পড়ে না। তার এমন আত্মীয়তার কারণ কি ?···একটু শঙ্কিতও হলেন মনে মনে, কপটী ও নিদারুণ ধূর্ত বলে বাসুদেবের একটা দুর্নাম আছে—তার এমন অকারণ গায়ে-পড়া অন্তরঙ্গতায় স্বতঃই শঙ্কা জাগে মনে।

আরও বিস্ময় আনত অভিবাদনে। যতই হোক—গোপালকদের ঘরে মানুষ হলেও শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশের সন্তান। যদু ও বৃষ্ণিক বংশ ক্ষত্রিয় বলেই দাবি করেন নিজেদের। সেই শ্রীকৃষ্ণ জেনেশুনে সূতপুত্রকে নমস্কার করলেন কেন? রাজা হয়েছেন ঠিকই, তাই বলে তো আর ক্ষত্রিয় হয়ে যান নি!

কিন্তু বিস্ময় বা শঙ্কা যতই থাক্—ভব্যতায় বা শিষ্টতায় পিছিয়ে থাকা যায় না। কর্ণ উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিনমস্কার ও প্রতিকুশল প্রশ্ন ক'রে সমারোহ সহকারে বাসুদেবের দুই হাত ধরে পাশে বসালেন।

'আসুন, আসুন। কী ভাগ্য, আপনি অনুগ্রহ ক'রে আমাকে স্মরণ ক'রে এসেছেন। ইঙ্গিত করলে আমিই যেতাম।'

'না না, তাতে কি হয়েছে! আপনি বোধ হয় বয়স ছাড়া সব বিষয়েই আমার থেকে অগ্রগণ্য। মহাবীরই শুধু নয়—মহান্ মানুষও। আপনার অকুণ্ঠ দানের কাহিনী, পরোপকার ও জনসেবার বিবরণ আজ সমগ্র ভারতে বিদিত।'

'ছিঃ ছিঃ! ওসব কথা বলে লজ্জা দেবেন না। আমার সাধ্য নিতান্তই সীমিত, নগণ্য। আপনি বয়সেও জ্যেষ্ঠ; বিদ্যায় বুদ্ধিতে রাজনীতিতে সর্বত্রই আপনার প্রজ্ঞা স্বীকৃত, আপনার প্রতিভা সর্বজনবিদিত।···আপনি আমাকে স্মরণে রেখেছেন এতেই আমি বাধিত, ধন্য হয়েছি।···এখন আপনার—আপনাদের কথা বলুন। আচার্য বলদেব সুস্থ ও প্রসন্ন আছেন তো? তাঁর কি আমাকে স্মরণ আছে?'

'বিলক্ষণ! সেই কথাই তো আপনাকে বলতে এলাম। তিনি আপনাকে মনে রেখেছেন শুধু নয়—আপনার ওপর তাঁর অগাধ আস্থা। আপনি সভাগৃহে প্রবেশ করা মাত্র আর্য বলদেব বলেছেন, এই একমাত্র ব্যক্তি যে আজকের এই দুরূহ পণ জিততে পারে। আর তো কাকেও দেখছি না। এই সুরবন্দিতা দেবাংশজাতা কন্যা অঙ্গাধিপতির কণ্ঠেই বরমাল্য অর্পণ করবে।'

'আমি!! বলদেব আমার কথা বলেছেন? সে কি!' আনন্দে ও অকপট বিস্ময়ে কর্ণ প্রায় আসন ছেড়ে ওঠার উপক্রম করেন। 'কী বলছেন আপনি? পরিহাস করছেন বোধ হয়—?'

শ্রীকৃষ্ণও ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে মুখে ও দৃষ্টিতে অকপট বিস্ময়ের ভাব এনে বললেন, 'কেন? একথা আপনার মনে এল কেন? নিজেদের মধ্যে অযথা বিনয় ক'রে কোন লাভ নেই—আপনিই বলুন আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ধনুর্বিদ এ সভাতে আর কে আছেন? বলশালী ঐশ্বর্যবান সুযোদ্ধা হয়ত আরও অনেকে আছেন—কিন্তু এখানে অন্য দৈহিক শক্তি বা যুদ্ধকৌশল প্রকাশের সুযোগ কোথায়? ধনুর্বাণে যে একান্ত নিপুণ সে-ই শুধু এ পণ জিততে পারে। অর্জুন জীবিত থাকলেও কথা ছিল, এ সভামধ্যে জামদগ্ন্য-শিষ্য কর্ণ ব্যতীত আর তো কোন সম্ভাব্য বিজেতাকে দেখছি না!'

অর্জুন শব্দটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে একবার কর্ণর মুখমণ্ডল ভ্রূকুটিবদ্ধ ও আরক্তিম হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সে কয়েক পলকের জন্যই। মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে অকারণ উষ্মা পোষণ করে লাভ নেই। বিশেষ অর্জুনকে শ্রেষ্ঠতর এমন কথা বলেন নি বাসুদেব, প্রতিদ্বন্দ্বী রূপেই উল্লেখ করেছেন মাত্র। মোটের ওপর আনন্দিতই হলেন কর্ণ, প্রসন্ন কণ্ঠে বললেন, 'তাই তো! কিন্তু সত্যই বলছি, এ স্বয়ম্বর সভায় ঠিক প্রতিযোগিতা করতে আসি নি। ভেবেছিলাম মহারথ দুর্যোধনই হয়ত এ পণে বিজয়লাভ করবেন, আমরা মহোৎসাহে বন্ধুপত্নীকে নিয়ে হস্তিনায় ফিরব।'

'এটা মনে করা আপনার ঠিক হয় নি কিন্তু, পুত্রস্নেহে মানুষ অন্ধ হয় শুনেছি, দেখলাম আপনি বন্ধুপ্রীতিতে অন্ধ।' শ্রীকৃষ্ণ অমায়িক কণ্ঠে ছদ্ম-অনুযোগ করেন, 'কুরুবংশতিলক দুর্যোধন গদাযুদ্ধে যতটা পটু—ততটা কেন, তার দশমাংশও যে ধনুর্যুদ্ধে নন, তা আপনার চেয়ে আর কে জানে? তাছাড়া, অঙ্গাধিপতি, আপনি মহাবীর, বীরের ধর্ম যেমন আশ্রিতকে বিপন্নকে রক্ষা করা, সমধর্মীর সঙ্গে যুদ্ধ করা—তেমনি বীর্যশুল্কে কন্যারত্ন গ্রহণ করাও তার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। এখানে শস্ত্রনিপুণতা প্রদর্শনকেই বীর্য প্রকাশ বলে ধরে নিতে হবে। এ প্রতিযোগিতায় যোগদান আপনার অবশ্য-পালনীয় কর্তব্য, সে কর্তব্য পালন না করলে আপনি প্রত্যবায়ভাগী হবেন। বড় জোর, যদি মহোপকারী বন্ধুকে সম্মান দিতে চান—আপনি অগ্রবর্তী না হয়ে দুর্যোধনের পরাজয় বরণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারেন। তারপর আর নিরস্ত হয়ে বসে থাকার কী কারণ থাকতে পারে বলুন!'

কথাটা মনে লাগল কর্ণর। শ্রীকৃষ্ণর এই অযাচিত উপদেশকে উপকার বলেই ধরে নিয়ে কৃতজ্ঞতাও বোধ করলেন। তবে সে মনোভাব প্রকাশের সময় মিলল না। তখন সভাগৃহ কতকটা শান্ত হয়েছে, ধৃষ্টদ্যুম্ন ইঙ্গিত ক'রে জানাচ্ছেন

যে এবার তিনি তাঁর ঘোষণা শুরু করবেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর হস্তোত্তোলন-ভঙ্গী দেখেই দ্রুত নিজের আসনে ফিরে এলেন।

বলদেব এদিকে কৌতূহলে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ আসন গ্রহণ মাত্র প্রশ্ন করলেন, 'কী ব্যাপার! কর্ণর সঙ্গে এত কিসের আত্মীয়তা—হঠাৎ?'

'না, আত্মীয়তা আর কি!' প্রশান্ত সহজ কণ্ঠে উত্তর দেন বাসুদেব, 'আপনার আশীর্বাদ আর আশ্বাস-বার্তাই জানিয়ে এলাম মাত্র।'

ভাল বুঝতে পারেন না হলধর। তিনি আবার কখন আশীর্বাদ জানালেন কর্ণকে! তাঁর কি এতই স্মৃতিবিভ্রম হচ্ছে আজকাল? 'আমার কি বললে?' বিহ্বল দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করেন।

'ঐ যে আপনি বললেন কর্ণই একমাত্র যোগ্য পাত্র এ পণে এই নারীরত্ন লাভ করার—সেই কথাটাই জানিয়ে উৎসাহিত ক'রে এলাম। ভালই হ'ল, কর্ণ এ প্রতিযোগিতায় আদৌ যোগ দেবেন না বলে স্থির করেছিলেন।'

'তবে যে তুমি বললে, মেয়েটা ওকে বরণ করবে না?' আরও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন বলদেব।

'সে তো আমার অনুমান মাত্র। আমি কি মনে করি তার থেকে আপনি কি বললেন তার মূল্য কি অনেক বেশী নয়? দুর্যোধনের শস্ত্রগুরু হিসেবে অঙ্গাধিপতিও আপনাকে গুরুর মতোই শ্রদ্ধা করেন। আপনার আশ্বাস পেয়ে ওঁর উপকারই হ'ল। প্রবল উৎসাহ ও নবীন শক্তি লাভ করলেন।'

বলদেব খুশী হয়ে উঠলেন। তাঁর এই অনুজটি তাঁকে সামান্যমাত্র স্বীকৃতি দিলে তিনি ব্রহ্মাণ্ড জয়ের আনন্দ উপভোগ করেন।

কোলাহল কিছুটা প্রশমিত হলেও সম্পূর্ণ নীরব হয় নি। তাই ধৃষ্টদ্যুম্নর ঘোষণা প্রথম দিকটায় সম্পূর্ণ শোনা গেল না। তা বুঝে তিনি ক্রমাগত আরও তিনদিকে মুখ ক'রে তার পুনরুক্তি করলেন।

বললেন, 'আপনারা দয়া ক'রে লক্ষ্য করুন, উর্ধ্বে এই সভাভবনের একেবারে সর্বোচ্চ বিন্দুতে একটি লক্ষ্যবস্তু স্থাপিত হয়েছে। তার নিচে চক্রাকার একটি যন্ত্র আছে, আর এই দেখছেন বৃহদাকার এই ধনু এবং পাঁচটি নিশিত শর। যিনি ঐ ঘূর্ণ্যমান চক্রের ছিদ্রপথে এই পাঁচটি শর নিক্ষেপ ক'রে ঐ লক্ষ্য ভেদ করবেন, আমার ভগ্নী—দ্রুপদরাজকন্যা কৃষ্ণা তাঁকেই পতিত্বে বরণ করবেন।'

ঘোষণা শেষ হলে কুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রৌপদীর কাছে সমবেত প্রধান প্রধান

নৃপতিদের পরিচয় দিয়ে নীরব হলেন।

অতঃপর আবার সভামধ্যে এক বিপুল কোলাহল উঠল। দর্শকরা হিসাব করতে বসলেন কার কতটা সম্ভাবনা। কেউ কেউ এমনও বললেন রাজা দ্রুপদের এই কন্যা গৃহান্তর করার ইচ্ছা নেই বলেই এমন কঠিন পণ রেখেছেন। কেউ বা সমর্থনও করলেন পাঞ্চালরাজকে, এমন কন্যা যে পেতে চায় তাকে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হবে বৈকি!

রাজন্যদের মধ্যে কোলাহল ও বচসা দেখা দিল সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। তাঁরা প্রমাণ দেবার পূর্বেই পরস্পরের কাছে স্পর্ধা প্রকাশ করতে লাগলেন যে এই পণ জিতবার সম্ভাবনা একমাত্র তাঁদেরই আছে। প্রত্যেকেই নিজের গুণাবলী অর্থাৎ শৌর্য-বীর্যের কিছু সত্য কিছু কাল্পনিক বিবরণ দিয়ে অহঙ্কার করতে লাগলেন।

কিন্তু বেশীক্ষণ এই শূন্যগর্ভ আত্মম্ভরিতা প্রকাশ সম্ভব হ'ল না। অবশেষে একজনকে উঠতেই হয়। তারপর আর একজন, আর একজন। এই রূপসী কন্যাকে দেখে সকলেই কামার্ত লোভাতুর হয়ে উঠেছেন, সেদিক থেকেও কিছু তাড়া আছে। প্রথম দিকে যাঁরা গেলেন তাঁদের মধ্যেই ছিলেন দুর্যোধন। এ ছাড়া শাল্ব, শল্য, ক্রাথ, বক্র, কলিঙ্গরাজ, বঙ্গাধিপতি, বিদেহরাজ, যবনরাজ, বৎসরাজ, সিন্ধুরাজ, কোশলাধিপতি প্রভৃতি। কিন্তু কেউই কোন সুবিধা করতে পারলেন না। লক্ষ্যভেদ তো দূরের কথা, ধনু তুলে ধরারই সাধ্য হ'ল না অনেকের। ধরতে যদি বা পারলেন দু'একজন, ধনুতে জ্যা-রোপণের সামর্থ্য হ'ল না। ধনু বাঁকিয়ে গুণ পরাতে যাবেন কি ধনুর আঘাতে ছিটকে পড়তে লাগলেন। তাঁদের অলঙ্কারকবচকুণ্ডল উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল, বস্ত্রাদিও ছিন্ন বিভক্ত হয়ে গেল কারও কারও। দেহ ঘর্মাক্ত হয়ে উঠল, ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস পড়তে লাগল।

যাবার আগে প্রায় সকলেই বাহবাস্ফোট ও আস্ফালন করেন। নিজেই নিজের পূর্বকীর্তি স্মরণ করিয়ে দিয়ে আত্মমহিমা প্রচার করেন, 'উদ্বাহুরিববামনঃ' বলে বিদ্রূপ করেন পূর্ববর্তী বিফলকাম প্রতিযোগীদের—তারপরই ধনুর আঘাতে হতগৌরব ও হতশ্রী হয়ে আরক্ত মুখে ফিরে এসে নিঃশব্দে আসন গ্রহণ করেন আবার।

এইভাবে অনেকেই ব্যর্থ হবার পর, সুযোগ সমুপস্থিত দেখে অবশেষে একসময় মহাদাতা অঙ্গাধিপতি কর্ণ উঠলেন। দুর্যোধনের আর কোন আশা নেই যখন, তখন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বাধা কি? তবু যে এতক্ষণ অপেক্ষা

করলেন সে শুধু অতিরিক্ত লোলুপতা কি ব্যগ্রতা না প্রকাশ পায় এই জন্যই।

কর্ণ আস্ফালন, আস্ফোট বা বাগাড়ম্বর কিছুই করলেন না, মর্যাদানুযায়ী ধীর মন্থর গতিতে নিঃশব্দে উঠে গিয়ে সেই বিপুল ধনু—যা অধিকাংশ প্রতিযোগী তুলতে গিয়েই বিপরীত দিকে নিপাতিত হয়েছিলেন তা অনায়াসে তুলে নিয়ে অবহেলায় জ্যা রোপণ করলেন।

প্রতিযোগীরা আসন ত্যাগ করে ধনুর দিকে অগ্রসর হলেই সভাঘোষক তাঁর নাম ধাম পরিচয় এবং কিছু কিছু পূর্বকীর্তি ঘোষণা করছিল। এই এদের কাজ, এই জন্তেই নিযুক্ত। কদিন ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন রাজার পারিষদদের কাছ থেকে এই সব বিবরণ সংগ্রহ করেছে। কর্ণ উঠতেও যথারীতি তাঁর নাম গুণাবলী প্রভৃতি ঘোষিত হ'ল।

নামটা শোনামাত্রই পাঞ্চালীর মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল, এখন তাঁকে অনায়াসে ধনুতে গুণ আরোপ করতে দেখে নিরুদ্ধ আবেগে ও আশঙ্কায় অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি, সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল। তখন আর অপেক্ষা কি ইতস্তত করার সময় নেই, তিনি ভ্রাতা ধৃষ্টদ্যুম্ন বা পিতা দ্রুপদের অনুমতি না নিয়েই স্পষ্ট কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'আমি সূতজাতীয়কে বিবাহ করব না, কর্ণ সফলকাম হলে তাঁকে বরমাল্য দেবার পূর্বে আমি বরং আত্মহত্যা করব।'

কথাগুলো কতকটা ঝোঁকের বশেই বলে উঠেছিলেন দ্রৌপদী। আঘাতটা আহত ব্যক্তিকে কতখানি বাজবে বা বাজতে পারে—তখন বোঝেন নি। এখন—বলে ফেলার পর—কিছুটা বুঝলেন হয়ত। কিন্তু আর উপায় কি? হাতের পাশা, ধনুর শর এবং মুখের কথা—একবার বেরিয়ে গেলে আর ফেরানো যায় না।

মহামতি কর্ণ হাসলেন। তিক্ত মধুর হাসি। দ্রৌপদীর মনে হ'ল বড় করুণও।

অতঃপর সাবধানে সন্তর্পণে জ্যা পুনর্মুক্ত করে ধনু নামিয়ে যথাস্থানে রেখে কর্ণ শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'কল্যাণী, আপনি সুখী হোন, সুস্থ থাকুন, আমার জন্য আপনাকে মৃত্যু কেন, কোন দুঃখবরণই করতে হবে না। আমি নিবৃত্ত হলাম।'

তারপর উর্ধ্ব আকাশের দিকে মুখ ক'রে স্বীয় আরাধ্য বিভাবসুকে প্রণাম —এবং সম্ভবত সেই সঙ্গে নিজের অন্তরের বেদনা—নিবেদন ক'রে ধীর গম্ভীর পদক্ষেপে নিজের আসনে এসে বসলেন।

ইতিমধ্যে পরদয়ানির্ভর সামান্য সূতপুত্রের স্পর্ধা ও দুঃসাহস নিয়ে যে বিদ্রূপগুঞ্জন উঠেছিল চারিদিকে, তা তাঁর কানে গেছে কিনা, কর্ণর মুখভাব দেখে কিছু বোঝা গেল না।

শ্রীকৃষ্ণ এতক্ষণ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে এই নাটক লক্ষ্য করছিলেন, বিশেষ ক'রে কর্ণকেই দেখছিলেন একদৃষ্টে। এবার অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'যাক, অর্ধেক কাজ তো হয়েই গেল। কর্ণ চিরশত্রু হয়ে রইল পাঞ্চালদের। এ দাগ কখনই মুছবে না ওর মন থেকে।'

॥ ৫ ॥

ইচ্ছা ও ঈপ্সার অভাব নেই, তবু সঙ্কোচ ও শঙ্কা যেন কাটতে চায় না।

রবাহূত দর্শকদের মধ্যে ব্রাহ্মণদের জন্য যে স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল, সেখানে শ্যামবর্ণের একটি যুবা অনেকক্ষণ থেকেই অস্থির হয়ে উঠেছে ; তার দুই হাতে, বাহুতে এবং স্কন্ধের মাংসপেশীতে একটা আক্ষেপ জেগেছে। অতি সহজ কাজ চোখের সামনে অপরকে পণ্ড করতে দেখলে কর্মঠ লোকের যেমন অসহ্য লাগে—এই তরুণ ব্রাহ্মণটিরও যেন তেমনি অসহ্য বোধ হচ্ছে মনে হ'ল।

এ অস্থিরতা ওর কিসের তা এতক্ষণে অনেকেই বুঝেছে। বেশির ভাগ লোকই বিদ্রূপ করছে ও অযাচিত ভাবে শান্ত হ'তে উপদেশ দিচ্ছে। যা বড় বড় ক্ষত্রবীররা পারছেন না—তা সামান্য ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণ করতে গেলে—উদ্যোগেই লোকে ধিক্কার দেবে, বাতুল ভাববে বৈকি। ভাবছেও তাই। মুখেও বলছে অনেকে—'এ কাজ করতে যেয়ো না, সত্যি সত্যিই উন্মাদ ভেবে যদি দৌবারিকরা সভা থেকে বার ক'রে দেয় তো সে বড় অপমান। সমগ্র ব্রাহ্মণ-সমাজই উপহসিত হবে সে ক্ষেত্রে।'

আবার দু-চারজন উৎসাহিতও করতে লাগলেন।

এত বড় বড় মহারথীরাই তো হেরে গেলেন, বিখ্যাত বিখ্যাত বীর নাকি সব। তাঁদের যদি এ প্রচেষ্টা বাতুলতা না হয়—দরিদ্র ব্রাহ্মণ বলেই ওকে উন্মাদ ভাববে আর সভা থেকে বার ক'রে দেবে? কেন? ধৃষ্টদ্যুম্ন তো সকলকেই আহ্বান করছেন। ব্রাহ্মণ তো বর্ণশ্রেষ্ঠ। তিনি যাকে খুশি গ্রহণ করতে পারেন। ক্ষত্রিয়ের মেয়ে? তাতে কি? 'স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি।' তাছাড়া এ মেয়ে অযোনিসম্ভূতা, হোমাগ্নিসম্ভবা, দেবতার বরে এর জন্ম—একে গ্রহণ করায় ব্রাহ্মণদের কোন দোষ নেই। আর চেষ্টা ক'রে দেখতে ক্ষতি কি?

ব্রহ্মতেজ বলে একটা কথা আছে তো, পেরে গেলেও যেতে পারে।...

উৎসাহিত করছিল ওর পাশে উপবিষ্ট অসুরাকৃতি অপর এক ব্রাহ্মণ যুবাও। বলছিল, 'যাও যাও, কোন ভয় নেই। কারও কথা শুনো না, তুমি নিশ্চয়ই পারবে। পৌরুষের এ অপমান বসে বসে দেখা যায় না। এ স্পর্ধা যদি গ্রহণ না করো তাহলে এতকালের শিক্ষা-দীক্ষাতেই ধিক! যাও যাও। যা হবার তা হবে।'

তবুও যুবকটির দ্বিধা যেন যায় না।

ইতিমধ্যে অবশ্য নৃপতিবর্গও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই। যাচ্ছেন অনেকেই —হতাশ হয়ে ফিরেও আসছেন। অমন যে দাম্ভিক চেদিরাজ শিশুপাল তিনিও ধনুতে গুণ পরাতে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। সম্রাট জরাসন্ধরও সেই অবস্থা। তাঁর কেয়ূর ও কণ্ঠহার ছিঁড়ে মণিমুক্তা ছিন্নমাল্যপুষ্পপলাশের মতো ছড়িয়ে পড়ল। অমিতবীর্য বলে খ্যাত মদ্ররাজ দূরে ছিটকে পড়লেন।

অবশেষে আর কোন রাজা বা ক্ষত্রবীর যখন অবশিষ্ট রইলেন না—মানে থাকলেও, আর কেউ সাহস ক'রে এগিয়ে যাচ্ছেন না, সভাকেন্দ্র শূন্য, বিশাল ধনু অনাদৃত পড়ে, ব্যাকুল ধৃষ্টদ্যুম্ন বার বার প্রতিযোগীদের আহ্বান করছেন— দ্রৌপদী শুষ্কমুখে নত-নেত্রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লান্তি অনুভব করছেন সেটা সকলেরই আলোচ্য হয়ে উঠেছে—তখন প্রায় মরীয়া হয়েই সেই শ্যামকান্তি ব্রাহ্মণ তরুণটি উঠে দাঁড়াল।

বলা বাহুল্য—এক্ষেত্রে যা হওয়া স্বাভাবিক তাই হ'ল।

চারিদিকে ধিক্কার ও বিদ্রূপের ঝড় উঠল যেন, গুঞ্জন ক্রমে কোলাহলের আকার ধারণ করল।

বামন হয়ে চাঁদ নয়—সূর্যে হাত বাড়াতে চায়—কে এই অর্বাচীন, এর ধৃষ্টতা আর দুঃসাহস তো কম নয়।

ধিক্কার ও উপহাসের তরঙ্গ উঠল ওর নিজের সমাজ ব্রাহ্মণদের মধ্যেই আরও বেশী যেন। অনেকেই বেশ সরব হয়ে উঠল, বলতে লাগল, 'বসে পড়ো, বসে পড়ো, আর লোক হাসিও না। পাগল নাকি এ ছোকরা! বার ক'রে দিক না কেউ এখান থেকে! দ্বার-রক্ষকরা কী করছে সব?'

আবার কেউ কেউ বললে, 'না হে, বড়ই বিয়োগান্ত হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা, এবার একজন বিদূষকের মঞ্চাবতরণ করাই প্রয়োজন। সে কাজটা এর দ্বারা হয়ে যাক না, ভালই তো!'

এতক্ষণ কোন স্পষ্ট প্রতিকূলতা না থাকা সত্ত্বেও যে রাজ্যের দ্বিধা, লজ্জা ও

জড়তা ওকে বাধা দিচ্ছিল—এই প্রবল ও সোচ্চার ধিক্কারে তা যেন নিঃশেষে কেটে গেল। কঠিন হয়ে উঠল যুবার মুখ, কঠিন হয়ে উঠল বাহু ও স্কন্ধের পেশী। একবার ভ্রূকুটিবদ্ধ প্রজ্বলন্ত দৃষ্টিতে সমালোচনাকারীদের দিকে তাকিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গেল ধনুর্বেদীর দিকে।

এতক্ষণ মাটিতে খর্জুর-পত্রাসনে বসে ছিল বলে অতটা দেখা যায় নি, এখন বেদীর কাছে গিয়ে উত্তরীয়টি কোমরে বেঁধে অনাবৃত-উর্ধ্বদেহে ঋজু হয়ে দাঁড়াতে বিদ্রূপ নিন্দাবাদের কোলাহল সহসা যেন স্তব্ধ হয়ে এল। শ্যামবর্ণ হোক, সুগঠিত দেহ এবং দৃপ্ত পৌরুষে এখন যেন বেশ সুপুরুষ বলে মনে হচ্ছে যুবকটিকে, আর—খুব একটা অনধিকারী বলেও বোধ হচ্ছে না। যে কাজ করতে এসেছে—তার কিছুটা গুরুত্ব বোঝে বলেও মনে হচ্ছে ওর ভাবভঙ্গী দেখে।

পাঞ্চালরাজনন্দিনী কৃষ্ণাও ক্লান্ত কৌতূহল এবং কিঞ্চিৎ তাচ্ছিল্যভরে মুখ তুলে চেয়েছিলেন, কিন্তু অকস্মাৎ তাঁরও ভাবান্তর ঘটল একটা। নিমেষ পুনর্বার পড়ার আগেই নীলপদ্মপলাশের মতো চোখ দুটির দৃষ্টি দীনবেশী শ্যামবর্ণ তরুণ ব্রাহ্মণকে দেখে মুগ্ধ হয়ে এল। পলক পড়লও না কিছুক্ষণ, নির্নিমেষ নেত্র যেন স্থির হয়ে গেল এই প্রতিযোগীর কান্তিতে। তাঁর বুকের মধ্যে আবারও এক আবেগের ও আশঙ্কার তুফান উঠল—তবে সে ভিন্ন কারণে। কর্ণকে দেখে আশঙ্কা হয়েছিল যদি পণে জয়লাভ ক'রে ফেলে, এখন ভয় হতে লাগল যদি পণ জিততে না পারে! ব্যাকুল চিত্ত বার বার মস্তিষ্কের দুয়ারে মাথা কুটতে লাগল—কোনরকমে কোন অছিলায় এখন শর্তটাকে সহজসাধ্য ক'রে দেওয়ার উপায় উদ্ভাবনে।...

আরও একজনের দৃষ্টি উজ্জ্বল ও মুগ্ধ হয়ে উঠেছিল এই দুঃসাহসী, চন্দ্রলোভী-বামনবৎ ব্রাহ্মণকে দেখে।

সে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণর।

তিনিও উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন ওকে দেখা মাত্র—পিছন দিক থেকে অসহিষ্ণু অনুযোগ উঠতে বসে পড়তে বাধ্য হলেন। কিন্তু তাঁর আনন্দ-অস্থিরতা চাপা রইল না। ভাগ্য সকলের দৃষ্টি তখন ঐ ব্রাহ্মণ যুবকটির ওপরই নিবদ্ধ ছিল, নইলে তাঁকে বাতুল ভাবত পার্শ্ববর্তীরা।

যুবকটি দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে ধনুর্বেদী পর্যন্ত এগিয়ে গেলেও অকারণ ব্যস্ততা বা অশোভন আগ্রহ দেখালেন না। মনে হ'ল কৃতিত্ব দেখিয়ে বাহবা পাওয়ার জন্য তেমন ব্যগ্র নন। বরং ধনুর সামনে এসে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে

রইলেন। যেন স্বেচ্ছা-আরোপিত এই দুরূহ কাজের গুরুত্বটা বুঝে নিলেন মনে মনে। তার পর সেই বেদী প্রদক্ষিণ ক'রে দেবাদিদেব মহাদেবকে স্মরণ করলেন, যুক্ত-করে ললাট স্পর্শ ক'রে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে অবলীলাক্রমে ধনুটি তুলে নিলেন। তার পর তাতে জ্যা রোপণ ও শরনিক্ষেপ কাজটা এত দ্রুত ঘটল যে লোকে ভাল ক'রে দেখতেও পেল না। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে সকলে দেখল প্রায় একসঙ্গেই পাঁচটি শর বিদ্ধ হবার ফলে লক্ষ্য-বস্তুটি খণ্ডবিখণ্ডিত হয়ে মাটিতে ছড়িয়ে পড়েছে।

এ যেন কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল।

তারপর যে তুমুল কাণ্ডটা হ'ল এর জন্য বোধ হয় যুবকটিও প্রস্তুত ছিল না। সভামধ্যে বিপুল কোলাহল উঠল, তার মধ্যে হর্ষধ্বনিই বেশী। ব্রাহ্মণদের তো কথাই নেই, উঠে দাঁড়িয়ে কমণ্ডলু উত্তরীয় অজিনাসন—যার যা সম্বল সেইগুলিই আন্দোলিত ক'রে হর্ষোচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে লাগলেন। উপর থেকে বিজয়ী বীরের মাথায় পুষ্পবৃষ্টি হ'তে লাগল, বাদ্যকররা তূর্য দামামা প্রভৃতি বাজাতে শুরু করলেন। সূতমাগধগণ স্তুতিপাঠ করতে লাগল। কেবল রাজন্যবর্গ ও তাঁদের পারিষদ অনুচররা প্রথমটা হতচকিত বিহ্বল হয়ে গেলেন—পরে ঘটনাটা সম্পূর্ণ উপলব্ধি ক'রে লজ্জায় অপমানে মাথা নত করলেন।

এর মধ্যে আর কেউ হয়ত তেমন লক্ষ্য করলেন না, বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ তাকিয়ে দেখলেন—প্রবল আবেগে পাঞ্চালতনয়া কৃষ্ণার যেন সুরাপায়ীর মতো ঈষৎ একটু মত্ততা এসেছে, তাঁর পা টলছে, সমস্ত শরীরই আন্দোলিত হচ্ছে প্রথম-উত্তরের-বাতাস-লাগা ধান্যশীর্ষের মতো। কৃষ্ণা একদৃষ্টে বিজয়ী বীরের দিকে তাকিয়ে আছেন, তাঁর সেই আয়ত নীল দুটি চোখে দৃষ্টির সমুদ্র যেন উত্তাল হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যেই তাতে সপ্রেম আকর্ষণের তরঙ্গ; মুখে কিছু বলতে পারছেন না, কিন্তু বাসুদেবের মনে হ'ল যা বলবার তা ঐ নীলোৎপল-পলাশ চক্ষু দুটি বলে নিচ্ছে, অনেক কথাই বলা হয়ে যাচ্ছে সেই সলজ্জ নীরবতায়। সে বলার প্রণয়গদ্‌গদ কণ্ঠ, বিজয়ী বীরের প্রতি নারীর স্বতোৎসারিত সেই স্তুতিগান যেন এখান থেকেই শুনতে পেলেন বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ।...

ভগ্নীর সেই আবেশবিহ্বল অবস্থার মধ্যেই ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁর হাত দুটি ধরে বিজয়ী বীরের কণ্ঠের দিকে এগিয়ে দিলেন, সে যুবাও সমবেত প্রবলতর হর্ষধ্বনির মধ্যে মাথা ঈষৎ নত ক'রে বরাঙ্গনার বরমাল্য গ্রহণ করলেন।

নৃপতিদের প্রাথমিক বিহ্বলতা ও লজ্জা কেটে যেতে বিলম্ব হ'ল না। অতঃপর যা অনুভব করলেন তাঁরা—তা হ'ল ক্রোধ। সীমাহীন প্রচণ্ড উষ্মা।

দ্রুপদ তাঁদের ডেকে এনে যে বাহ্যিক পরিচর্যা ও আপ্যায়নের চূড়ান্ত করেছেন—তার পিছনে নিশ্চয় এই অভিসন্ধিই ছিল, তাঁদের অপমান করা। যুদ্ধ ক'রে পেরে উঠবেন না তাঁদের সঙ্গে সেটা বিলক্ষণ জানেন—তাই এই কৌশল করেছেন।

ক্রোধ রিপুটাই এমন, যত তাকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় ক্রমশ ইন্ধন-পাওয়া-অগ্নির মতোই বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে ইন্ধনও পর্যাপ্ত—আহত আত্মাভিমান।

প্রথম যা বিক্ষোভপ্রধান ছিল দেখতে দেখতে তা আক্রমণাত্মক হয়ে উঠল। 'মার্ ঐ কুচক্রী রাজাটাকে, সবংশে ধ্বংস কর্।' সকলে সরবে বলতে লাগলেন। ব্রাহ্মণকে বধ করা সম্ভব নয়, নইলে ঐ ধৃষ্টটাকেও সমুচিত প্রতিফল দিতেন তাঁরা—এখন আসল নাট্যের যে গুরু, সেই দ্রুপদকে বধ ক'রেই ওঁরা নিজেদের অপমানের শোধ তুলবেন।

মানুষ যা করতে ইচ্ছা করে—তার স্বপক্ষে যুক্তিরও অভাব হয় না। দুর্যোধন প্রভৃতি রাজারা বলতে লাগলেন, 'ক্ষত্রিয় রাজকন্যার স্বয়ম্বরে ক্ষত্রিয় এবং নৃপতিদেরই অধিকার। ব্রাহ্মণ তো এর মধ্যে গণ্য হ'তেই পারে না। এ যদি আমরা নীরবে সহ্য করি তো আমাদের ক্ষাত্রশক্তিতেই ধিক। ঐ কন্যা যদি এখনও আমাদের কাউকে বরণ করে তো আমরা ছেড়ে দিতে রাজী আছি দ্রুপদকে, নইলে আগে ঐ মেয়েটাকে পুড়িয়ে মারব তারপর পাঞ্চাল রাজবংশের সকলকে শেষ করব।'

এই বলে—তাঁরা একপ্রকার বিনয়ের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলেন। উপস্থিত নৃপতিদের মধ্যে অপর কেউ কেউ যে বক্তার থেকে বেশী যোগ্য-পাত্র—উচ্চকণ্ঠে সে কথা ঘোষণা করতে লাগলেন। দুর্যোধন শাল্বকে বা ভগদত্তকে উঁচু করেন—বলেন, 'উনি এ কন্যা লাভ করলে আমার কিছুই বলার ছিল না', আবার শাল্ব বা শিশুপাল বা ভগদত্ত বলেন, 'না না, কুরুরাজ দুর্যোধন সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ পাত্র, তাকেই বরমাল্য দেওয়া উচিত ছিল পাত্রীর। বেশী কৌশল অবলম্বন করতে গিয়ে দ্রুপদ নিজের সর্বনাশ ডেকে আনলেন।'

দ্রুপদের একপ্রকার বিহ্বল অবস্থা তখন। কী করা উচিত—কী করলে সকল দিক রক্ষা পায় সে কথা চিন্তা করার মতো চিত্তস্থৈর্য নেই তাঁর। থাকা স্বাভাবিকও নয়। তিনি এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না আদৌ। স্বয়ম্বর সভার

উৎসব-লক্ষণযুক্ত কার্যক্রম যে এমন ভৈরবমূর্তি ধারণ করবে তা কে জানত! আর পণে বা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হ'লে লজ্জিত হয় মানুষ। অকর্মণ্যতার সে লজ্জা ঢাকতে এমন প্রচণ্ড হয়ে ওঠে, উঠতে পারে, তা তাঁর জানা ছিল না। সকল অভিজ্ঞতার অতীত। আর ব্রাহ্মণ যে লক্ষ্যভেদ করবে—এত ক্ষত্রবীর উপস্থিত থাকতে, তাই বা তিনি কেমন ক'রে জানবেন। এখন সকল রাজারা একত্র হয়ে (কলহের সময় এঁরা বেশ মিলিত হ'তে পারেন) তাঁর প্রতিই আক্রমণোদ্যত দেখে অনন্যোপায়ের মতো বিপন্নমুখে ব্রাহ্মণদের দিকেই চাইলেন।

যুদ্ধ-অনভিজ্ঞ ও সাধারণত জ্ঞানব্রতী ব্রাহ্মণরাও কিছু না বুঝেই আশ্বাস দিলেন, 'ভয় নেই, আমরা এই দণ্ডকমণ্ডলু নিয়েই যুদ্ধ করব মদগর্বিত ঐ অসভ্য বর্বরগুলোর সঙ্গে।'

তাঁরা নিজেদের সদভিপ্রায় প্রমাণের জন্যে আগেকার হর্ষোৎসবের মতোই—যার যা ছিল—মৃগচর্ম ও কমণ্ডলু নাড়তে লাগলেন।

শস্ত্রজীবী ক্ষত্রিয়রা শাস্ত্রজীবী নিরীহ ব্রাহ্মণদের এ স্পর্ধা—তাঁদের মতে ধৃষ্টতা—নীরবে সহ্য করবেন তা সম্ভব নয়। তাঁরা 'মার মার' শব্দ ক'রে তেড়ে এলেন—একদল দ্রুপদদের দিকে, আর একদল ব্রাহ্মণদের দিকে। অসুবিধার মধ্যে যিনি এঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিমান সেই সম্রাট জরাসন্ধ সর্বসমক্ষে পরাজিত হওয়ার লজ্জাতে সঙ্গে সঙ্গেই সভা ত্যাগ ক'রে তৎক্ষণাৎ মগধাভিমুখে রওনা দিয়েছেন।...তা হোক, যাঁরা আছেন—এই ক্ষুদ্র পাঞ্চাল দেশের পক্ষে তাঁরাই যথেষ্ট। দুর্যোধন, কর্ণ, শল্য, শাল্ব, রুক্মাঙ্গদ, শিশুপাল—এঁরা সকলেই প্রখ্যাত যোদ্ধা, এঁদের সাঙ্গপাঙ্গরাও যাকে বলে রণদুর্মদ।

ব্রাহ্মণরা কিছুই পারতেন না—এইসব যোদ্ধা ধনুর্ধরদের সামনে মুহূর্তমাত্র দাঁড়ানো সম্ভব ছিল না তাঁদের পক্ষে—কিন্তু সেই যে বলিষ্ঠ যুবকটি এই বিজয়ী তরুণের পাশে বসে ছিল এবং ইতিপূর্বে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছে তাকে প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্যে, সে এবার উত্তরীয়খানা কোমরবন্ধ হিসাবে বেঁধে উঠে দাঁড়াল। তারও হাতে অস্ত্র নেই, কিন্তু তাতে বিশেষ বাধা হ'ল না। এদিক ওদিক চেয়ে দেখে—সামনেই একটি শালগাছ ছিল—সবলে সেটি উপড়ে এনে হাতে ক'রেই, যেন পলককাল মধ্যে তাদের শাখাপ্রশাখা মুক্ত ক'রে দণ্ডের মতো বাগিয়ে ধরল।

ক্ষত্রিয় রাজারা ততক্ষণে নিজেদের আসন ছেড়ে এগিয়ে এসেছেন। কিন্তু দেখা গেল, তাঁদের পক্ষে সকলেই যে এই অসূয়া ও আশাভঙ্গজনিত আক্রমণ সমর্থন করেন তা নয়।

বলদেব বললেন, 'কী আশ্চর্য ! ছেলেটি নিজের শক্তিতে পণ জিতেছে। দ্রুপদের শর্তই ছিল যে, যে জিতবে তাকেই মালা দেবেন তাঁর কন্যা—এ তো জেনেশুনেই এসেছে সকলে। একজন জিতবে বাকী সকলে বিফল হবে এও তো জানাই—কর্ণকে যে প্রত্যাখ্যান করেছে সেটা বরং কন্যারই অন্যায়, প্রতিবাদ করতে হ'লে তখনই করা উচিত ছিল—এখন এ বেচারার ওপর এমন খড়্গহস্ত হয়ে ওঠার কারণ কি ? চলো, আমরা ঐ ব্রাহ্মণ বালক-ছুটিকে রক্ষা করি গে—'

তিনি বলতে বলতে এগিয়েই যাচ্ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর হাত ধরে নিরস্ত করলেন। বলদেব এবার ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন, বললেন, 'তবে এ অত্যাচার-অবিচার নীরবে দাঁড়িয়ে দেখবে, কিছুই করবে না ?'

'আমাদের কিছুই করতে হবে না আর্য—', বাসুদেব সবিনয়ে অথচ প্রচ্ছন্ন কৌতুকভরা কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'যা করবার তা ঐ যুবক ছুটিই করবে।'

'ওরা তো বালক মাত্র, যতই গায়ে জোর থাক্—এতগুলি বীর যোদ্ধার সঙ্গে পেরে উঠবে কেন ?' বলদেব ভ্রূকুটি ক'রে প্রশ্ন করেন, ভাইয়ের কথার যথার্থ অর্থ টা বোঝবার চেষ্টা করেন।

'ওরা বালক, কিন্তু সাধারণ বালক তো নয়। আপনি কি ওদের চিনতে পারেন নি ?'

'চিনতে— ? কৈ না তো ! কে ওরা ? তুমি চেনো নাকি ?' বলদেব বিহ্বলভাবে প্রশ্ন করেন।

'সত্যিই চিনতে পারেন নি ?…আশ্চর্য !' বাসুদেব যেন এতটা অজ্ঞতা জ্যেষ্ঠের কাছে আশা করেন নি এমনি ভাবেই উত্তর দিলেন, 'যে লক্ষ্য ভেদ করল সে তৃতীয় পাণ্ডব, অর্জুন। আর ঐ মল্লযোদ্ধার মতো একটি গাছ হাতে প্রস্তত হয়ে—সে-ই ভীম। আপনার—আমাদের পিতৃস্বসা-পুত্র।'

'সে কি ! তারা তো মৃত। বারণাবতে পুড়ে মরেছে।' বিহ্বল কণ্ঠে প্রশ্ন করেন বলদেব।

'বারণাবতের জতুগৃহে ওদের মৃত্যু ঘটেছে, এ কি আপনি সত্যিই বিশ্বাস করেছিলেন নাকি ? অত সহজে ওদের বধ করা যাবে না। ঐ রকম সামান্য ইতর জীবের মতো অপঘাতে মৃত্যুর জন্য ওরা জন্মগ্রহণ করে নি।'…

'এ তুমি জানতে ?' বলদেব প্রশ্ন করেন।

'জানতুম বৈ কি—ঐ চেয়ে দেখুন মহাধনুর্ধর কর্ণের দুরবস্থাটা।'

চুম্বক যেমন ক'রে লোহাকে আকর্ষণ করে, তেমনিই বোধ হয় অর্জুনও

কর্ণকে আকর্ষণ করেছিলেন। অথবা ভেবেছিলেন সমরানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণদের মধ্যে এই ধনুর্বীর ছাড়া তাঁর আক্রমণের যোগ্য আর কেউ নেই।...অবশ্য তাকেও যথেষ্ট বলে মনে করেন নি প্রথমটায়, একটু যেন অবহেলার সঙ্গেই ধনুতে শর-যোজনা করতে গিছলেন; সুতরাং বিস্ময়টাই তাঁকে অধিকতর বিমূঢ় ক'রে দিল।

অর্জুনের সঙ্গে ধনুক ছিল না—ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের বেশে এসেছেন—কিন্তু লক্ষ্যভেদের ধনুক তো পড়েই আছে, তিনি চোখের নিমিষে ধৃষ্টদ্যুম্নর তূণ থেকে কিছু শর সংগ্রহ ক'রে—কর্ণ ভাল ক'রে ধনুকটা বাগিয়ে ধরার আগেই তাঁর সেটাকে কেটে দুখানা ক'রে দিলেন। কর্ণ আবারও তার অনুচরের কাছ থেকে একটি ধনু নিয়ে শরযোজনা করতে যাবেন, আবার সেই অবস্থা। কর্ণর এবার কিছু চৈতন্যোদয় হ'ল। তিনি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'ব্রাহ্মণ, তুমি কে, সত্য ক'রে বল দেখি? আমার গুরু পরশুরাম এবং অর্জুন ছাড়া এমন আশ্চর্য ক্ষিপ্রতা তো আর কারও দেখি নি! এমন আশ্চর্য লক্ষ্যজ্ঞানও না।'

অর্জুন হেসে বললেন, 'আমি সামান্য লোক, এক ব্রাহ্মণের কাছেই আমার অস্ত্রশিক্ষা। কিন্তু আপনি এতে বিস্মিত হবেন কেন, আপনার শস্ত্রপ্রয়োগের খ্যাতি তো ভারতবিখ্যাত। আপনি অন্য ধনু নিন, আমি কথা দিচ্ছি এবার আপনার ধনু অক্ষত থাকবে।'

'না থাক্।' কর্ণ ঘাড় নাড়লেন, 'তোমার এ ঔদার্য তোমার শিক্ষারই উপযুক্ত। কিন্তু বোধ হয় ব্রাহ্মণের সঙ্গে স্পর্ধা প্রকাশ করতে যাওয়াই ভুল হয়েছে।'

এই বলে নিরাসক্ত দর্শকের মতো তিনি একটু দূরে সরে দাঁড়ালেন।

এদিকে ভীমও প্রলয় কাণ্ড বাধিয়ে তুলেছেন। দুর্যোধন তো আগেই কাবু হয়েছেন। তাঁর দুর্দশা দেখে শল্য এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ মল্লযোদ্ধা, অসুরের বল তাঁর দেহে—কিন্তু তাতেও সুবিধা হ'ল না—পর পর কয়েকবারই ভীম তাঁকে তুলে আছাড় মারলেন।

এবার—যে সব নৃপতির দল মহোৎসাহে 'মার মার' শব্দে তেড়ে এসেছিলেন, তাঁরা একটু থমকে দাঁড়ালেন।

তাঁদের যেন একটু একটু ক'রে সুবুদ্ধির উদয় হচ্ছে এবার। এই দুটি ব্রাহ্মণ তরুণ যে সাধারণ ভিক্ষুক নন—তা বেশ বুঝেছেন ততক্ষণে। এখন কি ক'রে মানে মানে মিটিয়ে ফেলা যায় সেই চিন্তা, বিশেষ অন্য সব ব্রাহ্মণরা

তাঁদের দুর্দশা দেখে যে বিদ্রূপ শুরু করেছেন, তার কোন উত্তর দেওয়া যাচ্ছে না, সেইটাই আরও অসহ্য হয়ে উঠেছে।

শ্রীকৃষ্ণ যেন এই মুহূর্তটিরই প্রতীক্ষা করছিলেন। শান্ত হয়েই দাঁড়িয়ে ছিলেন কিন্তু তাঁর আয়ত চোখ দুটি এই সাময়িক রণক্ষেত্রের সব ঘটনাই স্থির ভাবে লক্ষ্য করছিল। যেন বলদর্পী নৃপতিদের স্পর্ধা প্রকাশের এ পরিণাম তাঁর জানা ছিল, তাঁদের অধিকতর লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করবারই উপযুক্ত সময়টির অপেক্ষা করছিলেন তিনি। সে সময় সমুপস্থিত দেখে এবার তিনি ঐ ক্ষুদ্র রণাঙ্গনটির দিকেই এগিয়ে গেলেন।

এত অকস্মাৎ প্রস্তরবৎ স্থির মানুষটি সচল হয়ে উঠলেন যে সেটা লক্ষ্য করতেই কিছু সময় লাগল বলদেবের। সুতরাং কী উদ্দেশ্যে তিনি ঐ গোল-মালের মধ্যে যাচ্ছেন তাও জানা গেল না। তবু, যদি ঐ যুদ্ধে যোগদানের জন্যেই গিয়ে থাকেন তবে তাঁকে সাহায্য করার জন্য ওঁরও যাওয়া উচিত বিবেচনা ক'রে দৃঢ় বজ্রমুষ্টিতে তাঁর গদাটি বাগিয়ে ধরলেন কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বুঝলেন তার কোন প্রয়োজন নেই।

মদমত্ত করী বা উন্নতগ্রীব সিংহকে আগমনোদ্যত দেখলে মানুষ যেমন সভয়ে তাকে পথ ছেড়ে দু'পাশে সরে যায়—বলদেব দেখলেন প্রসন্নগম্ভীর মুখে বাসুদেবকে নিরস্ত্র নির্ভয়ে অগ্রসর হতে দেখে আহবী ও দর্শক উভয় দলই সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিচ্ছে।

শ্রীকৃষ্ণ সেই বিবদমান জনতার ঠিক মধ্যস্থলে এসে দুই হাত তুলে সকলকে নীরব ও নিরস্ত হ'তে ইঙ্গিত করলেন, তারপর প্রধানত রাজন্যবর্গকেই সম্বোধন ক'রে বললেন, 'হে ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ, আপনারা দয়া ক'রে অস্ত্র সম্বরণ করুন। ব্রাহ্মণ অবধ্য, নিরস্ত্র ব্রাহ্মণদের সঙ্গে যুদ্ধ করা আপনাদের মতো শস্ত্রকৌশলী মহাবীরদের শোভাও পায় না। ক্ষত্রিয়দের ধর্ম যেমন সমযোদ্ধার সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করা, তেমনি আর একটি ধর্ম তথা প্রধান কর্তব্য হ'ল ব্রাহ্মণদের সর্বদা রক্ষা করা, তাদের তপস্যা ও জ্ঞানচর্চার বিঘ্নউৎপাদনকারীদের উৎপাত থেকে নিরাপদ রাখা। এঁরা আপনাদের উষ্মার যোগ্য নন। আর দেখুন—দ্রুপদের স্বয়ম্বর-শর্ত জেনেই আপনারা এই প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এই যুবা সম্যকভাবে সেই শর্ত পালন করেই পণে জয়লাভ করেছেন। কন্যাও যথাবিহিত এর গলায় মাল্য অর্পণ করেছেন। সে অন্যপূর্বা কন্যা নিয়েই বা আপনারা কি করবেন! আপনারা এখন যে ক্রোধ ও বিরক্তি প্রকাশ করছেন তা একেবারেই বালকোচিত হয়ে পড়ছে। আপনারা শান্ত হোন। এ যুবার পরিচয়ও তো

আপনারা জানেন না। অজ্ঞাত-কুলশীল কারও সঙ্গে যুদ্ধ করা কোন অভিষিক্ত নৃপতির যোগ্য নয়। ঐ দেখুন মহাধনুর্ধর কর্ণ—উনি শুধু মহাযোদ্ধাই নন, মহাবুদ্ধিমানও বটে—উনিও তো প্রথমটা আপনাদের নির্বন্ধে ও সাময়িক উত্তেজনায় আপনাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এ আচরণের মূঢ়তা বুঝে প্রতিনিবৃত্ত হয়েছেন। আপনারাও মহামতি কর্ণর পন্থা অনুসরণ করুন—তাতে শ্রেয় লাভই হবে।'

নৃপতিরাও পশ্চাদপসরণের এই রকম একটা যথাসম্ভব সসম্ভ্রম পথই খুঁজছিলেন। এই দুই ব্রাহ্মণ যুবার যে বাহুবল ও শস্ত্রবলের নমুনা পেয়েছেন তার চেয়ে বেশী পাবার আকাঙ্ক্ষা আর নেই। বোধ করি গ্রহ বিরূপ—আজ তাঁদের অপমানিত হবারই দিন—কে জানে এখনও মানে মানে প্রতিনিবৃত্ত না হলে আরও কি অধিকতর দুর্ভোগ অদৃষ্টে আছে।

তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের এই আবেদনে বেঁচে গেলেন, মহাবিজ্ঞের মতো পরস্পরকে সম্বোধন ক'রে বলতে লাগলেন, 'ওহে, যদুকুলশ্রেষ্ঠ বাসুদেব সঙ্গত কথাই বলেছেন। অকারণে উত্তেজিত না হয়ে ওঁর পরামর্শে কর্ণপাত করাই উচিত। সত্যিই তো, এ দুটি অর্বাচীনের তো পরিচয়ও আমরা জানি না—এদের সঙ্গে যুদ্ধ করা আমাদের একেবারেই অনুচিত কাজ হবে। পরিচয় পাই, তারপর উপযুক্ত সময়মতো এ ধৃষ্টতার প্রতিফল দিলেই হবে।'

ক্রোধের ও ক্ষোভের সমুদ্রে যে আক্ষেপ ও আবর্তের সৃষ্টি হয়েছিল, যে তরঙ্গ দেখা দিয়েছিল—একটু একটু ক'রে তা শান্ত ও স্বাভাবিক হয়ে এল ; ঈর্ষা ও লালসার বহ্নি বাস্তব যুক্তির বালুকানিক্ষেপে নির্বাপিত না হোক, আপাতত নির্ধূম বোধ হতে লাগল। রাজারা একে একে সক্ষোভ নিঃশ্বাস ফেলে নিজেদের বলদর্পের প্রতিফল পরিপাক করার চেষ্টা করতে করতে যে যার স্কন্ধাবার অভিমুখে যাত্রা করলেন।

নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন রাজা দ্রুপদও। একে তো কন্যা কোন্ ভিখারী ব্রাহ্মণের গলায় মালা দিল, তার কি ভবিষ্যৎ—সেই দুশ্চিন্তায় অস্থিরতার শেষ ছিল না—তার ওপর এই মহাহবের সূচনা দেখে তিনি আশঙ্কায় কাষ্ঠবৎ হয়ে নিঃশ্বাস রোধ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিলেন এতক্ষণ। একবার কৌরবদের হাতে যে লাঞ্ছনা ঘটেছিল সে স্মৃতি মন থেকে আজও বিদূরিত হয় নি। বাসুদেব ধন্য, তিনি আজ মহাবিপদ থেকে পাঞ্চালরাজ্যকে রক্ষা করলেন।

এদিকে নিশ্চিন্ত হ'তে দ্রুপদ আবার তাঁর পূর্ব উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তায় ফিরে গেলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নকে বললেন, 'তুমি যথাসম্ভব অলক্ষ্যে ঐ ব্রাহ্মণদের অনুসরণ

করো। অন্যান্য চরদেরও সেই নির্দেশ দাও। কৃষ্ণাকে ওরা কোথায় নিয়ে গিয়ে তোলে—ওদের অবস্থা কি রকম—না জানা পর্যন্ত আমার স্বস্তি নেই!'

এই প্রচণ্ড কোলাহল—বহুলোকের উত্তেজিত কথোপকথন, বহুমুখী জনস্রোতের সংঘাত—এর মধ্যেই বাসুদেব এগিয়ে এসে অর্জুনের কাঁধে হাত রেখে মৃদুকণ্ঠে সম্বোধন করলেন, 'পার্থ!'

তারপর, অর্জুন যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হয়ে ফিরে তাকাতে তেমনি নিম্ন কণ্ঠে বললেন, 'আমি তোমার মাতুলপুত্র যদুবংশোদ্ভব বাসুদেব। আমি তোমাকে অনেকক্ষণই চিনেছি। তোমাকে দেখব বলে তোমার জন্যই এই স্বয়ম্বরে আসা আমার। তুমি বধূকে নিয়ে এগিয়ে যাও। আর্যা কুন্তীকে প্রণাম করতে আমি পরে যাচ্ছি।'

॥ ৬ ॥

যুধিষ্ঠির ঠিক এ অবস্থার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না।

ক্ষুধা-তৃষ্ণা, এতক্ষণের উত্তেজনা-জনিত শ্রান্তি আর তাঁকে অবসন্ন ক'রে রাখতে পারল না; এই নূতন সমস্যাটা তাঁর মস্তিষ্ককে সক্রিয় ও বিষম বিচলিত ক'রে তুলল।

ধর্মরক্ষার চিন্তা চিরদিনই তাঁর কাছে অগ্রগণ্য, ধর্ম তাঁর ঐহিক সকল ভোগ সকল অনুভূতির চেয়ে প্রিয়। আজও জীবনের প্রত্যক্ষ ও বাস্তব প্রয়োজনগুলির থেকে সেই চিন্তাই তাঁর কাছে প্রবল ও প্রধান হয়ে উঠল।

যিনি ধর্মকেই একান্তভাবে ধারণ ক'রে থাকেন—তাঁকে সদাসতর্ক থাকতে হয়, বহু বিবেচনা ক'রে জীবনের পথে চলতে হয়। হঠকারিতার পরিণাম প্রায়ই শুভ হয় না, অন্যায়ের দিকেই তার সহজগতি। যুধিষ্ঠির চিরদিনই—বাক্যে কার্যে চিন্তায় বিবেচনায়—সংযত, ধীর। সহসা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। এজন্য বলশালী ক্রোধী মধ্যম পাণ্ডব মধ্যে-মধ্যেই অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন—অগ্রজ সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা প্রকাশের আশঙ্কা সত্ত্বেও সব সময়ে রসনা সম্বরণ করতে পারেন না।

আজও যুধিষ্ঠির মায়ের কথা শুনে কুটিরের দ্বারপ্রান্তেই স্তব্ধ প্রস্তরবৎ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। মাতা কুন্তী যা বললেন—বার বার সেই কথাগুলিই মনে মনে আবৃত্তি ক'রে যেন এই সমস্যার কুটিল গহনবর্ত্ম থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার ছিদ্রপথ খুঁজতে লাগলেন।

কুন্তীও বিভ্রান্ত বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। এ অবস্থা তাঁর কাছেও অভূতপূর্ব, তাই এ থেকে মুক্তির উপায়ও চিন্তা করতে পারছেন না।

পুত্রেরা স্বয়ম্বর সভায় গেছে তিনি জানতেন। তাই বলে সহায়সম্বলহীন অজিনাসনসম্বল চীরবল্কলধারী ভিক্ষুক-ব্রাহ্মণবেশী রাজপুত্ররা যে সেই স্বয়ম্বরের পণরক্ষা ক'রে দেবাংশজাতা জন্ম-কিশোরী অপরূপা কন্যাকে জয় ক'রে নিয়ে আসবে তা একবারও আশা করেন নি। আর তা করেন নি বলেই ভীমের সানন্দ-গম্ভীর বাক্যগুলির কোন বিশেষার্থ তাঁর কানে ধরা পড়ে নি। 'মা আমরা আজ কী ভিক্ষা এনেছি দেখুন'—এ কথাগুলিকে সহজ সরল ভাবেই গ্রহণ করেছেন।

ভিক্ষায় কিছু অভিনবত্ব আছে—তা ঐ একাক্ষর 'কী' শব্দে ও কণ্ঠের আনন্দ উচ্ছলতায় উপলব্ধি করলেও সে সম্বন্ধে অনুমান সুখাদ্য, সুমিষ্ট ফল বা মূল্যবান বস্ত্রাদির পথ ধরেই চিন্তাকোষে প্রবেশ করেছিল। তাই বিনাদ্বিধায় কিছুমাত্র অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না ক'রেই বলেছেন—'যা এনেছ তা সবাই মিলে ভোগ করো।'

বলতে বলতেই কুটিরের অভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে এসেছেন পাণ্ডুমহিষী, দৃষ্টি পড়েছে শ্যামাঙ্গী অথচ অবর্ণনীয়া সুন্দরী কন্যার দিকে; তার সর্বাঙ্গে মণিমানিক্যের আভরণ, কণ্ঠের গুঞ্জামালা ও রক্তবর্ণ চেলাংশুকে রাজকন্যা বলে চিনতেও ভুল হয় নি। সঙ্গে সঙ্গেই থমকে দাঁড়িয়ে গেছেন, ললাটে করাঘাত করেছেন তিনি। নিজের নির্বুদ্ধিতা বা অবিমৃষ্যকারিতার পরিণাম থেকে রক্ষা পাবার জন্য যেন অস্থির ব্যাকুল হয়ে উঠে চারিদিকে তাকিয়ে দেখেছেন, চোখ পড়েছে ধীর স্থির প্রশান্তললাট জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবের দিকে, দ্রৌপদীর হাত ধরে দ্রুত এগিয়ে এসে সকাতরে বলেছেন, 'বৎস, আমি না জেনে-বুঝে অন্যায় ক'রে ফেলেছি—এখন তুমি এর একটা প্রতিকার করো, আমার বা এই বধূর কোন পাপ না হয়। যাতে আমি অনুচিত বা মিথ্যা কথনের দায় থেকে এবং ইনি বহুচারিণীত্বের দোষ থেকে অব্যাহতি পান, সেইরকম একটা উপায় নির্দেশ করো।'

জননী কুন্তী যুধিষ্ঠিরের ওপর সমস্ত দায়িত্ব চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির কার ওপর সেটা চাপাবেন? আশৈশব ধর্মাশ্রয়ী, ধর্মভীরু তিনি—সেজন্য অনেকে তাঁকে ধর্মরাজ, ধর্মপুত্র বলে। কেমন ক'রে ধর্ম-নির্দিষ্ট পথে এই উভয় সংকট উত্তীর্ণ হবেন, জটিল সমস্যার সমাধান করবেন—এই চিন্তায় তাঁর মতো স্থিতধী লোকও কিছুকালের জন্য যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন।

অথচ বেশী বিলম্ব করারও অবসর নেই। তাই সম্পূর্ণ মনোমত সিদ্ধান্তে না পৌঁছতে পারলেও—আপাতত যেটাকে উচিত বলে মনে হ'ল তাই করলেন —অর্জুনের দিকে ফিরে বললেন, 'ফাল্গুনী, তুমি স্বয়ম্বরের পণ জিতে এই কন্যাকে লাভ করেছ, ধর্মত এ বধূ তোমারই। তুমিই শাস্ত্রানুসারে একে বিবাহ করো।'

অর্জুন লজ্জায় ঈষৎ মাথা নত ক'রে বললেন, 'তা কেমন ক'রে হয়! আপনি ও মহাবাহু বৃকোদর আমার জ্যেষ্ঠ, আপনাদের বিবাহ না হলে আমি কেমন ক'রে বিবাহ করব! আমি যদি আপনাদের আগে বিবাহ করি বা নকুল সহদেব আমাদের তিনজনের পূর্বে বিবাহ করে—তাহলে ধর্মে পতিত হতে হবে না কি? আপনি দয়া ক'রে এ নির্দেশ প্রত্যাহার করুন।'

ভীম—অনুজের কথা ভাল ক'রে শেষ হবার আগেই প্রায়—বলে উঠলেন, 'আর তাহলে মা'র আদেশ? তাঁর বাক্য রক্ষার কি হবে?'

যুধিষ্ঠির একটু বিস্মিত হলেন।

কথাগুলো তাঁর কানে কেমন যেন অস্বাভাবিক বোধ হ'ল। সুষম জীবনবোধে কোথায় একটা ছন্দপতন ঘটছে। শব্দগুলো যেন একটা প্রবল আঘাত করল তাঁর শ্রুতিতে। আঘাত করল তাঁর মনকেও। অনভ্যস্ত, বেসুর বলে মনে হ'ল। মনে হ'ল এই ব্যগ্রতার মধ্যে প্রাকৃতজনের মতো কোথায় একটা স্থূল লোভ প্রকাশ পাচ্ছে।

তিনি বিস্মিত হয়েই মুখ তুলে তাকালেন।—তিনি যে মুখ তুলে তাকিয়েছেন ভীম সে সম্বন্ধে অবহিত নন। ইতরজনের মতো সকলপ্রকার ভব্যতা ভুলে মুগ্ধ অপলক নেত্রে দ্রৌপদীর দিকে তাকিয়ে আছেন।

শুধু তাই নয়—এবার আরও একটি আঘাত লাগল তাঁর চোখে—অথবা বলা যায় একটি নবীন জ্ঞান লাভ হ'ল।

কারণ এবার অন্য ভ্রাতাদের দিকেও চেয়ে দেখলেন; এঁদের শিক্ষা ও মার্জিত আচরণ সম্বন্ধে অগাধ আস্থা তাঁর—কিন্তু দেখলেন, ওঁদেরও সেই অবস্থা। শুধু অর্জুন বাদে। অর্জুন সেই থেকে লজ্জাবনত অধোবদনে মাটির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

আরও দেখলেন যুধিষ্ঠির।

দেখলেন, দৌপদীও ইতিমধ্যে আপাতনত মুখের বক্রকটাক্ষে ক্রমান্বয়ে তাঁদের পাঁচ ভাইয়ের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছেন। তাঁর আলোল দৃষ্টিতে স্পষ্ট মুগ্ধতা। মুখে এক ধরনের ঈপ্সাতুর হাসি।

আর, এইবার আরও যে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা বাকী ছিল, সেটাও লাভ করলেন যুধিষ্ঠির।

অনুভব করলেন, তিনি নিজেও এই পদ্মপলাশাক্ষী ঘনকৃষ্ণবিপুলকেশা, দিব্যজ্যোতিঃসমন্বিতা কান্তিমতী কন্যাকে দেখে দেহে ও মনে একটা অননুভূতপূর্ব চাঞ্চল্য অনুভব করছেন ; সম্ভবত একেই আসক্তিজনিত উত্তেজনা বলে।

এক মুহূর্তের বেশি নয় অবশ্য।

সঙ্গে সঙ্গেই—প্রথমে কতকটা বলপূর্বক দৃষ্টি সম্বরণ ক'রে নিয়ে—যুধিষ্ঠির আবারও বিপন্ন মুখে মায়ের দিকে চাইলেন। যেন কি বলতে গিয়েও বলতে পারলেন না।

কথাটা মা'র মুখ থেকেই বেরিয়ে আসবে এই অবিশ্বাস্য আশায় প্রতীক্ষা ক'রে রইলেন।

যুধিষ্ঠির ও তাঁর বাকী চার ভ্রাতার এ বিড়ম্বনা এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা কতক্ষণ স্থায়ী হ'ত তা বলা কঠিন কিন্তু অকস্মাৎ সেই সামান্য কুম্ভকার-গৃহের সামনে রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দ উঠতে—উচ্চাবচ কঠিন মৃত্তিকায় যেমন শব্দ ওঠে,—সাত জনেই সচকিত, পাণ্ডবরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন।

এ পথে রথ আসে না কখনই। পথই নেই এখানে। চারিদিকে শস্যক্ষেত্র, তার উপর দিয়েই বলিবর্দবাহিত দ্বিচক্রযান যাতায়াত করে মাত্র। এতদিন পাণ্ডবরা এখানে আছেন, কাউকে এখানে রথ চালনার চেষ্টাও করতে দেখেন নি।

সম্ভবত দ্রুপদই লোক পাঠিয়েছেন কন্যার তত্ত্ব নিতে। হয়ত বা ভিক্ষুকগৃহে কন্যা কষ্ট না পায় সেই কারণে শয্যা ও অপরাপর বিলাসদ্রব্য পাঠিয়েছেন। কিংবা, আশাহত নৃপতিদের দুষ্টবুদ্ধি পুনর্জাগ্রত হওয়াও একেবারে অসম্ভব নয়। ওখানে বহুলোকের মধ্যে যে অসুবিধা হয়েছিল, এখানে এই বিজনস্থানে সে অসুবিধার কারণ নেই, সেই সুযোগ নিতেই কেউ কেউ এসেছেন হয়ত।

ভীম চকিতে তাঁর গদার কথা স্মরণ করলেন, অর্জুন ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কুটির-মধ্যে প্রবেশ ক'রে ধনুর্বাণ ও তূণীর সংগ্রহ ক'রে আনলেন।

কিন্তু দেখা গেল যা ভেবেছিলেন বা যাঁদের কথা ভেবেছিলেন তাঁরা কেউ নন। রথ থেকে যাঁরা নামলেন, পাণ্ডবদের অপরিচিত হলেও কুন্তী তাঁদের চেনেন। কিছু পূর্বে অর্জুনও তাঁদের পরিচয় পেয়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব।

চিনতে পারলেও তখনই চেনাতে পারলেন না পাণ্ডুমহিষী। তিনি এতই বিস্মিত হয়েছিলেন যে কিছুকাল তাঁর মুখ দিয়ে কোন বাক্যস্ফূর্তি হ'ল না।

অবশ্য বাসুদেব তাঁর পরিচয় করানোর জন্য অপেক্ষাও করলেন না, এগিয়ে এসে কুন্তীর পাদবন্দনা ক'রে যুধিষ্ঠিরের দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনি আমাদের হয়ত এখনও ঠিক চিনতে পারেন নি, আমি আপনাদেরই আত্মীয়, আপনার মাতুলপুত্র। জননীর পৃথা আমাদের পিতৃষসা। আমি যাদব বংশের বসুদেবপুত্র শ্রীকৃষ্ণ, আর ইনি আমার অগ্রজ বলদেব।'

চিনতে পেরেছেন অবশ্য এঁরা সকলেই—তবে এ পরিচয়ে নয়।

এই দীপ্তিমান পুরুষটিই কিছু পূর্বে নিজের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিচাতুর্যে এক বিপুল সংঘর্ষ নিবারণ করেছেন, অকারণ রক্তক্ষয় বন্ধ ক'রে এক বিষম বিপদ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। বিপদ—সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। ভারতের প্রায় সর্বপ্রান্তের বীর নৃপতিরা একদিকে, অপরদিকে তাঁরা নিরস্ত্র পাঁচটি ভাই। তাঁরা যত বড় বীর ও রণকুশলীই হোন—এ অসম যুদ্ধের পরিণাম কি হ'ত তা বলা কঠিন। সময় বুঝে এই ব্যক্তিটি যথাযথ বাক্যগুলি প্রয়োগ না করলে এই অশুভ সংঘটন বন্ধ হ'ত না। অন্তত চক্ষুলজ্জার খাতিরেও রাজারা সহসা নিবৃত্ত হতে পারতেন না। অবস্থা বুঝেই সেই লজ্জার দায় থেকে তাঁদের উদ্ধার ক'রে যুদ্ধ বন্ধ করেছেন ইনি।

তা হলেও—এই অসামান্য বুদ্ধিমান দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কূটকৌশলী ব্যক্তিটি যে তাঁদের আত্মীয়—তা একবারও মনে করেন নি। কল্পনা এতদূর পৌঁছানো সম্ভব নয়।

তবু, এই মাত্র অল্পদিনের জীবনেই ভাগ্য তাঁদের নিয়ে এত বিচিত্র খেলা খেলেছেন, এত রকমের অবস্থা-বিপর্যয় ঘটেছে যে, তাঁরা সহজে আর বিস্ময়ে বিচলিত কি বিহ্বল হন না। বিস্মিত হলেও সে মনোভাব সত্বর দমন করতে পারেন। তাই যুধিষ্ঠির—বয়সের-হিসাব-সঠিক-না-জানায়-ঈষৎ দ্বিধাগ্রস্ত প্রণামেচ্ছায় আনত—বাসুদেবকে সবল আকর্ষণে আলিঙ্গনাবদ্ধ ক'রে প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু আপনারা আমাদের চিনলেন কেমন ক'রে? এ বাসস্থানের কথাই বা আপনাদের জানাল কে?'

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়ে যথাবিহিত সম্ভাষণাদি সেরে হাসিমুখে উত্তর দিলেন, 'প্রজ্বলন্ত বহ্নি কখনও গুপ্ত থাকে না, ভস্ম তাকে আবরিত করতে পারে না—অগ্নিতেও সে দগ্ধ হয় না। বারণাবতের সেই

কৃত্রিম অগ্নির সাধ্য কি আপনাদের মতো সাক্ষাৎ পাবককে বিনষ্ট করে! আমি নিশ্চিত জানতাম যে আপনারা বেঁচে আছেন। আর, আজ স্বয়ম্বর সভাতেও আপনাদের চিনতে বিলম্ব হয় নি। পরদয়ানির্ভর জ্ঞানব্রতী ব্রাহ্মণদের মধ্যে আপনারা যে কত বেমানান তা আপনারা বোঝেন নি কিন্তু চক্ষুষ্মান অপর ব্যক্তিদের বুঝতে অসুবিধা হবে কেন?'

তারপর একটু থেমে, ঈষৎ কৌতুক-হাস্যের সঙ্গে বললেন, 'এখানের পথের নির্দেশ? আপনারা লক্ষ্য করেন নি, দ্রৌপদ ধৃষ্টদ্যুম্ন কয়েকটি চতুর সংবাদ-সংগ্রাহক নিয়ে দূর থেকে আপনাদের অনুসরণ করেছে—সম্ভবত এই কাছেই কোথাও আত্মগোপন ক'রে থেকে আপনাদের গতিবিধি কার্যকলাপ লক্ষ্য করছে। তারা যে আপনাদের বাসস্থান দেখে যেতে—আপনারা কি অবস্থায় বাস করেন তা জানতে আসবে এ আমি পূর্বেই অনুমান করেছিলাম, তাই আমি তখনই আপনাদের অনুসরণ করার চেষ্টা না ক'রে—অকারণে প্রাকৃত-জনের কৌতূহল বৃদ্ধি ক'রে লাভ কি?—আমি ধৃষ্টদ্যুম্নর গতিবিধির দিকেই লক্ষ্য রেখেছিলাম, দূর থেকে তাকেই অনুসরণ করেছি—ফলে আপনাদের বাসস্থান খুঁজে বার করতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয় নি। দূর থেকে আপনাদেরও দেখা গেছে—আপনারা পদব্রজে আসছিলেন তো—তাছাড়া আসতে আসতে অন্যান্য পথচারীদেরও আলাপ করতে শুনেছি—এই ভাগ্যবান ভিক্ষুকরা গ্রামের কুম্ভকার পল্লীতে থাকেন!

প্রাপ্য যথাবিহিত প্রণামাশীর্বাদাদি, কুশল ও সৌজন্য বিনিময়ের পর যুধিষ্ঠির গৃহসংলগ্ন অলিন্দে অজিনাসন বিছিয়ে বাসুদেবদের সমাদর ক'রে বসালেন। গৃহে কোন পক্কান্ন নেই, প্রভাতে স্বয়ম্বর সভায় যাত্রার পূর্বে যে ভিক্ষা মিলেছে তা এখনও তণ্ডুলাকারেই আছে—এতকাল পরে ভ্রাতুষ্পুত্ররা এসেছে, কি দিয়ে তাদের আতিথ্য করবেন—এই চিন্তায় আর্যা কুন্তী আকুল হয়ে উঠলেন।

কিন্তু বাসুদেব কাউকেই সে চিন্তার অবসর বিশেষ দিলেন না। একেবারেই সরাসরি প্রশ্ন করলেন, 'আমরা যখন এসে পৌঁছলাম তখন আপনাদের সকলকেই খুব চিন্তাকুল বিব্রত দেখলাম—কেন, প্রশ্ন করতে পারি কি? আপনারা কি নূতন কোন বৈরিতার আশঙ্কা করছেন?'

সহসা যুধিষ্ঠিরের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি যেন অন্ধকারে কূল দেখতে পেলেন। এই প্রশ্নকে দৈবপ্রভাবিত বলে বোধ হ'ল তাঁর।

তিনি বললেন, 'বাসুদেব, কিছু পূর্বে আপনার যে প্রজ্ঞা, দূরদৃষ্টি ও বুদ্ধি-কৌশলের পরিচয় পেয়েছি তাতে মনে হচ্ছে আপনি আজ ঈশ্বর-প্রেরিত হয়েই

এখানে এসেছেন। সমস্যাটা আপনার কাছে বিবৃত ক'রে আপনার উপরই তার সমাধানের ভার ছেড়ে দিচ্ছি।'

বললেনও তিনি। আনুপূর্বিক—ভীমের উচ্ছ্বাস ও কুন্তীর উত্তর—দুই-ই।

তুচ্ছ সামান্য কথা—সাধারণ নির্দেশ—কিন্তু যাঁর মুখ থেকে বেরিয়েছে তিনি সামান্য নন। এঁদের জননী, রাজমহিষী, দেবানুগৃহীতা, দেবপ্রিয়া। অথচ এক্ষেত্রে সে নির্দেশ এঁরা পালনই বা করেন কি ক'রে? কন্যার বহুচারিণীত্ব এবং এঁদের ব্যভিচারের দোষ হবে না কি?

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অভ্যস্ত রহস্যময় হাসিতে মুখ রঞ্জিত ক'রে বললেন, 'আমি সেই কথা বলতেই আজ এখানে এসেছি। মহারাজ, আপনি ধর্মজ্ঞ ধর্মপরায়ণ, ন্যায়নীতি সম্বন্ধে জ্ঞান আপনার সহজাত বর্মের মতো। শাস্ত্রমতে এ সমস্যার মীমাংসা অতি সরল। এই ধরনের কোন বাক্য অজ্ঞাত বা অজ্ঞানতাপ্রসূত নিঃসৃত হলে—যিনি বলেছেন তিনি কি ভেবে কি উদ্দেশ্যে বা কী পরিপ্রেক্ষিতে বলেছেন—সেটাই আগে বিবেচনা করা উচিত। বাক্যের শব্দার্থের থেকে বক্তার বক্তব্য বা উদ্দেশ্যই সমধিক সত্য—বিচারক সেটাই বিবেচনা করবেন সর্বাগ্রে—এ-ই হ'ল ন্যায়শাস্ত্রের, বিশেষ রাজধর্মশাস্ত্রের বিধান। আর্যা পৃথা খাদ্য ভেবেই ভাগ ক'রে নিতে বলেছেন—মানুষ জেনে কি ভেবে বলেন নি। সুতরাং সে রকম কোন বাধ্যবাধকতা এখানে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু আমি বলি কি, আমার অনুরোধ—আপনারা তাঁর আদেশ আক্ষরিক অর্থেই পালন করুন, আপনারা পাঁচজনই দ্রুপদ-তনয়াকে বিবাহ করুন।'

'সে কি! তাও কি সম্ভব! এক নারীর পঞ্চস্বামী!...সে নারী ভ্রষ্টা, বারাঙ্গনা বলে গণ্য হবেন না? আর আমরাও কি অধর্মাচারী বলে প্রমাণিত হবো না!'

যুধিষ্ঠির যেন বিমূঢ় হয়ে পড়েন।

'দেখুন মহারাজ, আপনাদের আচরণে যদি সংযম ও নিয়মের বন্ধন থাকে, তাহলে কিছুতেই কেউ আপনাদের ভ্রষ্টাচারী বা ব্যভিচারী বলতে পারবে না। আপনারা যদি পর পর পাঁচ দিনে পাঁচ জন এই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন—পাঁচ দিন পাঁচ জনে বাসর যাপন করেন এবং নিয়ম করেন যে অতঃপর এই বধূ এক বৎসর ক'রে এক স্বামীর সঙ্গে বসবাস করবেন এবং সেই সময়টুকুতে কেবলমাত্র তাঁকেই মনে-প্রাণে স্বামী বলে জানবেন—অপরকে সেই সম্পর্ক ধরে ভাশুর বা দেবর রূপে চিন্তা করবেন—তাহলে এটাকে বিচিত্র এবং এই সমাজে অঘটিতপূর্ব ঘটনা বলে জানলেও—কারণ অন্য কোন কোন সমাজে এক নারীর বহুপতির

অস্তিত্ব বিরল নয়—আপনাদের দোষ দিতে বা পঞ্চপতির কারণে কুরুকুলরাজ্ঞীকে বারাঙ্গনা বলতে পারবে না।···আমি যতদূর জানি—পরম তত্ত্বজ্ঞ ব্যাসদেবও আপনাদের এই পরামর্শ দিতেই এখানে আসছেন।'

তারপর, কিছুকাল মৌন থেকে, ঈষৎ গাঢ়কণ্ঠে বললেন, 'মহারাজ, আমি জানি এই অধর্মকলুষিত ও যথেচ্ছাচারনিপীড়িত দেশে ধর্মরাজ্য স্থাপনের জন্যই আপনাদের জন্ম হয়েছে। অনেক দিনের অনেক পাপ অনেক আবর্জনা জমেছে আমাদের জাতীয় জীবনে। রাজারা যে প্রজাদের ন্যাসরক্ষক মাত্র, ধর্মানুসারে দুষ্টকে দমন ও শিষ্টকে রক্ষা করার জন্যই তাঁরা ঈশ্বরাদিষ্ট কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত হয়ে থাকেন—এ কথা আজ আর কারও মনে নেই।···আপনারা জাতি তথা দেশকে আবার নতুন ক'রে সেই সত্যটা শিক্ষা দেবেন—এইটেই আপনাদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য ও দায়িত্ব। যা কিছু রাজার বা রাজশক্তির তা সবই পাঁচজনের—রাজার নিজস্ব কিছু থাকতে নেই—এই মহান সত্যের প্রতীক হিসাবে আদর্শ ও দৃষ্টান্ত স্বরূপই আপনারা এক মহিষীকে পাঁচ ভাই ভোগ করুন, আর এই আদর্শ থেকেই জনসাধারণ শিক্ষালাভ করুক যে, এ সংসারে নিজস্ব বলে কিছু আশা করা উচিত নয়। জনতাই নারায়ণ, জনতাই ঈশ্বর, তাদের বাণীই ভগবানের বাণী। যা কিছু শক্তি তাও যেমন পাঁচজনের—তেমনি যা কিছু ভোগ্য তাও সকলে মিলেই ভোগ করবেন—এই আদর্শ বিস্তারই যেন আপনাদের কাজ হয়।'

বাসুদেবের বলা শেষ হ'লে কিছুক্ষণের জন্য এক অখণ্ড নীরবতা নামে সেখানে। সেই দিবা তৃতীয় প্রহরেও যেন থমথম করতে থাকে চারিদিক। অনেকক্ষণ পরে বিহ্বলকণ্ঠে যুধিষ্ঠির বলেন, 'কিন্তু এসব কথা আপনি কাকে বলছেন, মহারাজ বলেই বা সম্বোধন করছেন কাকে? আমরা তো শুধু রাজ্যহীনই নই—গৃহহীন, পথের ভিক্ষুক। এ উপদেশ আমাদের কি কাজে লাগবে।'

'আপনি ন্যায়ত ধর্মত কুরুকুলপতি, রাজা। ধর্মরাজ্য স্থাপনের জন্যই চিহ্নিত আপনারা। এ দুর্দশা আপনাদের থাকবে না। সাধারণ দরিদ্র মানুষ কী ক'রে দিন যাপন করে, কী এবং কত নিপীড়ন তাদের সহ্য করতে হয়—তাদের সুখ-দুঃখ বিপদ-দুশ্চিন্তা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যই বিধাতা বোধ হয় আপনাদের এই অবস্থায় ফেলেছেন। এ ভালই হ'ল, রাজ্য পরিচালনা করতে গেলে এ অভিজ্ঞতা বিশেষ প্রয়োজন। বক-রাক্ষস-কাহিনীও আমার কানে পৌঁচেছে—স্বেচ্ছায় এক-একজনকে যেতে হ'ত খাদ্য হিসাবে—এখন

বুঝছি তাকে বধ করাও ভীমসেনেরই কাজ, শুধু রাজশক্তি বা ক্ষাত্রশক্তিই নয় —বর্বর পশুশক্তি, দানবীয় বল যেটা—সেটাও কি নিষ্ঠুর অত্যাচার করে— আর অসহায় জনসাধারণ কেমন ক'রে সেটা মেনে নিতে বাধ্য হয়—এই একটা দৃষ্টান্তেই কি তা স্পষ্ট হয় নি ?'

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে—ধনঞ্জয় অর্জুনের কাছে এসে তাঁকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ ক'রে বললেন, 'কিন্তু তুমি শুধু আমার ভাই কি আত্মীয় মাত্র নও, তার চেয়ে অনেক বেশী—আজ থেকে আমরা পরস্পরের বন্ধু, অভিন্নাত্মা। পরস্পরের সুখদুঃখ চিন্তাকল্পনার অংশভাগী। ব্যাসদেব বলেন পুরাকালে নর ও নারায়ণ নামে দুই একাত্মা বন্ধু, হিমালয়ের বদরিকাশ্রমে তপস্যা ক'রে দেহত্যাগ করেছিলেন—আমরা দুজন সেই তাঁদেরই নবকলেবরধারী আত্মা। সত্য-মিথ্যা জানি না, তবে এটা ঠিক যে তপস্যায় নর বা মানুষ ভগবানের কাছে পৌছতে পারে, তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। মানুষ উপরে ওঠার চেষ্টা করলে ঈশ্বর তার কাছে নেমে আসেন—আর সেই নর ও নারায়ণ, মানুষ ও ঈশ্বরের শক্তি একত্র হলে তবেই অসুরশক্তির বিনাশ সম্ভব হয়। আমরা হয়ত সেই দুই ঋষির আত্মা, হয়ত সে আত্মা পরমাত্মায় লয় পেয়েছে—আমরা সেই ঐতিহ্য ও তপোবল বহন ক'রে এসেছি পরমাত্মার ইচ্ছাতেই। এসব গূঢ় তত্ত্ব, এর সব কথা বুঝি না—এইটুকু শুধু বুঝি, বহুদিন—যেন বহু যুগ বহু জন্মান্তর ধরে আমি তোমারই পথ চেয়ে আছি। তোমার সান্নিধ্য, তোমার সাহচর্যের জন্য লুব্ধ, তোমার শক্তির ভিক্ষুক। হে পার্থ, হে জিষ্ণু, তুমি আমার সেই ঐকান্তিক কামনা পূর্ণ করো। তুমি আমার বন্ধু হও !'

॥ ৭ ॥

ধনঞ্জয় তাঁর নবলব্ধ অভিন্নাত্মা এই বন্ধুটিকে যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না, তাঁর মনের চিন্তারও তল পান না।

অনেক করেছেন বাসুদেব—তাঁদের এই রাজ্যপ্রাপ্তিতে, এটা অনস্বীকার্য। শ্রীকৃষ্ণর স্থিরবুদ্ধি ও অসামান্য রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ছাড়া বোধ হয় সম্ভবই হ'ত না। পাঞ্চালরাজ জামাতাদের ভবিষ্যতের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে চতুরতম চর প্রেরণ করেছিলেন হস্তিনায়। তারা পৃথক পৃথক বার্তা বহন ক'রে আনলেও মোট কথাটা মিলে গেছে। তাতেই মনে হয় সত্য সংবাদই এনেছে তারা—কল্পিত কাহিনী ফেঁদে বসে নি।

কুরুবংশের সিংহাসন জ্যেষ্ঠ হিসাবে ধৃতরাষ্ট্রেরই প্রাপ্য কিন্তু তিনি জন্মান্ধ বলেই তা পান নি। পাণ্ডু রাজা হলেও ভগ্নস্বাস্থ্য নিবন্ধন দীর্ঘদিন রাজধানী থেকে দূরে পার্বত্য অঞ্চলে বাস করেছেন, এঁদের চিরকুমার জ্যেষ্ঠতাত মহাত্মা ভীষ্মকে রাজ্যচালনার ভার দিয়ে। ফলে পাণ্ডুর অকাল মৃত্যুতে নাবালক ছেলেরা রাজধানী হস্তিনায় এলেন রাজার মর্যাদায় নয়—পাণ্ডু-তনয় যুধিষ্ঠির এই পুরুষের জ্যেষ্ঠ এবং পাণ্ডুর প্রথম পুত্র, সঠিক বিচারে তাঁরই সিংহাসন আরোহণ করার কথা—নিতান্ত পরান্নজীবী আশ্রিত অনাথের মতোই।

তবু তাতেও ধার্তরাষ্ট্রদের ঈর্ষাগ্নি থেকে এঁদের অব্যাহতি মিলল না। কারণ এঁরা যে ন্যায়ত এ-রাজ্যের অধিকারী শুধু তাই নন, বিদ্যায় বুদ্ধিতে শারীরিক বলে শাসক হিসাবে যোগ্যতর। বাল্যে ভীমের উপরই জ্ঞাতি ভ্রাতাদের আক্রোশ বেশি ছিল, কারণ ভীমের অপরিমাণ দৈহিক বল—তাঁরা ওঁকে সেই বয়সেই বিষপ্রয়োগে হত্যা করার চেষ্টা করেন, দৈব সহায় বলে কোনমতে তিনি রক্ষা পান। তারপর শস্ত্রশিক্ষা সমাপ্ত হলে যখন পরীক্ষার ফলে প্রমাণিত হ'ল অর্জুনই ওঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ও শ্রেষ্ঠ ধানুকী—তখন কৌরবরা এক চরম ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হলেন। বারণাবত নামে এক গণ্ডগ্রামে দাহ্য পদার্থে প্রস্তুত প্রাসাদ নির্মাণ করিয়ে পাণ্ডবদের সেখানে পাঠিয়ে দিলেন—একত্রে থাকলে কলহ দ্বেষ বৃদ্ধি পাবে এই যুক্তি দেখিয়ে। সঙ্গে পুরোচন বলে এক কর্মচারী দিলেন, তাকে প্রচুর পুরস্কারের অঙ্গীকারে প্রলুব্ধ করা হ'ল—সে সুযোগমতো ঐ প্রাসাদে অগ্নিসংযোগ ক'রে এঁদের পুড়িয়ে মারবে।

কিন্তু পাণ্ডব কৌরবদের এক দাসী-গর্ভজাত খুল্লতাত ছিলেন, বিদুর—তিনি ধর্মপরায়ণ ও প্রাজ্ঞ। তিনি এ ষড়যন্ত্রের পূর্ণ সংবাদ রাখতেন। তিনিই যাত্রার প্রাক্‌কালে এঁদের সে সম্বন্ধে সচেতন ক'রে দিলেন, মাটিতে সুড়ঙ্গ কাটবার জন্য গোপনে একটি বিশ্বস্ত লোকও পাঠালেন। উদ্দেশ্যটা পাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই আশঙ্কায় পুরোচন কিছু কালহরণ করছিলেন, এঁরা তার পূর্বে নিজেরাই জতুগৃহে অগ্নিসংযোগ ক'রে সুড়ঙ্গপথে বহুদূর অরণ্যে পলায়ন করলেন। তার আগে আরও একটি বুদ্ধির কাজ করেন এঁরা। এক নিষাদী ও তার পঞ্চপুত্রকে যাত্রার পূর্বদিন আমন্ত্রণ ক'রে প্রচুর ভোজন করান। সেই সঙ্গে আকণ্ঠ সুরাপানেরও আয়োজন ছিল, ফলে সন্ধ্যার দিকে তারা অচেতন হয়ে পড়ল। জতুগৃহের ভস্মাবশেষ থেকে এদের অস্থি দেখেই কৌরবরা নিশ্চিন্ত হলেন যে পঞ্চপাণ্ডবের অপঘাত মৃত্যু ঘটেছে। সেই সঙ্গে পুরোচনও দগ্ধ হওয়ায় অন্যরূপ সাক্ষ্য দেবার কেউ ছিল না। সুতরাং এ

সিদ্ধান্তে সন্দেহের অবকাশ রইল না।

সেইদিন থেকে কৌরবদের ভয়ে এঁরা ভিক্ষান্নজীবী ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশেই ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন—পরিচয় দিয়ে সিংহাসন দাবি করার চেষ্টা করেন নি। কারণ রাজক্ষমতা কোষাগার সবই কৌরবদের হাতে, এরা একান্ত সহায়-সম্বলহীন—সে দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হয় নিহত হতেন।

বস্তুত এখনও ধৃতরাষ্ট্রর ইচ্ছা ছিল না এঁদের কোন কিছু দেবার—দুর্যোধন, কর্ণ প্রভৃতির তো ছিলই না। রাজ্যের অধিকার তো দূরের কথা—ওঁদের অস্তিত্বকে স্বীকার করারই ইচ্ছা ছিল না তাঁদের। পঞ্চপাণ্ডব পুড়ে মরেছে—এই প্রচলিত ধারণাকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন তাঁরা। নিহাৎ পাঞ্চাল ও যাদবরা নির্দ্বিধ অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিতেই অসুবিধায় পড়ে গেলেন। ঈর্ষা ও হতাশা—দ্রৌপদী এঁদের অধিকারে আসাতে ঈর্ষা এবং বার বার চেষ্টা সত্ত্বেও পাণ্ডবদের বিনষ্ট করতে না পারার হতাশা—এই দুই অনুভূতি মিলিয়ে উন্মত্তবৎ দুর্যোধন নানারকম ছেলেমানুষী প্রস্তাব করেছিলেন, বলেছিলেন পাঞ্চালরাজকে প্রচুর অর্থ দিয়ে বশীভূত করব—যাতে তারা পাণ্ডবদের লোকবল বা অর্থবলে সাহায্য না করে, তাদের যেন ত্যাগ করে বা পাঞ্চালেই বন্দী করে রাখে—তারপর সেই সুযোগে সসৈন্যে ওদের আক্রমণ ক'রে পরাভূত ও নিহত করব।

যারা সর্বাধিক বিদ্বেষের পাত্র, যারা বার বার নিজেদের শৌর্য বীর্য ও অন্যান্য গুণাবলীর আধিক্য দ্বারা ওঁদের ক্ষত্রিয় সমাজে, রাজন্য সমাজে ছোট ক'রে দিয়েছে—তারাই আবার এসে এই পাঞ্চাল স্বয়ম্বর সভায় আরও একবার ওঁদের মুখে—ওঁর মুখে কালি লেপে দিল—এ জ্বালা কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না দুর্যোধন, একরকম প্রলাপ বকতে শুরু ক'রে দিয়েছিলেন।

একবার বলেন বন্ধুবেশী কপট হিতাকাঙ্ক্ষী চতুর চর প্রেরণ ক'রে পাণ্ডবদের মধ্যে ভেদ জন্মাবেন—যাতে তারা পরস্পরের সঙ্গে মারামারি ক'রে নিজেরাই নিহত হয়; আবার কখনও বলেন, গোপনে গুপ্তঘাতক পাঠিয়ে ভীমকে হত্যা করবেন তাহলেই পাণ্ডবদের মন ভেঙে যাবে, তারা আত্মহত্যা করবে কিম্বা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবে।...কিছুই স্থির করতে পারেন না—শুধু শলাকা-উত্তেজিত পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের মতো গর্জন করেন আর অস্থির হয়ে পাদচারণা করেন।

কর্ণ অবশ্য—যথেষ্ট কারণ থাকা সত্ত্বেও—অতটা অস্থির কি বিচলিত হন নি, অগ্রপশ্চাৎ জ্ঞান হারিয়ে বসেন নি। দ্বিবিধ অপমানের জ্বালায় তাঁরই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠার কথা—কিন্তু তিনি কোন অযৌক্তিক প্রস্তাব করেন নি বরং মৃদু

ভর্ৎসনাই করেছিলেন বন্ধু দুর্যোধনকে, এই সব বালকোচিত অবাস্তব প্রস্তাবের জন্য।

তিনি বলেছিলেন যে, 'সেই কৌরবহস্তে লাঞ্ছিত হবার পর থেকে আজ পর্যন্তও পাঞ্চালরা যথেষ্ট বলশালী হয়ে উঠতে পারে নি; বাসুদেব যে যাদববাহিনী এনে ফেলবেন তাতেও বহু বিলম্ব ঘটবে; বিপুল কোন বাহিনী কয়েক দিনের মধ্যে এনে ফেলা যায় না—বিশেষ মৎস্য প্রভৃতি রাজ্যের মধ্য দিয়ে আসতে হবে, তাঁদের অনুমতি চাই, আনুকূল্য চাই—নইলে রসদ বা অশ্ব-বলদ প্রভৃতির খাদ্য সংগ্রহ হবে না; অর্থাৎ পাণ্ডবদের প্রস্তুত হয়ে নিতে এখনও ছ'সাত মাস দেরি লাগবে। আমরা পাঞ্চালদের কাছাকাছি আছি, আমাদের বাহিনীও প্রস্তুত—আমরা যদি ঝটিকার মতো গিয়ে পড়তে পারি, অবশ্যই ওদের পরাভূত ও বন্দী করতে পারব। আমার মনে হয় সেই চেষ্টাই করা উচিত।'

এ পরামর্শ ধৃতরাষ্ট্রের মন্দ লাগে নি। তিনিও হয়ত সেই মতই সমর্থন করতেন, যদি না দেখা যেত বাসুদেবের দূরদৃষ্টি অনেক বেশী। তিনি প্রচার ক'রে দিলেন যে পাণ্ডবদের পক্ষে বরযাত্রী হিসাবে উৎসবসঙ্গীর না অভাব হয়—সেই জন্য তিনি বহুপূর্বেই সাত্যকি, কৃতবর্মা, বভ্রু প্রভৃতি যাদব বীরদের সসৈন্য ও সপার্ষদ আসতে বলেছেন, সেই সঙ্গে পাণ্ডবদের জন্য প্রচুর ধনরত্নাদি এবং তাঁদের আসন্ন সৈন্যবাহিনীর উপযুক্ত অশ্বাদিও।

এই সংবাদটার জন্য ধৃতরাষ্ট্র বা কর্ণ ঠিক প্রস্তুত ছিলেন না। এদিকেও দেখা গেল কৌরবদের পক্ষে যাঁরা অজেয় এবং দুর্ধর্ষ, সেই কুরুপিতামহ ভীষ্ম ও দ্রোণ—এঁরা কেউই পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করতে সম্মত নন। ক্ষত্তা বিদুর তো ননই। চিরদিনই পাণ্ডবরা তাদের বিনত সশ্রদ্ধ আচরণের জন্য বিদুরের প্রিয়, সেইজন্যই আরও দুর্যোধন কর্ণ প্রভৃতি বিদুরকে দু'চক্ষে দেখতে পারেন না, ধৃতরাষ্ট্রও যে সর্বদা তাঁর পরামর্শ মেনে চলেন তাও না—তবু কে জানে কেন, ধৃতরাষ্ট্রের ওপর তাঁর অনেকখানি প্রভাব আছে—ঘোর পাতকীর ওপর বিবেকের একটা অদৃশ্য প্রচ্ছন্ন প্রভাবের মতো।

এঁদের সকলেরই মত—পাণ্ডুতনয়দের উপর যথেষ্ট অবিচার করা হয়েছে, বিশেষ এই জতুগৃহ নির্মাণ ক'রে তাদের হত্যা করার ষড়যন্ত্র প্রকাশ হয়ে পড়ার পর এঁরা কেউ জনসমাজে মুখ দেখাতে পারছিলেন না, এখন আবার যদি তাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করা হয় তো সমগ্র বিশ্বে ধিক্কারের ঝড় উঠবে। তার চেয়ে মনে যা-ই থাক ওঁদের—সসম্মানে সসমাদরে তাদের অভ্যর্থনা

জ্ঞাপনই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ। আর, পাণ্ডবদের শৌর্য ও বীর্যের কিছু নমুনা তো এঁরা পেয়েছেন—যদিই এঁদের হিসাব সব ওলটপালট হয়ে যায়, পাণ্ডবদের পরাস্ত করতে না পারেন, তাহলে যথাসর্বস্বই যাবে এঁদের। তার চেয়ে বুদ্ধিমানের মতো অর্ধেক বা অর্ধেকের কাছাকাছি দিয়ে তাদের সঙ্গে একটা মিটমাট ক'রে নিন।

সেটাই সমীচীন বুঝেছিলেন ধৃতরাষ্ট্রও। বিদুরকে দূত স্বরূপ পাঞ্চালে পাঠিয়ে ডাকিয়েও এনেছিলেন ভ্রাতুষ্পুত্রদের। তাদের আদর আপ্যায়ন পান-ভোজনেরও কোন ত্রুটি হয় নি। উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি এবং নবোঢ়া স্নুষার জন্য অলঙ্কারের ব্যবস্থাও হয়েছিল। এমন কি শেষ মুহূর্তে শ্রীকৃষ্ণর প্রাণপণ চেষ্টায় পাণ্ডবদের জন্য যে একটি রক্ষীবাহিনী সংগৃহীত হয়েছিল—প্রস্তুত না থাকলেও, তাদের অভ্যর্থনা বাসস্থান আহার্য—এবং অশ্ব ও বৃষাদির পরিচর্যার কোন অভাব ঘটে নি।

অবশ্যই অন্ধরাজা অর্ধেক দিতে চান নি। যেটুকু ভূখণ্ড এদের জন্য চিহ্নিত ক'রে দিয়েছিলেন, তাকে অন্ধ ছাড়া অপর কেউ কুরু-রাজ্যের অর্ধেক বলবে না। একটা নগর পর্যন্ত দিতে সম্মত হন নি—অম্লান বদনে বলেছিলেন, 'ঐ খাণ্ডবপ্রস্থ পড়ে আছে, ঐখানেই তোমরা জনপদ বসিয়ে রাজধানী করে নাও।'

এই অবিচারে ভীম অত্যন্ত উষ্ণ হয়ে উঠেছিলেন, অর্জুন পর্যন্ত আত্মদমন করতে পারেন নি, তাঁর উষ্মা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল মুখের রেখায়—সে-সময়ও শ্রীকৃষ্ণই এসে শান্ত করেন ওঁদের। বুঝিয়ে দেন যে, এ ভালই হ'ল—প্রতিষ্ঠিত জনপদ বা নগরীতে রাজধানী স্থাপন করতে গেলে পদে পদে অসুবিধা; তার চেয়ে পতিত জমিই ভাল—ইচ্ছামতো, নিজেদের পরিকল্পনা মতো—সব চেয়ে বড় কথা প্রয়োজন ও সুবিধা-মতো নগরীর পত্তন গঠন করা যায়। কোথায় কোন গৃহ বা মণ্ডপ, কোথায় রত্নাগার কোথায় শস্ত্রাগার, কোথায় শস্যভাণ্ডার নির্মিত হবে—সেটা নিজেদের সুবিধামতো নির্বাচন করার স্বাধীনতা—অনেক বেশী সুবিধাজনক।

আরও বলেছিলেন বাসুদেব, 'রাজ্যের আয়তনের ওপর শক্তি-সামর্থ্য বা বিত্ত নির্ভর করে না। যে দেশে আত্মোন্নতির সুযোগ পায় সেই দেশেই অধিক সংখ্যক প্রজা এসে বসতি স্থাপন করে। শিল্পবাণিজ্যের ওপরই রাজ্যের সমৃদ্ধি নির্ভর করে। রাজা যদি তার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন তাহলে আয়তনে বৃহত্তর রাজ্যগুলির থেকে প্রভাবে ও প্রতিপত্তিতে এই ক্ষুদ্র রাজ্যই অগ্রগণ্য হয়ে উঠতে পারবে। দুর্যোধনরা ভুল করল, এ রাজ্য এমনিতেই এত

জনবহুল—এখানে প্রজাদের উন্নতির আশা কম। বরং তোমরা রাজ্য পত্তন করলে দেখবে উদ্যমশীল পরিশ্রমী প্রজারা এদেশ ত্যাগ ক'রে তোমাদের রাজ্যেই যাবে।'

আরও অনেক উপকার করেছেন শ্রীকৃষ্ণ।

খাণ্ডবপ্রস্থ নামে যে জায়গাটি ওঁদের জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন ওঁদের জ্যেষ্ঠতাত—তাকে পার্বত্যদেশ বলাই উচিত। খুব উঁচু কোন পাহাড় না থাকলেও সেখানে মাটির থেকে পর্বতশীলাই বেশী। বৃক্ষবিরল—সজীবতা বলতে কণ্টকগুল্ম শুধু। কচিৎ কোথাও সামান্য একটু মাটি পেয়ে দু'একটি গাছ মাথা তুলেছে। পার্বত্যদেশ বলাও হয়ত ভুল—প্রস্তরময় দেশ বললেই কতকটা ঠিক বর্ণনা হয়।

নক্সা প্রভৃতি দেখে যে স্থানটিতে ওঁরা রাজধানী পত্তনের পরিকল্পনা করেছিলেন সেখানে যাওয়ার পথও তেমনি দুর্গম। বস্তুত কোন পথই ছিল না। নিবিড় অরণ্যের মধ্য দিয়ে পথ কেটে যাওয়া। অসংখ্য শ্বাপদসঙ্কুল সেই ঘোর অরণ্যে কোন পরিচিত ফলের গাছ পর্যন্ত নেই, নেই সুপেয় জলের প্রাচুর্য। বাসুদেব পূর্বেই এর জন্য প্রস্তুত হয়ে ছিলেন। আগে গাছ কেটে পথ তৈরী করবে, স্থানে স্থানে নৈশ বিশ্রামের জন্য সাময়িক স্কন্ধাবার ফেলবে—গো মহিষ অশ্ব ও অশ্বতরাদির সেবা ও তাদের আহার্যের ব্যবস্থা করবে—সে-সব লোক বেছে বেছে আগেই নিযুক্ত করা হয়েছিল। সুবৃহৎ গোশকটে পানীয় জল সঙ্গে নেওয়া হয়েছে। এছাড়া স্থপতি, গৃহনির্মাণ-কর্মী ও শ্রমিকদের একটি বিরাট দলও সঙ্গে নিয়েছিলেন। উনি নিজে এদের সঙ্গে সঙ্গে সেই কষ্টকর পথে এসেছেন বরাবর। রথে যাওয়া কঠিন, অশ্বারূঢ় হয়েই আসতে হয়েছে।

তার পরও—এখানে নগরীর নক্সা প্রস্তুত, উপকরণাদি সংগ্রহ—কাকে কি ভার দেওয়া হবে—সমস্ত ব্যবস্থা তিনিই করেছেন। সেই সঙ্গেই সেনাবাহিনী, রক্ষীবাহিনী, মন্ত্রণালয়ের কর্মী নিয়োগও তাঁর পরামর্শ মতোই করা হয়েছে। ব্যাসদেবকে দিয়ে নগরীর ভিত্তিপত্তন যজ্ঞ করানো হয়েছিল, সেও তাঁরই নির্দেশে। আর তার ফলেই মাত্র এই ক'বছরে এত বড় একটা মহান ও রমণীয় নগরী গড়ে উঠতে পেরেছে।

ব্যাসদেবের নিজেরই ভাষায়—

"সে নগর সাগরতুল্য বৃহৎ পরিখাদ্বারা অলঙ্কৃত হইল এবং শ্বেতনাগ সমাবৃত পাতালগঙ্গা ভোগবতীর ন্যায় চন্দ্র ও পাণ্ডুবর্ণ মেঘসদৃশ গগনতল-ব্যাপিনী প্রাকারশ্রেণীতে শোভা পাইতে লাগিল। তাহার সৌধসকল কপাট-

বিশিষ্ট বিস্তৃত দ্বার দ্বারা বিস্তৃতপক্ষ গরুড়ের শোভা ধারণ করিল। ঐ পুরশ্রেষ্ঠ মেঘবৃন্দ ও মন্দারপর্বত-সদৃশ সুসংবৃত অস্ত্রযুক্ত দুর্ভেদ্য গোপুরসমূহে সুরক্ষিত হইল। এবং স্থানে স্থানে দ্বিজিহ্ব পন্নগ সদৃশ শক্তি নামক অস্ত্রসমূহে সমাবৃত, অস্ত্রশিক্ষার নিমিত্ত অট্টালক-পুঞ্জে সুশোভিত যোধগণ কর্তৃক রক্ষিত, তীক্ষ্ণ অঙ্কুশ সকল, এককালে শত শত মনুষ্যের প্রাণঘাতক শতঘ্নী নামক অস্ত্রযুক্ত যন্ত্রজাল ও লৌহময় মহাচক্রে শোভিত হইল। পথ সকল প্রশস্ত ও সুবিভক্তরূপে নির্মিত হইল। ঐ নগর পাণ্ডুবর্ণ নানাবিধ পরমোৎকৃষ্ট অট্টালিকামণ্ডলীতে পরিদীপ্যমান হইয়া অমর ভুবনের ন্যায় শোভমান হওয়াতে 'ইন্দ্রপ্রস্থ' বলিয়া প্রকাশিত হলল। এতাদৃশ নগরমধ্যে রমণীয় কল্যাণকর স্থানে পাণ্ডবদের ধনপরিপূর্ণ ধনপতিসদৃশ প্রাসাদমণ্ডলী নভোমণ্ডলস্থ তড়িন্মালা সমাবৃত মেঘবৃন্দের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

"অনন্তর সংস্কৃত প্রাকৃত প্রভৃতি নানাদেশীয় ভাষাজ্ঞ ব্যক্তি-সকল ও সর্ববেদ-বিশেষজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ আসিয়া বাস করিবার নিমিত্ত সেই স্থান মনোনীত করিলেন। বণিকসমূহ ধনার্জনে অভিলাষী হইয়া নানা দিগ্দিগন্ত হইতে তথায় আগমন করিতে লাগিল। অশেষ শিল্পবিজ্ঞান-পারদর্শী ব্যক্তিরা তথায় আসিয়া বাস করিল। নগরীর চতুর্দিকে পরম-রমণীয় উদ্যান-সকল…পুষ্প-ফল যুক্ত বিবিধ বৃক্ষসমূহে সুশোভিত হইল।"

কিন্তু এত যিনি করলেন—প্রধানত যাঁর আনুকূল্যে অতি অল্পসময়ে, মাত্র ছ'সাত বছরে এই অসম্ভব সম্ভব হ'ল—যিনি বলতে গেলে এই ক'বছর অর্ধেকের অধিককাল এই খাণ্ডবপ্রস্থেই অতিবাহিত করলেন—এখন তাঁর এ মনোভাব কেন? অর্জুনকে তিনি ক্রমাগত এই নবীনা নবনির্মিত রাজধানী ও সদ্যপ্রাপ্ত রাজ্য ত্যাগ ক'রে ভারত পরিক্রমায় প্ররোচিত করছেন কেন?

তাঁর কথায় একেবারে যে যুক্তি নেই, তা নয়। তিনি বলছেন, পাণ্ডবরা এই দেবানুগৃহীত ভূমির সার্বভৌম শাসক হবেন—এই তিনি দেখতে চান। সে উচ্চাশা ওঁদেরও, অর্থাৎ পাণ্ডবদেরও থাকা উচিত। আর তা যদি থাকে তাহলে এ দেশ—দেশ বলতে দেশের মানুষকে ভাল ক'রে জানা ও বোঝা প্রয়োজন। তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়া দরকার। শুদ্ধমাত্র বাহুবলে নির্ভর করলে—রাজাকে পরাজিত করা যায়—যথার্থ রাজ্যজয় হয় না। বিজিত রাজ্য পদানত থাকা বাঞ্ছনীয় নয়—বিজয়ীর স্বভূমির সঙ্গে এক হয়ে যাওয়াই অভিপ্রেত। আর তা সম্ভব করতে হলে, বিজিতের সঙ্গে বিজয়ীর

আত্মীয়তা স্থাপন করতে গেলে, তাদের সুখদুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা, রীতিনীতি, আচার-সংস্কৃতি-সাহিত্য প্রভৃতির সঙ্গে, জীবন সম্বন্ধে তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে, দর্শনের সঙ্গে পরিচয় স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন।

শ্রীকৃষ্ণ বলেন, 'রাজ্য তার নিজ রূপ নিজেই পরিগ্রহণ করবে; শিশু বালক, বালক কিশোর হ'তে বিলম্ব ঘটবে না। রক্ষণাবেক্ষণ ও শাসনের প্রাত্যহিক কাজের জন্য রাজা যুধিষ্ঠির রইলেন, ভীমসেন রইলেন। তুমি এখন ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করো, এগিয়ে যাও। এ রাজ্য সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ও শক্তিমান হ'তে থাক, তুমি ইত্যবসরে সমস্ত ভারতভূমি প্রদক্ষিণ করো। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে এদেশের মানুষের বিভিন্ন জাতি, তাদের চেহারা বিভিন্ন, ভাষা ও সংস্কৃতি বিভিন্ন—রীতিনীতি আচার সবই—একেরটা অপরের সঙ্গে মেলে না—পৃথক, স্বতন্ত্র। সেগুলি জানার বোঝার—তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা ঈপ্সা আয়ত্ত করার চেষ্টা করো। নইলে এ দেশকে সংহত ও শক্তিশালী ক'রে তুলতে পারবে না। একটি ধর্মের সূত্রে আবদ্ধ এই বহুজাতির যথার্থ সমন্বয় ঘটানো খুব কঠিন নয়—যদি তাদের অন্তরগুলোর সঙ্গে তোমার পরিচয় থাকে। হে ভরতর্ষভ, তুমি তোমার পিতৃপুরুষের নামাঙ্কিত এই ভারতভূমি পরিক্রমা করো। তাতে তোমার তীর্থ পরিক্রমা—নররূপী নারায়ণকে পরিক্রমা করার কাজ হবে।'

এর মূল বক্তব্যে অর্জুনের অন্যমত নেই। এ সবই তিনি স্বীকার করেন—এর অন্তর্নিহিত সত্য। কিন্তু তবু, রাজবংশের সন্তান, রাজপুত্র—নূতন রাজ্য-প্রতিষ্ঠা ও রাজ্য শাসনের স্বাদ পেয়েছেন, ক্ষমতা ও উচ্চাশার এই স্বাদ—তা উগ্র, তেজস্কর মাধ্বীর মতো আচ্ছন্ন করেছে তাঁকে। ব্যাঘ্রসন্তান প্রথম মাংস ও রক্তের আস্বাদন পেলে যেমন আনন্দে, বিস্ময়ে উন্মত্ত হয়ে ওঠে—কতকটা তেমনিই অবস্থা ওঁর।

অনেক কাজ করতে হবে, অনেক কাজ বাকী। পরিকল্পনা এখনও অসম্পূর্ণ—নিত্য নূতন সংযোজন চলছে তাতে—মনে হচ্ছে তিনি না থাকলে ঠিক সুচারু রূপে তা সম্পন্ন হবে না। তাঁর মতো চারিদিকে দৃষ্টি রেখে কেউ করতে পারবে না। বলেনও তাই বাসুদেবকে, সবিনয়েই বলেন, 'সখা, এই আমরা প্রথম রাজ্য পেলাম। সবই নূতন। আমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কিছুই নেই। নিকটেই ঈর্ষী আত্মীয়—তারা অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত—দক্ষতা ও ক্ষমতা দুই-ই আয়ত্ত তাদের। আমরা এতাবৎ এসব ব্যাপারে সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিলাম, না জানি রাজনীতি, না জানি দণ্ডনীতি, না জানি ন্যায়নীতি। সবেতেই নূতন ক'রে পাঠ

নিতে হচ্ছে। এসব আয়ত্ত করতে এখনও প্রচুর সময় লাগবে।'

বলতে বলতেই যেন মনেও জোর পান খানিকটা ফাল্গুনী ; বলেন, 'কোন অভিজ্ঞতাই নেই, প্রতিক্ষেত্রে ঠেকে শিখতে হচ্ছে। একই নিয়ম প্রত্যেকের বেলায় খাটে না—অবস্থা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নীতি গ্রহণ করতে হয়—সেও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। তাছাড়া সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা, অপরাধী দমনের আয়োজন, সৈন্যবাহিনীকে শিক্ষা দেওয়া—অনেক কাজই তো বাকী। এখনই দেশত্যাগ কি সম্ভব, না উচিত ?'

অনেকক্ষণ ধরেই বাসুদেবের ওষ্ঠপ্রান্ত মৃদু কৌতুকে বক্র হচ্ছিল, এখন তা অভ্যস্ত রহস্যময় হাসিতে রঞ্জিত হয়ে উঠল।

বললেন, 'বন্ধু, এতই যদি আত্মবিশ্বাস আর আত্মনির্ভরতা—আমাকে এনেছ কেন ? বার বার আমিই বা আমাদের সব কাজ ফেলে ছুটে আসছি কেন ? শাসন ব্যবস্থা তো একটা সুশৃঙ্খল রূপ নিয়েছে—তবে তোমার এত চিন্তা কিসের ? বেশ তো, আমি তোমার সমস্ত দায়িত্বভার নিজে গ্রহণ করছি—তোমার সমস্ত কল্পনা ভাবনা রূপায়নের দায়িত্ব—তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যাও। ···সময় বড়ই অল্প বন্ধু। তোমার শক্তি ও মনীষা সামান্য মানবজনোচিত আবেগে প্রবৃত্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে—নইলে এসব কথা তোমাকে বোঝাতে হ'ত না। শীঘ্রই এই ভারত ভূখণ্ডে আগুন জ্বলবে—বিপুল সর্বগ্রাসী হিংসার বহ্নি—সারা ভারতে রক্তবন্যা প্রবাহিত হবে। আলস্যে-বিলাসে লোভে-লালসায় ব্যসনে-সম্ভোগে সুরায়-অহিফেনে—এদেশের শাসকসমাজ ঘোর বেগে সর্বনাশের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। লোভ থেকে অসূয়া ও পরশ্রীকাতরতা—তা থেকে সংঘর্ষ অনিবার্য। এই অলস ঐশ্বর্যভোগীদের থেকে দেশের কোন কল্যাণ কোন দিন আসবে না, এরা নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা ভুলে গেছে—সেবা করার অধিকারকে সেবা পাওয়ার অধিকার বলে ভুল করছে ; ধর্ম ন্যায় নীতি এদের হাতে বন্দী, তার আর্তনাদ তুমি শুনতে পাচ্ছ না, আমি পাচ্ছি। এই শ্রেণীকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস না করলে এদেশের মুক্তি নেই, শান্তি নেই।'

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন যাদবশ্রেষ্ঠ, এবার ধনঞ্জয়ের হাত দুটি ধরে গাঢ় কণ্ঠে বললেন, 'তোমার হাতেই সেই মুক্তি আসার কথা—তোমার দ্বারাই। কিন্তু তার আগে তুমি সব দিক দিয়ে প্রস্তুত হও, প্রস্তুত থাকো—এই আমি চাই!'

অর্জুন মাথা নত ক'রে থাকেন, সম্মতিও প্রকাশ করেন কিন্তু নানা ছুতায় বিলম্বও করেন। নিত্য নূতন অছিলা উপস্থাপিত করেন।

শেষে একদিন করজোড়ে—আর দুটি বৎসর সময় প্রার্থনা করেন। এই দু' বৎসর পরে তিনি নিশ্চয়ই যাবেন—প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন।

আরও দু বৎসর? সে কি?

দু বৎসরই বা কেন?

চমকে ওঠেন বাসুদেব—কিন্তু সে এক লহমার জন্য। সঙ্গে সঙ্গেই চোখের সামনে থেকে একটা ধূম্রাবরণ অপসৃত হয়।

কারণটা স্পষ্ট হয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়।

এতদিন এটা—এই স্পষ্ট ছবিটা চোখে না পড়ার জন্যই বিস্মিত, নিজের নির্বুদ্ধিতায় নিজের উপর বিরক্ত হন।

কৃষ্ণা!!!

মাত্র একটি বছর পার্থ তাঁর সাহচর্য লাভ করেছেন। তার পর দু বছর ব্যর্থ কেটেছে। নকুল ও সহদেবের পালা শেষ হয়েছে। কৃষ্ণা এখন যুধিষ্ঠিরের ঘরণী। অবশ্য সে কাল শেষ হ'তে খুব বেশী বিলম্ব নেই আর—তবে তার পরও তো ভীমসেনের এক বছর বাকী থাকে!

কৃষ্ণাকে ঐ সামান্য সময় পেয়ে তৃপ্তি হয় নি, আশ মেটে নি এখনও।

সহস্র কাজের সহস্র দায়িত্বের মধ্যেও এই বীর ধনুর্ধর ও মহাসাধকের মন পড়ে আছে সেইখানে।

আশ্চর্য নারীর মায়া।

এত বড় শক্তিও মোহাচ্ছন্ন সুপ্ত হয়ে পড়েছে।

রমণীরূপের প্রবল মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত হতে পারছেন না কিছুতেই, জাগ্রত হতে পারছেন না সেই মানসসুপ্তি থেকে।

এই সত্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই একটা ব্যঙ্গ ও ঈষৎ অবজ্ঞা মিশ্রিত কৌতুকে বাসুদেবের ওষ্ঠাধর আবারও কৌতুকবক্র হবার উপক্রম করে —কিন্তু প্রায় নিমেষকাল মধ্যেই আরও একবার চমকে ওঠেন তিনি।

সেই ক্ষণপূর্বের ব্যঙ্গবক্রতা লজ্জায় ও আত্মধিক্কারে করুণ হয়ে ওঠে। কারণ সেই আশ্চর্য বুদ্ধিধর তীক্ষ্ণদর্শী মানুষের কাছে নিজের মনের চেহারাটাও অস্পষ্ট থাকে না।

দেহধারণ করলে বুঝি দেহজ ইন্দ্রিয়ের কাছে বশ্যতা না স্বীকার ক'রে উপায় নেই। সে রিপুর দাসত্ব থেকে অতিমানবিক শক্তিরও অব্যাহতি পাওয়া কঠিন। সাধকই হোন আর ভগবদংশেই জন্ম হোক—পূর্ব জন্মের যত সুকৃতি নিয়েই আসুন—দেহের ঋণ কড়ায় গণ্ডায় শোধ দিতে হবে দেহীকে।

বাসুদেবের সন্দেহ হ'ল, এই যে অর্জুনকে দূরে সরানোর জন্ম তাঁর এই ব্যগ্রতা ও ব্যাকুলতা—সম্ভবত এরও কারণ ঐ হোমাগ্নিসম্ভূতা পাবক-শিখারূপিণী মেয়েটিই—কৃষ্ণা।

অর্জুনের প্রতি কৃষ্ণার পক্ষপাত এখনই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেটা পাণ্ডবদের তত লক্ষ্যগোচর না হলেও বাসুদেবের দৃষ্টি এড়ায় নি।

আর তাতেই যেন অকারণ একটা অসূয়া অনুভব করেছেন।

না না, ছি!

শিউরে ওঠেন বাসুদেব।

এসব কি ভাবছেন তিনি। সখী, আত্মীয়া, ভ্রাতৃবধূ।

দৈবকার্যে, দৈবপ্রেরিতা, দেবাংশজাতা কন্যা।

বহ্নি-উদ্ভূতা, বহ্নিস্বরূপা। কুরুবংশ ধ্বংসের জন্যই আবির্ভূতা।

মনে মনে নিজেকেই স্মরণ করেন তিনি।

অন্তরস্থ চৈতন্যস্বরূপ নিজসত্তাকে।

সামান্য-মানবসুলভ এই মোহ থেকে মুক্তি পাবার জন্য সুপ্ত আত্মশক্তিকে সচেতন করার চেষ্টা করেন।

'এই যে দেহটা বিচিত্র কারণে এখনও একটা ক্ষোভ অনুভব করছে, কিছুতেই সেই সামান্য অস্বস্তিটাকে দূর করা যাচ্ছে না, কেবলই বার বার একটা কথা মনে হচ্ছে, একটা অতৃপ্তি যে, অন্তঃপুর মহিষী ও সেবিকায় পূর্ণ হলেও এমন একজনও নেই—স্বকার্যসাধন, উদ্দেশ্য সাধনের এই বৈরীটার হাত থেকে আমাকে তুমি রক্ষা করো—হে বাসুদেব, হে নারায়ণ।'

॥ ৮ ॥

অর্জুন তাঁর চিত্ত ও বুদ্ধির এক চরম সংঘর্ষের মধ্যেই বলে ফেলেছিলেন কথাটা। না বলে উপায় ছিল না বলেই। এ দ্বন্দ্ব তাঁর লোকবিশ্রুত স্থৈর্যকেও অতিক্রম ক'রে গিয়েছিল যেন। একদিকে বিবেচনা ও বিচারবুদ্ধি তাড়িত করছিল বাসুদেব-নির্দিষ্ট পন্থার দিকে—অপরদিকে, আসক্তিই হোক আর মোহই হোক—কিছুতেই কৃষ্ণার চিন্তা থেকে, কৃষ্ণাকে ঘিরে অসংখ্য অতৃপ্ত স্বপ্ন-কল্পনা থেকে মুক্ত হতে পারছিলেন না; প্রায় উন্মত্ত হয়ে উঠছিলেন, প্রিয়তমাকে দীর্ঘদিন চোখের দেখা থেকেও বঞ্চিত হবার চিন্তায়—সেই জন্যই লজ্জা ও পরিহাসের ভয় বিসর্জন দিয়ে ঐ সময়টুকু প্রার্থনা করেছিলেন—দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকার

পূর্বে অন্তত আর কিছুদিন তাঁর সান্নিধ্য ও সাহচর্য উপভোগ ক'রে যাবেন, প্রধানত সেই কথাটা মনে রেখেই—বোধ করি একটু মিথ্যাচরণ হচ্ছে জেনেও। প্রতারণাই করেছিলেন এক রকম। শুধু বাসুদেবকে নয়—নিজেকেও কিছুটা। কিন্তু সে প্রতারণাটা মনের অগোচর ছিল না বলেই, প্রার্থনাটা মুখ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অধিকতর লজ্জিত বোধ করেছিলেন, কুণ্ঠা সঙ্কোচের অন্ত ছিল না।

সে কুণ্ঠা ও সঙ্কোচ বহুগুণে বর্ধিত হ'ল, সেই সঙ্গে একটু আশঙ্কাও—পরদিন প্রভাতে উঠেই যখন শুনলেন বাসুদেব তাঁর ইন্দ্রপ্রস্থের প্রাসাদ ত্যাগ ক'রে একাই খাণ্ডবারণ্যে চলে গেছেন। কেবল তাই নয়, কোন রক্ষী কি সঙ্গীসাথী এমন কি রথ বা সারথিও নিয়ে যান নি। নবনির্মিত নগরীর প্রাকারসীমায় রথ রেখে পদব্রজেই অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করেছেন।

তবে কি তিনি অর্জুনের প্রতি বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হয়েই, এই গত কয়েক বছরের প্রায় নিত্যসহচরকে ত্যাগ ক'রে এই ভাবে একা চলে গেছেন? তবে কি—তবে কি চিরদিনের মতোই ত্যাগ করলেন পাণ্ডবদের? একের অপরাধে সকলকে দণ্ড দিলেন?

উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার সীমা-পরিসীমা রইল না।

সেই সঙ্গে কিছু কিছু আত্মনিপীড়ন, আত্মধিক্কারও।

বড়ই অপরাধী বোধ হতে লাগল নিজেকে।

আরও বিপদ—আশঙ্কার কারণ, অনুমিত কারণটা, যাঁকে জানিয়ে পরামর্শ উপদেশ নেওয়া চলত, সেই যুধিষ্ঠিরকে জানানোও কঠিন। তাহলেই, কেন তিনি শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ শোনেন নি, কেন সময় ভিক্ষা করেছেন—তাও বলতে হবে। আর সেক্ষেত্রে কি তাঁর অন্তরের এই লালসা-লালাসিক্ত কলুষঘৃণ্য চেহারাটা—স্থিতধী, পরমপ্রাজ্ঞ যুধিষ্ঠিরের মানসদৃষ্টির অগোচর থাকবে? বিশেষ, অর্জুন তাঁর কাছে মিথ্যা বলতে পারবেন না। যে সব যুক্তি তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে উপস্থাপিত করেছিলেন, তা যে শ্রীকৃষ্ণকে প্রতারিত করতে পারে নি—সে বিষয়ে অর্জুন যেমন আজ নিশ্চিত—তেমনি যুধিষ্ঠিরও যে নিমেষকাল মধ্যে সেই যুক্তিজাল ছিন্ন ক'রে আপাত-সত্য তথ্যরাজির মধ্য থেকে আসল কারণটিকে অনাবরিত করতে পারবেন সে বিষয়েও সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

শুধু যুধিষ্ঠিরই বা কেন, আরও যে যে শুনবে, সে-ই বুঝবে। সূক্ষ্ম বুদ্ধিকৌশল প্রয়োগের এই পদ্ধতিটা এতই স্থূল—প্রথম প্রণয়-উন্মত্ততা মানুষকে

নির্বোধাদপি নির্বোধ ক'রে দেয়, এতকাল পুঁথিপত্রে পড়েই এসেছেন, এখন নিজেকে উপলক্ষ ক'রে এই বাস্তব অভিজ্ঞতায় সে বচনের সত্যকার উপলব্ধি ও মর্মোদ্ধার ঘটল—যে, কারুরই বুঝতে বাকী থাকবে না আসল কারণটা।

বুঝবেন স্বয়ং দ্রৌপদীও।

ছি ছি, সে বড় লজ্জার!

অবশ্য মনকে একটা অতি ক্ষীণ আশ্বাস দেবারও চেষ্টা করেন, অর্থাৎ বোধ করি আরও একটা নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ ক'রে ফেলেন। তিনি মনকে বোঝাতে চান যে, এই অরণ্যটি বড় প্রিয় বাসুদেবের। ঐ কণ্টকগুল্মে দুষ্প্রবেশ্য, প্রস্তরখণ্ডে বন্ধুর পার্বত্য অরণ্যের মধ্যে কী আকর্ষণ আছে তা যদুনন্দনই জানেন—কী রস তিনি আস্বাদন করেন—মধ্যে-মধ্যেই, ইন্দ্রপ্রস্থে থাকলে তিনি ঐ অরণ্যে চলে যান এবং উদ্দেশ্যহীনভাবে ভ্রমণ করেন। এর মধ্যে বেশির ভাগ সময়ই অর্জুনও সঙ্গে থাকেন, তবে রুক্ষ, আতিথ্যস্নিগ্ধতাহীন প্রকৃতির এই কণ্টকিত রূপের মধ্যে কী মাধুর্য আছে, পার্থ তা ভেবে পান না।

ওঁর মনে আছে, এখানে আসবার সময়ই, অর্জুন এক স্থানে—যেটা অপেক্ষাকৃত বনস্পতিবহুল—এই আরণ্যভূমির দুর্ভেদ্যতা ও দুর্গমতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ ভাব-গাঢ় কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলেন, 'মানুষের বাসভূমি থেকে এ বনভূমি অনেক শ্রেয় অর্জুন! এখানে অকারণ ঈর্ষা নেই, হিংসা নেই—লোভ লালসা মাৎসর্য কিছুই নেই। কাম আর ক্রোধ হয়ত আছে—কিন্তু এখানে সেটা কেউ গোপন করার চেষ্টা করে না, সে প্রবৃত্তি বা রিপুর আদিম সরল মূর্তিটাই চোখে পড়ে। প্রবৃত্তির বর্বর চেহারা দুঃসহ—কিন্তু কাপট্যে আবরিত হ'লে তা অসহ হয়ে ওঠে।...ঐ বনস্পতিগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখ দেখি বন্ধু, ছায়া ও আশ্রয় দিয়ে ওরা প্রাণপণে উপকারই ক'রে যাচ্ছে জীবজগতের। ওদের কথাই বা বলছি কেন, এই বনভূমিতে যে মাংসভুক্ পশুরা ঘুরে বেড়ায়, যাদের আমরা হিংস্র শ্বাপদ বলি—মানুষের অপেক্ষা তারাও ভাল। প্রাণধারণে আহার্যের প্রয়োজন না হলে তারা হিংসা করে না, ক্ষুধা না থাকলে তারা শুধু রসনা চরিতার্থ করার জন্য ভোজন করে না। আরও কিছু অভিজ্ঞতা হোক—বুঝবে ওদের থেকে মানুষ অনেক বেশী হিংস্র, প্রাণী হিসেবে অনেক বেশী ইতর!'

এই সব সময়গুলোতে শ্রীকৃষ্ণকে বুঝে উঠতে পারেন না অর্জুন—কেমন যেন ভয়-ভয় করে। মনে হয় যে মানুষটি ওঁকে সখা বলে বন্ধু বলে অভিহিত করেন, সে মানুষটির এক বিরাট সত্তা, তাঁর মনোজগতের অনেকখানিই আজও অজ্ঞাত

থেকে গেছে ওঁর কাছে।

নইলে, ঐ যে কৃষ্ণকায় অনার্য লোকটা—অকারণে ওঁদের গালিগালাজ অভিসম্পাত করল—ভীমসেন ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বধ করতে উদ্যত হ'লে উনি অমনভাবে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিয়ে তাকে রক্ষা করবেন কেন? পরে অবশ্য জানা গিয়েছিল লোকটার অত আক্রোশ বা বিদ্বেষের হেতু কি—তবে তখন তো কেউই জানত না। শ্রীকৃষ্ণরও জানবার কথা নয়—কিন্তু না জানলেই বা তাকে ক্ষমা করবেন কেন? তবে কি উনি সত্যই অন্তর্যামী?

আজ আবারও সেদিনের সেই অপ্রীতিকর—অস্বস্তিকরও বটে—ঘটনাটা সদ্যসংঘটিতবৎ অর্জুনের স্মৃতিপটে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

মাংস ও চর্মব্যবসায়ী, কদন্নভোজী, নীচকর্মা নিষাদ একজন। তার পরিধানে দুর্গন্ধময় মল-লিপ্ত ছিন্ন বস্ত্র, আমচর্মের অঙ্গরক্ষক, হাতে ধনুর্বাণ—তার চক্ষুকোণে বহুদিনের ক্লেদ; তৈলহীন, প্রায়-জটাবদ্ধ পিঙ্গল কেশ—গাত্রচর্মও স্নানাভাবে ভস্ম-ধূসরবর্ণ ধারণ করেছে—সৃক্বণীতে পূর্ব দিনের সুরাপান ও অর্ধদগ্ধ রুধিরাক্ত মাংসভোজনের চিহ্ন—এক কথায় মূর্তিমান পিশাচ।

ওঁরা সে-সময় রথ-অশ্বাদি ত্যাগ ক'রে পদব্রজেই সঙ্কীর্ণ, অপরিসর পথে গভীর বনভূমি অতিক্রম করছিলেন—উনি আর বাসুদেব। সেই সঙ্কীর্ণ পথেরই ঠিক মধ্যস্থলে দাঁড়িয়েছিল লোকটা। তার মস্তিষ্কের অবিরাম-সুরাপান-জনিত জড়তা তখনও অপনোদিত হয় নি, পদক্ষেপ তো কষ্টকর বটেই, স্থিরভাবে দাঁড়াতেও পারছে না। ওঁরা কাছে যেতেও—সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে না দিয়ে ভ্রূকুটিবদ্ধ দৃষ্টিতে, অবজ্ঞাভরে একবার ওঁদের দিকে চেয়ে একটা কুৎসিত কটূক্তি ক'রে উঠল। সেই সঙ্গে ধনুতে শরযোজনারও চেষ্টা করল কিন্তু হাত বা পা কোনটাই ঠিক স্ববশে না থাকায় কিছুতেই সে ধনুঃশর লক্ষ্যলগ্ন করতে পারল না।

অর্জুন বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। কীট—বিষদংষ্ট্রা না হলেও অস্বস্তিকর গাত্রকণ্ডূয়ন-হেতু—তাকে পদতলে পিষ্ট করাই রীতি; অর্জুনও সেইভাবে তাঁর দিবারাত্রের সঙ্গী ধনুর দিকেও তাকিয়ে ছিলেন একবার; ইতিমধ্যেই মধ্যম পাণ্ডবও, বাসুদেবদের দেখাদেখি সেই পাদপরিসর পথেই আসছিলেন, দূরত্ব সংক্ষেপিত হওয়ার আশায়—তিনি এই বাধায় ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটি ক'রে হুঙ্কার দিয়ে উঠেছিলেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের এসব কোন বৈলক্ষণ্যই দেখা গেল না। তিনি বরং প্রশান্ত প্রসন্নস্মিত মুখেই সেই অপরিসর পথ ছেড়ে কণ্টকগুল্মের মধ্য দিয়েই লোকটিকে পরিহার ক'রে যাবার চেষ্টা করলেন।

এইবার কিন্তু অকস্মাৎ যেন লোকটির মত্ততা কেটে গেল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই টলছিল একটু একটু—এখন যেন পা-দুটো প্রকৃতিস্থ ও আজ্ঞাবহ বোধ হ'ল। সেও ক্ষিপ্রপদে সেই প্রস্তরকণ্টকাকীর্ণ বন্ধুর ভূমিতে নেমে এসে পুনশ্চ ওঁদের পথ রোধ ক'রে দাঁড়াল। তারপর সুরা-রোষ-রক্তিম ক্রূর দৃষ্টিতে ওঁদের দিকে চেয়ে বলল, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও। অত ব্যস্ততার কোন হেতু নেই। তোমরা—তোমরা পাণ্ডব না? ঐ যে বিরাট দলটি অবিরত বৃক্ষচ্ছেদন ও মৃগনাশ করতে করতে নূতন নগরী পত্তন করতে চলেছে—তোমরাও তো সেই দলের? বেশ হর্ষোৎফুল্ল চিত্তেই সর্বনাশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছ, না? বাঃ বেশ।'

আবারও ভীমের হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উঠল, অর্জুনের ভ্রূকুটি ভয়ঙ্করতর হ'ল কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অভ্যস্ত মিষ্ট গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ। ইনিই তৃতীয় পাণ্ডব, ফাল্গুনী। পিছনে ইনি ত্রিলোকখ্যাত মহাবল ভীমসেন, দ্বিতীয় পাণ্ডব। কিন্তু তুমি কে? এভাবে আমাদের পথে বাধাসৃষ্টি করছ কেন? তোমার আকৃতি ও পরিচ্ছদ বোধ হচ্ছে তুমি নিষাদ, পশুবধ ক'রে মাংস আহরণে এসেছ। তা আমরা তো তোমার কাজে বাধা দিচ্ছি না, তোমার প্রতিযোগীও নই, তবে তুমি এই উষ্মাই বা প্রকাশ করছ কেন, আর সর্বনাশ শব্দই বা উচ্চারণ করলে কী কারণে?

লোকটি এতক্ষণ—শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্য তার কানে যাচ্ছে কি না বোঝাই গেল না—একদৃষ্টে অপলকনেত্রে ভীমসেনের দিকে চেয়েছিল। সে দৃষ্টি অপসারিত না ক'রেই উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, আমি নিষাদ। আমার নাম কীলক।'

বলতে বলতে তার কণ্ঠস্বর যেন আরও উগ্র, দৃষ্টি আরও রোষকষায়িত হয়ে উঠল, একটু এগিয়ে, একেবারে অর্জুনের সামনে এসে বলল, 'নামটা শুনে মনে পড়ল কিছু, আমাকে চিনতে পারলে?'

অর্জুন বিরক্ত হয়েছিলেন, এবার বিস্মিত হয়ে তার দিকে ভাল ক'রে তাকালেন, কিন্তু আপাদমস্তক নিরীক্ষণ ক'রেও পরিচয়ের কোন সূত্র ধরতে পারলেন না। বললেন, 'না বাপু, কই তোমাকে তো চিনি বলে মনে পড়ছে না! তুমিই পূর্ব-পরিচয়ের সূত্রটা ধরিয়ে দাও বরং। আমরা কি ইতিপূর্বে তোমার কোন অপ্রীতির কারণ হয়েছিলুম?...জ্ঞানত কোন অনিষ্ট করেছি বলে তো স্মরণ হচ্ছে না। যদি করেও থাকি—সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে।'

এত সৌজন্য ভীমসেন বোঝেন না। তিনি তাঁর হস্তস্থ গদাসম স্থূল দণ্ডটি দৃঢ় মুষ্টিতে ধরে অর্জুনকে ঠেলে এগিয়ে এলেন এবার। এই মূঢ় ধৃষ্টটা

নিয়তিতাড়িত হয়েছে, অধীর হয়ে উঠেছে মৃত্যুকে বরণ করার জন্য ; তার আকাঙ্ক্ষা মিটিয়েই দেবেন আজ।

কিন্তু কীলক ভয় পেল না। মনে হ'ল তার মৃত্যুতে কোন ভয় নেই। বরং যেন সম্ভাব্য মৃত্যুকে স্পর্ধা প্রকাশ করতেই তার বাচনভঙ্গী ও কণ্ঠ, শুধু প্রকৃতিস্থই নয়, ব্যঙ্গবক্র হয়ে উঠল আরও। সে বলল, 'এই যে, মহাবাহু মহাবল ভীমসেন যাত্রাপথের বাধাসৃষ্টিকারী নীচ-জাতি পাপিষ্ঠটাকে বধ করতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন। তা বটে, আমিই বা অবশিষ্ট থাকি কেন!···ভীমসেন, তুমিই বেশী অপরাধী। বুদ্ধি যারই হোক, সেটাকে কার্যে পরিণত করেছ তুমিই।···অপ্রীতি! অপ্রীতির কারণ তোমরা জান না, না? অনিষ্ট করেছ বলেও মনে পড়ছে না! তা পড়বে কেন? যে অনিষ্ট করে তার তো তা জানবার কি মনে রাখার কথা নয়। যার হয় সে-ই রাখে। যে কীট পদদলিত হয়, কীট হলেও মৃত্যুযন্ত্রণা তার সমানই লাগে।···মহা আনন্দে নূতন রাজধানীর পত্তন করতে চলেছ, নূতন রাজ্যসুখ ভোগ করবে বলে।·· শুনে রাখো—এই সুরাপায়ী কদাচারী নিষাদের কথাগুলো মনে রাখার চেষ্টা ক'রো—এ রাজধানী এ রাজ্য তোমাদের ভোগে হবে না, সুখেশান্তিতে কোন দিনই সম্ভোগ করতে পারবে না। এই রাজ্য আর ঐশ্বর্য মহা অশান্তির কারণ হবে, স্বর্ণপালঙ্কের সুখশয্যা কণ্টকশয্যা হয়ে উঠবে। মহাশ্মশানে পরিণত হবে এ রাজ্য, তোমরা সেই শ্মশানপ্রহরী চণ্ডালের মতো বেঁচে থাকবে শুধু। অকারণে আমার সমস্ত স্বজন, প্রিয়জন নাশ করেছ, নির্বংশ করেছ—হাহাকার সম্বল করেছ জীবনে—তোমাদেরও স্বজন বলে কেউ থাকবে না, সমস্ত ভোগৈশ্বর্যের উপকরণ বিষ হয়ে উঠবে। তোমাদেরও শোক আর হাহাকার সম্বল হবে।···যাও, এই পথ ছেড়ে দিচ্ছি, চলে যাও নির্বিঘ্নে—আবারও বলছি, শ্মশানরাজ্যের দিকে, মহা সর্বনাশের দিকে!'

সে সত্যিই এঁদের পথ ছেড়ে দূরে সরে গিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। কিন্তু এবার অর্জুনই ঘুরে গিয়ে তার সম্মুখে দাঁড়ালেন। বললেন, 'দাঁড়াও। তুমি কেন এমন ভাবে আমাদের সম্বন্ধে এই কটূক্তি আর অভিসম্পাত করছ—তার সঙ্গত কারণ না দেখালে তোমার অব্যাহতি নেই। আমরা কোন অবিচার করতে চাই না—আত্মপক্ষ সমর্থনে তোমার কি বলার আছে তা নিশ্চয়ই শুনব, কিন্তু তা যদি না বলতে পার তাহলে অবশ্যই শাস্তি নিতে হবে। তোমাকে বধ করলে আমাদের হস্ত ও অস্ত্র কলুষিত হবে, অন্য কঠোর শাস্তি দেব। মদ্যপের প্রলাপ বলে ক্ষমা করারও একটা সীমা আছে, স্মরণ রেখো।'

'ও তাই নাকি! অবিচার করতে চাও না, না ক্ষমা তোমরা করতে চাও? কে চাইছে সে ক্ষমা? বিচারই তো আমি চাই, বিচার আর অপরাধীর শাস্তি। সুবিচারবোধের বড় অহঙ্কার তোমাদের, না? উচিত তো। রাজত্ব করতে যাচ্ছ, রাজবংশের সন্তান, নিজেরা রাজা—তোমাদের কাছে সুবিচারই তো আশা করি।···আমার আত্মপক্ষ সমর্থনের আগে আমিই সুবিচার প্রার্থনা করছি। আমার অভিযোগ পাণ্ডুপুত্রদের নামে। অকারণে প্রাণনাশ, আশ্রিত নাশ, আশ্রয়প্রার্থীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা—এই তিনটি অভিযোগ। সুবিচার চাই আমি, ন্যায় ও ধর্মমতে সুবিচার।···করো এবার বিচার।'

শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু সর্বক্ষণ প্রশান্তমুখে স্থির দৃষ্টিতে এই নিষাদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। অর্জুনের মনে হ'ল তাঁরও ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ একটু বিদ্রূপ-হাস্যভঙ্গী। এইটেই প্রবল বিস্ময়কারণ অর্জুনের কাছে।

এবার কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কাছে এগিয়ে এলেন। তাঁর কণ্ঠে উষ্মা কি বিরক্তির লেশমাত্র নেই, সহজ ভাবেই বললেন, 'বাগাড়ম্বর বা রহস্যঘন ভাষা ত্যাগ ক'রে তোমার অভিযোগটা যদি স্পষ্ট ও সরল ভাষায় প্রকাশ করো তো এঁদের বোঝবার বা উত্তর দেওয়ার সুবিধা হ'তে পারে।'

পূর্বের সে সুরামত্ততা ও ঔদ্ধত্যের চিহ্নমাত্র নেই তখন আর কীলকের, তার ক্রোধ বোধ করি চরমে ওঠাতেই তার গলার স্বর শান্ত হয়ে উঠেছে, শুধু লক্ষ্য করলে দেখা যেত যে সেটা শাণিত বলেই শান্ত শোনাচ্ছে। সে বলল, 'স্পষ্ট প্রাঞ্জল ভাষাতেও বলতে পারি বৈকি। তুমি তো দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ, এদের পরামর্শদাতা। তোমার মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে, তুমি সবই বুঝেছ, তবে আর আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছ কেন?···রাজা, রাজা কেন, ক্ষত্রিয়মাত্রেরই শুনেছি, আশ্রিত ও আশ্রয়প্রার্থীকে রক্ষা করা, বিশেষ যে সরল বিশ্বাসে নির্ভরতার সঙ্গে এসে আশ্রয় নিয়েছে—তাকে রক্ষা করার জন্য অনায়াসে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দেওয়াই ধর্ম। তাই না?···কিন্তু এই পাপিষ্ঠ নরকীটগুলো নিজেদের অকিঞ্চিৎকর প্রাণগুলোর জন্য—তাও তখনই সে প্রাণ এত বিপন্ন হয় নি—কিংবা বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে সদ্য নিজেদের প্রাণরক্ষার মতো অবস্থাও হয় নি—তা হলেও এ কুকার্যের যুক্তি থাকত—সে রকম কোন কারণই ছিল না—সুদূর ভবিষ্যতে কোন একদিন হয়ত সে প্রাণ পুনঃবিপন্ন হতে পারে এই আশঙ্কা দূর করতে—বেঁচে থেকে রাজৈশ্বর্য নারীসম্ভোগ করার লোভে—অনায়াসে, অকারণে ছটি প্রাণ নষ্ট করেছে, তাদের মৃত্যুর কারণ ঘটিয়েছে!···

আরও প্রাঞ্জল ভাষায় শুনতে চাও?…আমার স্ত্রী ও পাঁচটি শিশুপুত্রদের—আমি পশুশিকারে দূর অরণ্যে গিয়েছিলাম, সেই অবসরে—সুখাদ্য ও সুপেয় সুরার প্রলোভন দেখিয়ে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, এই এরা। হ্যাঁ, মৃত্যু সামনে দেখলে কারও অকারণে পানভোজন উৎসব করার ইচ্ছা হয় না—ব্রাহ্মণ-ভোজনের নাম ক'রে ইতর ভদ্র অনার্য নীচজাতি সবাইকেই নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল—জাল পেতে যেমন নিষাদরা পাখি ধরে, বন্য পাখির সঙ্গে কোন কোন চিহ্নিত মূল্যবান পাখিও এসে পড়বে এই আশায়—এও, আমার স্ত্রী-পুত্ররাও এই জালে ধরা পড়বে এই আশাতেই এত আয়োজন। আমি একাধিক প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে যে বিবরণ শুনেছি—তাদের ডেকে নিয়ে গিয়ে সন্ধ্যার কিছু পূর্বে তাদের আহার করানো হয়েছে—সেও স্বাভাবিক, ভদ্র উচ্চবর্ণের লোকদের ভোজন শেষ হ'লে তবেই এই ইতরদের খেতে দেওয়া হবে, এইতেই অভ্যস্ত সবাই—এদের যত না খাদ্য দেওয়া হয়েছে তত মদ্য, বিনামূল্যে বিনা পরিশ্রমে উৎকৃষ্ট সুরা—নীচজাতীয় স্ত্রীলোকটা আকণ্ঠ পান করবে তাও এরা জানত। তাই হয়েও ছিল, মদ্য পান করতে করতে আমার স্ত্রী অচৈতন্য হয়ে পড়েছিল। তা না পড়া পর্যন্ত এরা পরিবেশন থামায় নি—ঈশ্বর জানেন, শুধুই সুরা না অন্য মাদক ছিল তাতে—সে বেচারী উঠে দাঁড়াতে কি চলে যেতে পারে নি, সূর্যাস্তের পর অন্ধকারে ঐ অবস্থায় কোথায় যাবে সে! সঙ্গে পাঁচটি ছেলে ছিল যদিও, তারাও প্রচুর সুরাপান করেছে, সেই সঙ্গে বহুদিন পরে বহু সুখাদ্য—তাও আশ পুরিয়ে খেয়েছে—আর কোথাও যাওয়ার চেষ্টা করে নি আমার স্ত্রী—এদের আশ্রয়ে কোন অনিষ্টের হেতু নেই এই আশ্বাসও ছিল—তারা সেখানেই মাটিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, নিশ্চিন্ত মনে। সেই সুযোগে এরা—হ্যাঁ, ঐ সুযোগেরই অপেক্ষায় এত আয়োজন এদের—সমস্ত বাড়িটির চতুর্দিকে আগুন লাগিয়েছে সমস্ত বাড়িটি বেষ্টন ক'রে, চক্রাগ্নি বা বেড়া আগুন যাকে বলে, তার পর নিজেরা নিরাপদে সুড়ঙ্গপথে পালিয়ে এসেছে, ঐ নিরপরাধ অচৈতন্য স্ত্রীলোক ও বালকগুলোকে নিশ্চিত মৃত্যুর মধ্যে ফেলে। কেন জান যদুনাথ? যাতে এদের অস্থি দেখে সকলে স্থির করে যে পঞ্চপাণ্ডব আর তাদের বহুজনবল্লভা মা-টাই পুড়েছে, ওদের খুঁজে বার করার চেষ্টা না করে।'…তার পর একটু থেমে সব্যঙ্গে আবারও বলে, 'কেমন, অভিযোগ বেশ স্পষ্ট ভাষাতেই ব্যক্ত হয়েছে তো? এবার সুবিচার করো। তোমাদের রাজ্যশাসনের প্রারম্ভে এই বিচারই প্রথম বিচার হোক তোমাদের!'

ভীমসেন জননী সম্বন্ধে ব্যঙ্গোক্তি শুনে পুনশ্চ উগ্র বেগে তাঁর দণ্ড উদ্যত

ক'রে এগিয়ে যাচ্ছিলেন—শ্রীকৃষ্ণ মাত্র বাম হস্তেই তাঁকে নিবৃত্ত ও সংযত করলেন।

সেদিন প্রভাতকাল থেকেই বিস্মিত হবার পালা চলেছে ফাল্গুনীর—কিন্তু এ বিস্ময় অপরিমাণ! ক্রুদ্ধ ভীমসেন কারও প্রতি অস্ত্রবদ্ধ-করে ধাবিত হ'লে তাঁকে এত অনায়াসে সম্বরণ করতে পারে এমন শক্তিধর অদ্যাপি দেখেন নি অর্জুন। বাসুদেবের নবনীত-কোমল দেহে এমন দৈহিক বীর্য আছে তা তিনি কখনও কল্পনা পর্যন্ত করেন নি। এখন বুঝলেন যে তাঁর সম্বন্ধে অগণিত অসুরবধের যে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, কেবলমাত্র হস্ত দ্বারা কংসবধের কাহিনী—তা অলীক কল্পনা নয়, তার মূলে সত্যও আছে।

বিস্মিত হলেন ভীমসেনও। শুধু তাই নয়, এই অবিশ্বাস্য দৈহিক বলের পরিচয় পেয়ে তিনি যেন কেমন কুণ্ডলীবৎ সঙ্কুচিত হয়ে গেলেন, কোন প্রতিবাদবাক্য উচ্চারণেরও ক্ষমতা রইল না।

ভীমসেনকে প্রতিনিবৃত্ত করে শ্রীকৃষ্ণ কীলককেই সম্ভাষণ করলেন, বললেন, 'আত্মরক্ষার্থে কোন কাজই অনুচিত বা দণ্ডার্হ নয়—ন্যায়শাস্ত্রে এ বিধান আছে।'

'কিন্তু এখানে কি আত্মরক্ষার জন্যই এ হত্যা করা হয়েছিল? তখন তো এরা কৌরব-শত্রুতার বাইরেই চলে যাচ্ছিল, ভবিষ্যতে আর কোন বিপদ না আসে—সেজন্য এতখানি শঠতা ও বিশ্বাসঘাতকতাও কি তোমার ন্যায়শাস্ত্র সঙ্গত?'

'ভবিষ্যৎ প্রাণভয় থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থাও আত্মরক্ষার মধ্যে পড়ে বৈকি নিষাদ।'

'অ। এটা আমার জানা ছিল না। আমি মূর্খ, শাস্ত্র পড়ি নি। তোমার কথাই বিশ্বাস করছি। তবে যদি সত্যই এ আচরণ পাপ না হয়, শাস্ত্রে এ ক্ষমার নির্দেশ থাকে, তাহলে বুঝতে হবে সে ন্যায়নীতি তোমাদের মতো সুবিধাবাদী অন্যায়-অধর্মচারীরই রচনা। তোমাদের কাছে আমি আর বিচার প্রার্থনা করব না। কোন মনুষ্যত্বই আশা করব না আর। তোমাদের অত্যাচার প্রতিনিবৃত্ত করার শক্তিও নেই, সে চেষ্টাও করব না—তোমাদের ইচ্ছা হয় আমাকে বধ করতে পারো, বা তৃতীয় পাণ্ডব যে তার অধিক শাস্তির ভয় দেখিয়েছিলেন, তাও দিতে পারো—তবে আমার অভিসম্পাত আমি ফিরিয়ে নেব না। আমার বিবেক আমার কাছে সব শাস্ত্রের বড়, সেই বিবেক অনুসারে তোমরা অপরাধী। অপরাধীর অপরকে বিচার করারও অধিকার নেই।'

কীলক আর ওঁদের দিকে চাইল না, ওঁরা ওকে বধ করতে উদ্যত কিনা তাও জানতে চাইল না, ধীর পদক্ষেপে আরও নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করল।

অর্জুন তাকিয়ে দেখলেন বাসুদেবের মুখে তখনও সেই দুর্বোধ্য প্রসন্নতা, স্মিত মুখ।

কে জানে কেন, অর্জুন বা ভীমসেন কেউই আর ঐ ক্রূরকর্মা নিষাদটার পশ্চাদ্ধাবন কি তাকে শাস্তি দেবার কোন উৎসাহ বোধ করলেন না।

এই ঘন অরণ্যের সুউচ্চ বৃক্ষশীর্ষের শাখাপ্রশাখা পত্রপল্লবে এখনও প্রভাত-আলোর নর্তন অব্যাহত, চারিদিকের বৃক্ষচূড়ে বিভিন্ন পক্ষীর বিচিত্র মধুর কূজনও বন্ধ হয় নি—মিশ্রিত বন্যপুষ্প ও শিশিরস্নিগ্ধ-মৃত্তিকার সৌরভ নিঃশ্বাসে প্রবেশ ক'রে ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে তেমনিই প্রফুল্ল ক'রে তুলছে—চতুর্দিকে প্রকৃতির আনন্দসমারোহ এতটুকু ম্লান কি ক্ষুণ্ণ হয় নি কোথাও—শুধু এই নবজীবনযাত্রী দুটি তরুণের কাছে এ সমস্তই যেন ব্যর্থ বোধ হতে লাগল, তাদের বিপুল আশা ও সীমাহীন উৎসাহের যেন আর অবশেষ কিছু রইল না। অকারণ একটা অপরাধ-বোধের ক্লিন্নতায় তাঁদের অন্তর ক্লিষ্ট ও চিন্তাভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে—একটা অজ্ঞাত অশুভ আশঙ্কার ছায়া তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষার আকাশকে কিছুতেই নির্মল ও উজ্জ্বল হ'তে দিচ্ছে না।

তাঁরা গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে বাসুদেবের অনুসরণ করলেন।

॥ ৯ ॥

ভীমার্জুন যে সেদিন ঐ স্পর্ধিত নীচকর্মা কদর্য লোকটার ধৃষ্টতার সমুচিত প্রত্যুত্তর দিতে পারেন নি—যদিচ বার বার নিজেদের বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, ঐ পশুরও অধম সুরাপায়ী কদন্নভোজী লোকটার এই অসহ স্পর্ধার উপযুক্ত শাস্তিদান করাই কর্তব্য ছিল; অন্ততঃ ওর অভিসম্পাতকে কিছুমাত্র গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নেই; তবু যে কিছুতেই সহজ, প্রকৃতিস্থ ও বিষাদমুক্ত হতে পারেন নি, নীরবে এক অপমানের জ্বালা ও অজ্ঞাত আশঙ্কার অস্বস্তি ভোগ করে গেছেন—সে জন্য মনে মনে বাসুদেবকে দায়ী করে একটা নিগূঢ় অভিমান বোধ করেছিলেন।

বাসুদেব ওকে মিষ্ট ব্যবহারের দ্বারা প্রশ্রয় দেবার এবং ভীমকে অযথা নিবৃত্ত করার ফলেই, এতখানি স্পর্ধা প্রকাশ করেও নিরাপদে চলে যেতে পারল—সে অভিমানের যেন এইটিই অনুক্ত কারণ।

অথচ সত্যাশ্রয়ী অর্জুন এ তথ্যটাও একেবারে অস্বীকার করতে পারছিলেন না যে, লোকটার অভিযোগের মূলে কিছুটা সত্যের ভিত্তি আছে। একেবারে মিথ্যা কি অযৌক্তিক নয় বলেই সেদিন তাঁদের নিরুত্তর থাকতে হয়েছিল এবং অবস্থা বুঝে তাঁদের সম্মানরক্ষার্থই শ্রীকৃষ্ণ একটা অতি দুর্বল যুক্তি উপস্থাপিত করার চেষ্টা করে বর্তমান অপ্রীতিটা চাপা দিতে চেয়েছিলেন। তবু, অভিমান তো যুক্তিতর্কের ছাড়পত্র বা অনুমতির অপেক্ষা করে না, বিশেষ সেদিন ঐ নিষাদের ব্যঙ্গোক্তি ধিক্কার বা অভিযোগের উত্তর দেওয়ার সামর্থ্য ছিল না বলেই—লজ্জা আত্মরক্ষার পথ খুঁজতে অভিমানের আশ্রয় নিয়েছিল। সেদিনকার উপায়হীন প্রতিকারহীন অপমানবোধ অপর কাউকে, অপর কিছুকে দায়ী করতে না পারলে তাঁদের অব্যাহতি দিত না, তাঁরা মুখ দেখাতে পারতেন না তাঁদের অধস্তনদের কাছে। মানুষমাত্রেই এই মনোভাব পোষণ করে——ভীমার্জুনও মানুষ।···

আজও সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার স্মৃতিটা স্মরণে আসামাত্র, অর্জুন আবারও এক দুর্বার অভিমান বোধ করলেন বাসুদেব সম্বন্ধে। যেন ওঁদের লজ্জা ও অপমান থেকে বাঁচাতে বাসুদেবেরই উচিত ছিল ধৃষ্ট অভদ্র লোকটাকে বধ করা। তাহলে এঁরা বিবেকের কাছে মুক্ত থাকতে পারতেন, অথচ অপমানের গ্লানিটা এমন ভাবে সহ্য করতে হত না।

সেদিনের সে ঘটনা স্মরণ হতেই অভিমান উদ্বেল হয়ে উঠল অর্জুনের। কিন্তু হায়, তিনি যদি জানতেন, যদি জানা সম্ভব হ'ত—আজ এই মুহূর্তে, কোন্ উদ্দেশ্যে, কোন্ স্বকার্য সাধনে বাসুদেব একা খাণ্ডব অরণ্যে প্রবেশ করেছেন, তাহলে এ অভিমান,—অভিমান কেন সমস্ত অনুভূতিই তাঁর শিলীভূত হয়ে যেত, স্বীয় মৃত্যু-ইচ্ছা ছাড়া অন্য কোন চিন্তা থাকত না। আর, বাসুদেব সম্বন্ধে তাঁর এই যে সীমাহীন বিস্ময়—তা আরও দুর্বোধ্য, আরও কল্পনাতীত হয়ে উঠত।

হয়ত ক্ষোভ, দুঃখ বোধ করতেন। বিরক্তি? উষ্মা?—না, এসব বোধ করার শক্তিই অর্জুনের নেই ঐ মানুষটি সম্বন্ধে। ওঁর কার্যকারণের অবিশ্বাস্য সূক্ষ্মতা অর্জুনের মনে যে সম্ভ্রম ও ভীতির উদ্রেক করেছে—তাতেই বিরক্ত হওয়ার আর কোন উপায় রাখে নি।

এবং ঐ ক্ষোভ দুঃখ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত দুর্বল অনুভূতিগুলিও পরে—অনেক পরে বোধ করতেন। দীর্ঘকাল পরে—প্রস্তরীভূতবৎ জড়তা কাটলে।···

বাসুদেব সেদিন গহন অটবীতে একা প্রবেশ করেছিলেন সেই পিশাচমূর্তি নিষাদটারই সাক্ষাৎলাভের আশায়।

কীলকের সন্ধানে ইতিপূর্বে আরও কদিন এসেছেন। সে-সব দিনে অর্জুনকে পরিহার করে একাই আসেন। অর্জুন ভাবেন নির্জনে আত্মস্থ বা ধ্যানস্থ থাকার প্রয়োজনেই ঐ কণ্টকগুল্মসমাকীর্ণ, হিংস্র-পশু-অধ্যুষিত গহনে প্রবেশ করেন। বাসুদেবের মনের বিচিত্র গতির সন্ধান পাওয়া—সন্দেহ করাও অর্জুনের সাধ্যাতীত—তা ভাসা-ভাসা ভাবে বোধ করলেও এমন ভাবে বোঝেন নি কখনও।

কীলক যে মধ্যে মধ্যে এই বনে আসে, বাসুদেব তা নির্ভুল ভাবেই অনুমান করেছিলেন। সে একা, নিঃসঙ্গ। কোথাও নতুন ক'রে বাসগৃহ বা সংসার স্থাপনের চেষ্টা করে নি, সম্ভবতঃ ভবিষ্যতেও করবে না। এটা সেদিনের কথোপকথন থেকেই বুঝেছেন। তারও পূর্ব হতে ওর সংবাদ রাখেন তিনি। যেদিন নিঃসংশয় হয়েছিলেন যে বারণাবতের জতুগৃহে দগ্ধাবশিষ্ট নরকঙ্কালগুলি পাণ্ডবদের নয়—হতে পারে না, সেদিনই বিশেষ শিক্ষিত ও বিশ্বস্ত চর প্রেরণ করে বারণাবতের চতুষ্পার্শ্বে সন্ধান করেছিলেন যে সে ভাগ্যচিহ্নিত দিনটিতে তাঁর পিতৃষসা পৃথার আমন্ত্রণে যারা ঐ জতুগৃহে এসেছিল তাদের মধ্যে কে কে আর ফিরে যায় নি।

সেই চরই নিষাদীর সন্ধান দিয়েছে। পরিচয়ও। আর সে তথ্য জানার পর থেকেই কীলককে খুঁজে বেড়াচ্ছেন তিনি। ভাগ্যের ও মানুষের এই মিলিত অবিচারের জন্য তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিশোধস্পৃহার বহ্নি বহন করে নিশ্চিত সে একাই কোথাও আছে। এতখানি জ্বালা তাকে কখনই স্থির থাকতে দেবে না—এও ধ্রুব।

কিন্তু প্রতিহিংসাস্পৃহা ও ক্ষুব্ধ অভিমান—যা-ই মানুষকে দগ্ধ করুক না কেন, ক্ষুধার জ্বালা আরও বেশী। নিষাদের খাদ্য বা খাদ্য উপার্জনের উপায় নিবিড় অরণ্য ছাড়া কোথাও নেই। সুতরাং অবিচ্ছিন্নভাবে বাস না করলেও ঘুরে-ফিরে তাকে কোন-না-কোন বনস্থলীতেই আসতে হবে। তবে চতুর্দিকে অরণ্যানীর অভাব নেই বলেই অনুসন্ধানের ক্ষেত্রটা কোন বিশেষ কেন্দ্রবিন্দুতে সীমাবদ্ধ করতে পারেন নি।

এই রকম অনুমান করেছিলেন বলেই—সেদিন ওকে দেখা মাত্র চিনেছেন। জীবনে যার লক্ষ্য নেই, আশা নেই ; যার গৃহ নেই, গৃহ-সুখ নেই—সে-ই এমন ভাবে দেহকে উপেক্ষা ক'রে ঘুরে বেড়াতে পারে, জীবনকে তাচ্ছিল্য করতে পারে।

সেদিন চিনেছেন কিন্তু সেটাকে কাজে লাগাতে পারেন নি। তাঁর বক্তব্য কারও সাক্ষাতে বলা যাবে না। তার পর থেকেই মধ্যে মধ্যে এখানে আসছেন কীলকের খোঁজে। সে কোথায় থাকে প্রশ্ন করে কোন লাভ হ'ত না, কবে আবার দেখা হতে পারে সে প্রশ্নেরও অবসর ছিল না, হয়ত তাও নিরর্থক করা হ'ত। দৈবক্রমে দেখা হয়েছে, আবার দৈবানুগ্রহেরই অপেক্ষা করতে হবে।

এমনি বৃথা অন্বেষণে কয়েক দিন অপব্যয়িত হয়েছে। তবে সেদিন দেখা গেল দৈব অনুকূল। গহনের একটু গভীর প্রদেশে প্রবেশ করতেই দেখলেন একটা সুবৃহৎ শালকাণ্ডে মাথা রেখে প্রায় অচৈতন্যের মতোই নিদ্রাভিভূত লোকটা। এক হাতে চিরসঙ্গী ধনু, কিছু দূরে তূণীর এবং ঠিক পাশেই এক বিপুলাকার সুরাভাণ্ড।...গত রাত্রির সুরাগন্ধে আকৃষ্ট হয়ে সেই প্রত্যুষেই মক্ষিকার দল এসে জুটেছে, তাদের একদল মৃৎভাণ্ডটি অন্ধকার করে বসে আছে তার গায়ে, আর একদল লোকটার ঈষন্মুক্ত অধরের চারিপাশে পীতাবশিষ্ট সুরার প্রসাদ পাচ্ছে।

বাসুদেব আর বিলম্ব করলেন না। অনুতপ্ত শঙ্কিত অর্জুন যে কোন মুহূর্তে তাঁর সন্ধানে এখানে এসে পড়তে পারে। তিনি প্রথমেই সন্তর্পণে নিষাদের নিদ্রাবিবশ শিথিল মুষ্টি থেকে ধনুকটি অপসারণ করলেন, তারপর তূণীরটিও সংগ্রহ করে এক বৃক্ষশাখায় তুলে রাখলেন। অতঃপর, জলের অভাবে সেই সুরাভাণ্ডটারই এক প্রান্ত ধরে, অবশিষ্ট সামান্য মদ্যটুকু—তীব্রবীর্য কটুগন্ধ সেই পানীয়ই—ছড়িয়ে দিলেন ওর মুখে।

চমকিত, সদ্যনিদ্রাভঙ্গে বিহ্বল কীলক অস্থির ভাবে উঠে বসেই নিজের মুষ্টির দিকে তাকাল, ধনুঃশরের খোঁজে—সেগুলো না পেয়ে আরও ব্যস্ত আরও অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়াতে, শ্রীকৃষ্ণ শান্ত মধুর কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'স্থির হও কীলক। অস্ত্রের প্রয়োজন হবে না, সেজন্য চিন্তিতও হয়ো না। আমি তোমার বন্ধু।'

যে শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যে বাস করে, তার ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি বা ষষ্ঠেন্দ্রিয় সদা ত্রস্ত ও সদাসতর্ক থাকে। কীলকেরও সুরাপান বা নিদ্রাজনিত জড়তা কাটতে বিলম্ব হয় না। সে আরও ভীত ও চকিত হয়ে চারিদিক তাকাল, শ্রীকৃষ্ণকে দেখতেও পেল এবার। মনে হ'ল চিনতেও অসুবিধা হ'ল না। সেই সূত্র ধরে সেদিনের ঘটনাও মনে পড়ল।

আশ্বস্ত হ'ল কিনা তা বোঝা গেল না। তবে শান্ত হ'ল কিছুটা। ধীরেসুস্থে হাতের পিছন দিয়ে ললাটের স্বেদ এবং মুখের গ্লানি মুছে নিয়ে বলল, 'ও

তুমি !···তা তুমি এখানে কি মনে ক'রে? সেদিনের অসমাপ্ত কাজটা শেষ করতে এসেছ বুঝি? তাই তস্করের মতো আগেই আমার ধনুঃশর চুরি করেছ? তবে এত সতর্কতার প্রয়োজন ছিল না। আমাকে বধ করতে এলে আমি এমনিও তোমাকে বাধা দিতাম না। বাধা দিলেও পেরে উঠতাম না তো। আমরা অন্তরাল থেকে পশুবধ করি—তাও করি জীবিকার জন্য—মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অকারণে মানুষ বধ করার অভ্যাস নেই।'

বাসুদেব হাসলেন। সেই রহস্যময় অভয়ভরা মধুর হাসি—যে হাসি দেখলে বালক-বৃদ্ধ-স্ত্রীলোক নির্বিশেষে মুগ্ধ ও বশীভূত হয়। বললেন, 'না কীলক, আমি তোমাকে বধ করতে আসি নি। সে ইচ্ছা থাকলে সেদিন মধ্যম পাণ্ডবকে বাধা দেব কেন? আমি সত্যই তোমার বন্ধুরূপে—বন্ধু হতে এসেছি।'

'বন্ধু হতে এসেছ! বন্ধু! হাঃ!' একটা অবজ্ঞাসূচক শব্দ করে জৃম্ভণ ত্যাগ করল কীলক। গতরাত্রের মত্ততা তার অনিবার্য অবসাদ এনেছে, সেই সঙ্গে মস্তিষ্কের পাষাণভার। সে দু হাতে নিজের মাথাটা ধরে একটা প্রবল নাড়া দিয়ে নিল, তারপর সুরাকলসটা নেড়ে দেখল কিছু অবশিষ্ট আছে কিনা। বোধ হয় সামান্য কিছু ছিল, সেইটুকুই গলায় ঢেলে দিয়ে যেন একটু প্রকৃতিস্থ হ'ল। একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'বন্ধু আমার আর কী কাজে আসবে? বন্ধুতে আমার কোন প্রয়োজন নেই। তুমি আমার কোন উপকার করতে আসোও নি। কী চাও, কী উদ্দেশ্যে এসেছ সেইটেই খুলে বল দিকি!'

'তোমার কি কোন প্রয়োজন নেই? ভাল ক'রে ভেবে দ্যাখো তো।'

'না, কিছুই না। আমার কোন ইচ্ছা বা কামনা নেই, সে জন্য কোন প্রয়োজনও নেই।'

'প্রতিহিংসা নেবার ইচ্ছাও নেই? সত্য কথা বলছ?'

নিদ্রা ও মত্ততার জড়তা আগেই কেটে এসেছিল, এবার আরক্ত চক্ষুর দৃষ্টিও প্রখর হয়ে উঠল। কঠিন ও সন্দিগ্ধ। কোথাও কোন বিপদ আশঙ্কা করলে মানুষের দৃষ্টি যেমন সতর্ক ও সচেতন হয়, তেমনিই।

'আচ্ছা! এই পথ ধরেছ!···তুমি তো ওদের বন্ধু, তোমাকে ওরা মানে-গনে দেখলাম। তোমার মুখে এসব কথা বড় অশোভন আর হাস্যকর নয়? ···কোন্ ফাঁদে ফেলতে চাও বল তো? কোন্ জালে জড়াতে চাও? আর আমার মতো নগণ্য প্রাণীকে নষ্ট করার জন্য এত আয়োজন করার আছেই বা কি?···একটা ক্ষুদ্র কীটের মতো পায়ের তলায় পিষ্ট করলেই তো হয়।

আমারই তো অস্ত্র আছে, এনে স্বচ্ছন্দে বধ করো—তোমার ঐ কোষবদ্ধ খড়্গ বার করতে যদি ইচ্ছা না হয়।…সত্যিই বলছি, বাঁচবার এতটুকু সাধ নেই আমার।'

'তুমি মিথ্যা বলছ কীলক। অসত্যভাষণ করছ। এখনও তোমার জীবনে একটা উদ্দেশ্য আছে, পাণ্ডবদের সর্বনাশ দেখা। তাদের অনুতাপের পরিতাপের—অশান্তির আগুনে দগ্ধ হতে দেখলে তোমার অশান্তির, দুঃখের অবসান হবে, চিত্তদাহ প্রশমিত হবে—তাই না ?…শোন কীলক, আমার কথা তুমি বুঝবে না। আমাদের দুজনেরই উদ্দেশ্য অনেকটা এক, কারণ ভিন্ন। ওরা আমার বন্ধু ঠিকই, আত্মীয়ও। তবু ওদের অনিষ্ট চিন্তা করতে হচ্ছে। তোমার অভিসম্পাত ঐ নবগঠিত মহানগরীর মহাশ্মশানে ওরা রাজত্ব করবে, আমারও ইচ্ছা তাই।…কী করব, আমি নিরুপায়। আরও বহু লোকের দুঃখ দূর করতে এ দুঃখ ওদের পেতে হবে।'

তবু কীলকের সন্দেহ দূর হয় না। তীব্র ভ্রূকুটি ক'রে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে বাসুদেবের দিকে, রহস্যটা বোঝার চেষ্টা করে।

বাসুদেব ওর মনোভাব বোঝেন, আরও কাছে আসেন ওর।

একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়ে ওর বাহুমূলে একটা হাত রেখে বলেন, 'কীলক, আমার চোখের দিকে দেখ দেখি। এখনও কি তোমার মনে হচ্ছে আমি তোমাকে প্রতারিত করতে এসেছি, মিথ্যা বলে বিপদে ফেলতে চাইছি ?'

কীলক সে কোমল মধুর স্পর্শে কেমন যেন বিহ্বল অভিভূত হয়ে পড়ল। চোখ তুলে ওঁর চোখে দৃষ্টি রাখতে চাইল, পারল না। তার সমস্ত দেহ কাঁপছে ; মনে হচ্ছে সমস্ত দেহে, রক্তধারায় কিসের একটা বিপুল আনন্দানুভূতির তরঙ্গ জেগেছে, তাতেই শরীর টলছে।

'না, না।' অতি কষ্টে উচ্চারণ করল সে, কাতর অনুনয়ের ভঙ্গীতে বলল, 'তা মনে হচ্ছে না। তোমাকে বিশ্বাস করেছি, করছি। কিন্তু এ আমার কী হ'ল! মনে হচ্ছে জন্মের মতো তোমার দাস হয়ে গেলাম, তোমার আদেশ পালন না ক'রে আর কোন উপায় থাকবে না।'

'কীলক, তোমাকে আমি সত্যিই আমার সেবক করে নিলাম। দৈবকার্য সাধনে, মানুষের কল্যাণের কাজে নিয়োগ করলাম তোমাকে আজ থেকে।'

তখনও হাতটা কীলকের বাহুতে। সেই অলৌকিক স্পর্শের অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা ও অনির্বচনীয় মাধুর্যে প্রায় হতচেতন কীলক অস্ফুট কণ্ঠে বলে, 'বলো কি করব! কি করতে হবে!'

'মন দিয়ে শোন। মথুরার উপকণ্ঠে আর্য ও অনার্যদের সংমিশ্রণে যে বর্ণসংকর জাতি গড়ে উঠেছে—আদিবাসী এই সম্পর্কে যাদের জ্যেষ্ঠ বা জেঠ বলে—দস্যুতাই তাদের প্রধান বৃত্তি। কিন্তু প্রবল প্রতাপ কুরুরাজদের ত্রাসে তারা এদিকে আসতে সাহস করে না। তুমি মাংস বিক্রয়ের উপলক্ষে তাদের পল্লীতে যাও, কথার ছলে তাদের জানিয়ে এস, কুরুরাজধানীর দক্ষিণে নতুন যে নগরী গড়ে উঠেছে এখানে, পাণ্ডবদের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ, সেখানের ব্রাহ্মণপল্লী পাণ্ডবদের মুক্তহস্তের দানে ও দক্ষিণায় রীতিমত ঐশ্বর্যস্ফীত হয়ে উঠেছে, ব্রাহ্মণদের বিত্তের সীমা নেই। কেউ যদি তাদের গৃহ লুণ্ঠন করে তাহলে রাজপ্রাসাদ লুণ্ঠনের থেকে বেশী লাভবান হবে। তাদের ভয় নেই, ব্রাহ্মণপল্লীতে কোন প্রহরার ব্যবস্থা নেই, ওঁরা শাস্ত্রজীবী নিরীহ ব্রাহ্মণ বলে নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে থাকে। ওঁদের নিজেদেরও কোন অস্ত্রাদি নেই।···দ্যাখ, পারবে তাদের প্ররোচিত করতে?'

কীলক বলল, 'পারব। তোমার এ বিচিত্র আদেশের রহস্য কিছুই বুঝলাম না। তবে যা বলেছ তা করব।'

সে এই প্রথম তাঁকে প্রণাম ক'রে তখনই দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে যাত্রা করল।

আবারও একটু হাসলেন বাসুদেব।

তবে তিনিও আর সেখানে দাঁড়ালেন না, বরং স্বভাববিরুদ্ধ দ্রুতগতিতেই প্রত্যাবর্তনের পথ ধরলেন।

তিনি জানতেন প্রভাতে ওঁর পুরীতে এসে ওঁকে দেখতে না পেয়ে অর্জুন বিষম ব্যস্ত হয়ে পড়বেন—বিশেষ যদি শোনেন, উনি নিরস্ত্র একাকী এই গহন অরণ্যে প্রবেশ করেছেন। আর সেক্ষেত্রে সর্বাগ্রে ছুটে আসবেন ওঁর সন্ধানে।

তা আসুন, তবে কীলকের সঙ্গে ওঁর সাক্ষাৎ হওয়ার সংবাদটা তাঁর জানার আবশ্যক নেই। সেই জন্যই এত ত্বরা ওঁর।···

অর্জুন সম্বন্ধে ওঁর অনুমান যে অভ্রান্ত—অল্পদূর অগ্রসর হতেই তা প্রমাণিত হ'ল। দেখা গেল, সত্যই বিভ্রান্ত ভাবে শুষ্ক মলিন মুখে ব্যস্ত হয়ে এই দিকেই আসছেন ধনঞ্জয়।

কেশবকে দেখে তিনি উদ্বিগ্ন ও ঈষৎ অভিমানক্ষুণ্ন কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'আমি হয়ত অজ্ঞানে বা অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত কোন অপরাধ করে ফেলেছি, সেজন্য এই গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা করলেন? আমার উপর বিরক্ত হয়ে থাকলে আমাকেই শাস্তি দেবেন, এমন ক'রে নিজের জীবন বিপন্ন করবেন না।'

শ্রীকৃষ্ণ একেবারে ওঁকে আলিঙ্গনাবদ্ধ ক'রে বললেন, 'বন্ধু, নানা কারণে—

প্রধানটা অবশ্য জানি, নবীন প্রণয়—তোমার মানসিক স্থৈর্য নষ্ট হয়েছে, তা নইলে যা করো নি সেই কল্পিত অপরাধের কথাও ভাবতে না, আমার বিরক্তিও কল্পনা করতে না। আর নিতান্তই মোহগ্রস্ত না হলে তোমার ওপর অভিমান ক'রে আমি জীবন বিপন্ন করতে এসেছি—এ কথা চিন্তা করতে পারতে না। অভিমানবশে এমন কর্ম করে স্ত্রীলোকে ও বালকে।...আর করে উন্মাদে। চল চল, এখনও প্রাভাতিক জলযোগ হয় নি, ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছি। সদ্যোত্থিত নবনীত ও প্রচুর দুগ্ধপিণ্ডক ছাড়া এ ক্ষুধা নিবৃত্ত হবে না।'

অর্জুন একত্র চলতে চলতে গাঢ় কণ্ঠে বালকের মতোই বলে উঠলেন, 'আমার—আমার খুব ভয় হয়েছিল, মনে হচ্ছিল আপনি বোধ হয় আমাদের ত্যাগ করলেন। কত কী যে আশঙ্কা হচ্ছিল কী বলব!'

'তোমার ভাবে ভঙ্গীতে বাক্যে আমার কি মনে হচ্ছে জানো?'

বিস্মিত অর্জুন প্রশ্ন করলেন, 'কি?'

'তোমার আরও অনেকগুলি নববধূর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সেই চেষ্টাই করব এখন।'

॥ ১০ ॥

এতগুলি ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণের মিলিত বাক্যের কোলাহল থেকে তাঁদের বক্তব্য বোধগম্য হতে কিছু সময় লাগল। নিদারুণ উত্তেজিত তাঁরা, বিপন্ন যে তাতেও সন্দেহ নেই। কেউ যজ্ঞ করতে করতে উঠে এসেছেন, কেউ বা পূজা-বন্দনাদি সেরে আহারে বসেছিলেন, কেউ বা গৃহদেবতা কি ইষ্টকে ভোগ নিবেদন করছিলেন, তার চিহ্ন এখনও বহন করছেন সবাই। যাঁরা ভোজনে বসেছিলেন, অনেকে আচমন করবারও সময় পান নি, সেই অশুচি অবস্থাতেই এসেছেন—ব্রাহ্মণদের পক্ষে যা মহাপাপ।

অর্জুন বহু চেষ্টা করলেন তাঁদের বোঝাতে, যাতে একজন মাত্র স্থিরভাবে তাঁদের বক্তব্য বলতে পারেন, বাকী সকলে নীরব থাকেন, এভাবে সকলে একসঙ্গে বলতে গেলে ত্বরার থেকে বিলম্বই ঘটবে বেশী—কিন্তু সে যুক্তি তাঁদের উত্তপ্ত মস্তিষ্কে, এবং দূরে যাঁরা ছিলেন কোলাহল ভেদ ক'রে তাঁদের কর্ণে পৌঁছল না।

অতি কষ্টে, তাঁরা নিজেদের উত্তেজনার প্রতিক্রিয়ায় ও উচ্চরবের পরিশ্রমে শ্রান্ত হবার ফলে কিছুটা স্থির হতে অর্জুন যে বার্তাটি উদ্ধার করলেন তা হ'ল

এই : আজ এই দিবাভাগের প্রথমাংশেই একদল জ্যেঠ দস্যু এসে তাঁদের শস্য ও গোধন হরণ ক'রে নিয়ে গেছে। তাঁরা নিরীহ শাস্ত্রজীবী ব্রাহ্মণ, শস্ত্রজীবী দস্যুদের বাধা দেবার মতো সামর্থ্য বা অস্ত্র তাঁদের নেই, বাধা দিতে পারেনও নি, ফলে সেই শর্মরীক দস্যুরা অবাধে লুণ্ঠন-কার্য চালিয়ে যাচ্ছে, হয়ত এখনও চালাচ্ছে ; হয়ত অতঃপর স্ত্রীলোকদের ওপরও অত্যাচার শুরু হবে, কারণ যদিচ নগরের অন্যান্য পল্লী সুদূর নয়, দস্যুদের পৈশাচিক উল্লাসধ্বনি এবং তাঁদের স্ত্রী-সন্তানদের আর্তনাদ সে সব স্থানে না পৌছনোরও কথা নয়—তথাপি এখনও কোন প্রহরী বা সৈন্যদল ছুটে আসে নি, কোন ক্ষত্রিয় অধিবাসীও অস্ত্রাদি নিয়ে আত্মরক্ষায় ছুটে আসার প্রয়োজন বোধ করেন নি।

অতঃপর তাঁরা—সংবাদ শেষ হতে—পুনশ্চ রাজা বা রাজশক্তিকে ধিক্কার দিতে লাগলেন। উৎপন্ন দ্রব্যের ষষ্ঠাংশ তাঁরা কর হিসাবে রাজাকে দিচ্ছেন —ব্রাহ্মণ বলে অব্যাহতি পান নি—সে তো রাজা তাঁদের সর্বদা সর্বতোভাবে রক্ষা করবেন এই অঙ্গীকারে। কেবলমাত্র হর্ম্যাদি নির্মাণ, পয়ঃনিঃসারণ ব্যবস্থা করলেই নাগরিকগণের স্বাচ্ছন্দ্যের চূড়ান্ত হয় না। নিরাপত্তার জন্যই লোকে রাজধানীতে এসে বাস করে। এ রাজধানীর মূল্য কি ? এখানে বাস করা অপেক্ষা অরণ্যে বাস করাও তো শ্রেয়, সাবধানে থাকলেই নিরাপদে থাকা যায়। সেখানে শ্বাপদ-ভয় আছে, দস্যুভয় নেই।

অর্জুন নিজের বক্তব্য শোনাতে না পেরে ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। এখন গত্যন্তর না দেখে কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে চড়াতে বাধ্য হলেন। একটু রূঢ় ও পরুষ শোনালেও—অথবা শোনাল বলেই—ব্রাহ্মণরা পরস্পরকে অপেক্ষাকৃত অনুত্তেজিত কণ্ঠে—'শোন শোন, ধর্মাত্মা বীর্যবান তৃতীয় পাণ্ডব কি বলতে চান মন দিয়ে শোন' বলে পরস্পরকে প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

অর্জুন বললেন, 'ব্রাহ্মণগণ, আপনারা অকারণে এত উত্তেজিত হবেন না। আমাদের ধারণা ছিল যে এ নগরে দস্যুরা প্রবেশ করতেই সাহস করবে না, সেই জন্যই পর্যাপ্ত প্রহরার ব্যবস্থা ছিল না। এখন দেখছি সে ধারণা ভ্রান্ত। সেজন্য কৃতাপরাধের মতোই মার্জনা ভিক্ষা করছি। আপনারা শান্ত হোন, যে পরিমাণ শস্যসম্পদ ধনাদি ও গোধন অপহৃত হয়েছে বলছেন আপনারা—তাতে তাদের লুণ্ঠনকার্য শেষ হলেও অধিক দূর যেতে পারবে না নিশ্চয়। আপনারা মাত্র দুই দণ্ড সময় দিন, তারা যত দূরেই যাক, তাদের বিমর্দিত বিনষ্ট ক'রে আপনাদের সম্পদ আপনাদের প্রত্যর্পণ করব। এ ছাড়াও রাজভাণ্ডার থেকে অবশ্যই আপনাদের ক্ষতিপূরণ করা হবে। আপনারা নিশ্চিন্ত হয়ে গৃহে ফিরে

যান, লুণ্ঠন ছাড়া যদি অপর কোন গর্হিত অত্যাচার ক'রে থাকে দুর্বৃত্তরা —তো জেনে রাখুন, অপরাধের তুলনায় চতুর্গুণ শাস্তি পেতে হবে তাদের, পাতালে প্রবেশ করলেও তারা অব্যাহতি পাবে না।'

তৃতীয় পাণ্ডবের শৌর্য ও আশ্চর্য শস্ত্রশিক্ষার কথা ইতিমধ্যেই প্রবাদে পরিণত হয়েছে প্রায় ; ব্রাহ্মণরা আশ্বস্ত হয়ে এবার আনন্দ-কোলাহল করতে করতে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন।

কিন্তু আশ্বাসদানকারী পড়লেন মহা বিপদে।

তিনি যখন এদের কাছে এই কুঘটন প্রতিকারের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন, তখন ব্রাহ্মণদের বিপদ ও নিজেদের অমর্যাদা ছাড়া অন্য চিন্তা ছিল না। সময়ের হিসাব করতে শুধু রথে অশ্বযোজনা ও এই ক্রোশেক পথ অতিক্রমের কথাই ভেবেছিলেন। কিন্তু অস্ত্র ? সেখানে যে এক বিপুল জটিলতা বেধে বসে আছে!

বাসুদেবই পরামর্শ দিয়েছিলেন, কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের উচিত নিজ নিজ নবনির্মিত পুরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও রাজাকে মধ্যে মধ্যে আমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে আসা। তাতে সৌহার্দ্য ও সৌভ্রাত্র বৃদ্ধি পায়। অবশ্য রাজাও কনিষ্ঠদের নিমন্ত্রণ করবেন বৈকি। শুদ্ধমাত্র রাজসভা বা মন্ত্রণাসভাতেই ভাইদের পরস্পরের সঙ্গে দেখা হয়—এ ব্যবস্থা আদৌ অভিপ্রেত নয়— ওতে মানসিক দূরত্ব বা ব্যবধান বৃদ্ধি পায়।

ধনঞ্জয় সে কথার উত্তরে একটা বিশেষ নিয়মের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। স্বেচ্ছাপ্রণীত স্বেচ্ছারোপিত নিয়ম।

যখন পাঁচ ভাই একই দার পরিগ্রহণ করবেন স্থির হ'ল—তখন মহর্ষি নারদ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এসে ওঁদের সতর্ক করে দিয়ে যান যে, 'কেবলমাত্র স্ত্রীলোককে উপলক্ষ ক'রেই বহু সখ্য ও সৌভ্রাত্র নষ্ট হয়েছে ; ভ্রাতার হাতে ভ্রাতা নিহত হয়েছে, প্রাণাধিক সখা পরস্পাপি পর হয়ে গেছে। তোমরা যদি পূর্বেই এ বিষয়ে কতকগুলি কঠোর নিয়ম না ক'রে নাও, এবং ধর্মপালনের মতো ক'রে তা পালন না করো, তাহলে এ বিপদ তোমরাও এড়াতে পারবে কিনা সন্দেহ। হ্যাঁ, বিপদ শব্দ ব্যবহার করেছি ইচ্ছে ক'রেই। সুন্দরী নারীরত্ন লাভ পরম সৌভাগ্যের কথা সন্দেহ নেই—কিন্তু অনেক সময়ই তা চরম সর্বনাশেরও কারণ হয়ে ওঠে।'

সেই উপদেশ অনুসারেই ওঁরা কটি নিয়ম করেছিলেন। সুচিন্তিত, সুবিবেচিত। তার মধ্যে একটি হ'ল পট্টমহাদেবী কল্যাণী দ্রৌপদী যখন কোন

এক স্বামীর সঙ্গে কোন গৃহে বাস করবেন—তখন অপর স্বামীরা কদাচ সে গৃহে প্রবেশ করবেন না, বা অন্তরঙ্গ অবসরে উভয়কে একত্র দেখবেন না। কেউ যদি এ নিয়ম লঙ্ঘন করেন তবে তাঁকে ব্রহ্মচর্য গ্রহণ ক'রে দ্বাদশ বর্ষের জন্য নির্বাসন বরণ করতে হবে।

এ নিয়মে এতকাল কোন অসুবিধা হয় নি। এখন এক বিচিত্র কারণ দেখা দিয়েছে অসুবিধার।

মাত্র এক পক্ষ কাল পূর্বে ধনঞ্জয় ফাল্গুনীর সনির্বন্ধ অনুরোধ ও অনুনয়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর আবাসে আগমন করেছেন এবং শ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম হিসাবে—যে গৃহে অর্জুনের আয়ুধাদি থাকে সেই গৃহই তাঁদের বাসস্থানের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। পূর্বে সংবাদ দিয়ে অনুমতি সংগ্রহ ক'রে সে গৃহে যেতে কোন বাধা নেই; আয়ুষ্মতী দ্রৌপদী সে সময় অন্তরালে যেতে পারেন বা অবগুণ্ঠনবতী হতে পারেন—আর যুধিষ্ঠিরও কিছু সব সময় ঘরেই আবদ্ধ থাকেন না—সুতরাং এ ব্যবস্থায় যে কোন অসুবিধা হতে পারে তা মনে হয় নি।

তবু কে জানে কেন একটা অজ্ঞাত ও দুর্বোধ্য অমঙ্গলাশঙ্কা নিয়েই অর্জুন তাঁর আবাসের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। দেখলেন, তাঁর গৃহসেবক-সেবিকারা কেউ নেই, সম্ভবত তারা নিকটবর্তী সরোবরে স্নান বা বস্ত্রাদি প্রক্ষালনে গেছে। তাদের দোষও দেওয়া যায় না। ওঁদের মধ্যাহ্নভোজন শেষ হয়েছে, এখন তারা নিশ্চিন্ত। তাদের এটা অবসর কালও।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এমন কি মহিষীপ্রধানা দ্রৌপদীরও আহার শেষ হয়েছে নিশ্চয়,—নইলে পাচক ও ভৃত্যরা অন্যত্র যেত না—এখন তাঁরা বিশ্রম্ভালাপ করছেন।

এ সময় সে গৃহে প্রবেশ করার একটিই পরিণাম। নির্বাসন।

অথচ অবসরও আর নেই। ব্রাহ্মণদের কাছে তিনি বাক্যদত্ত, দুই দণ্ডকাল মধ্যে এই পাপাচরণের প্রতিকার করবেন, দুঃসাহসিক দস্যুদলের স্পর্ধার সমুচিত প্রত্যুত্তর দেবেন—অমার্জনীয় ধৃষ্টতার শাস্তিবিধান করবেন।

ব্রাহ্মণদের অবহেলা করলে অভিসম্পাতের ভয় আছে। তিনি আশ্বাসদানে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করলে সে সর্বনাশ ঘটত। ব্রহ্মশাপে সবংশে নিহত হওয়া, সেই সঙ্গে রাজলক্ষ্মীভ্রষ্ট হওয়ার থেকে তাঁর একার দুঃসহ ক্লেশস্বীকারও অনেক বেশী বাঞ্ছনীয়। বংশকে রক্ষা করতে, ভ্রাতাদের নিরাপদ সুখে রাখতে বনবাসে যেতেও কোন দুঃখ নেই।

তিনি আর দ্বিধা করলেন না। বারেক দ্বারে করাঘাত করেই গৃহাভ্যন্তরে

প্রবেশ করলেন। দ্রৌপদী এখন তাঁর পূজনীয়া। হয়ত বা সেই ঈষৎ অসম্বৃতবাসা অগ্রজপত্নীকে অবলোকন অনুচিত—এ বোধ এবং সর্ববিধ সতর্কতা সত্ত্বেও দৃষ্টি সেদিকেই আগে গিয়ে পড়ল। দেখলেন তাঁর আনুমানই ঠিক। দ্রৌপদী তখন বসে স্বামীর পদসেবা করলেও তাঁর বেশবাস শয়নোপযোগী শিথিলিত।

দ্রৌপদী বিস্মিত হলেও বিহ্বল হলেন না, দ্রুত অবগুণ্ঠন টেনে দিলেন মাথায়। কিন্তু সেই অত্যল্প—প্রায় নিমেষকাল মধ্যেই অর্জুন লক্ষ্য করলেন, শুধু লজ্জা নয়—আকস্মিক প্রিয়দর্শন-সুখের অনির্বচনীয় বার্তাও তাঁর নবারুণ-রক্ত মুখে ফুটে উঠল।

নিয়ম রীতি ন্যায়—এসব পালন করে দেহ, বিচারবুদ্ধি, সংস্কার—হৃদয় ও অনুভূতি এসব বন্ধনের অতীত, স্বাধীন।

তখন আর বিলম্বের অবসর নেই, মাত্র কয়েকটি বাক্যে এই নির্লজ্জ আগমনের প্রয়োজন জানিয়ে ধনঞ্জয় তাঁর অস্ত্রাদি নিয়ে চলে গেলেন। দ্রৌপদীর দিকে অবশ্যই আর তাকালেন না, কিন্তু কেমন যেন মনে হতে লাগল—এক নীলোৎপল-পলাশ-যুগলাক্ষির দৃষ্টি পট্টবস্ত্রের অবগুণ্ঠন ভেদ ক'রেও তাঁর অনুসরণ করছে।

অর্জুনের পক্ষে দস্যুদের পশ্চাদ্ধাবন ক'রে তাদের বিমর্দিত ও ব্রহ্মস্ব উদ্ধার করা কয়েক দণ্ডের কাজ। তার জন্য কোন চিন্তাও ছিল না। অভিযানের পরিণাম তো তাঁর জানাই। অবশ্যম্ভাবী। তিনি কার্মুক ধারণ করলে কয়েকজন কেন সহস্র দস্যুরও পরিত্রাণ নেই।

চিন্তা অন্যত্র, অন্য কারণে।

চিন্তিত ও বিমর্ষমুখেই আবাসে প্রত্যাবর্তন করলেন ফাল্গুনী।

যে প্রিয়া-সান্নিধ্যচ্যুত হবার আশঙ্কায় তিনি শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ অগ্রাহ্য করেছিলেন, সেই সান্নিধ্যই হারাতে হবে। আরও দীর্ঘকালের জন্য। মানব-জীবনে দ্বাদশ বৎসর সময় হয়ত অকিঞ্চিৎকর কিন্তু যৌবনকালে, বিশেষ নববিবাহিতের বিরহদশায়—তা সুদীর্ঘকাল।

চিন্তাক্লিষ্ট ধর্মরাজও।

যুধিষ্ঠির কোন সময়েই বিচলিত হন না। সম্প্রতি তাঁর প্রজারা যে তাঁকে ধর্মরাজ বলে অভিহিত করছে—তা একেবারে অকারণ নয়। ধর্মের মতোই অবিচল, স্থির। ধর্মের গতির মতোই ধীর। তবু, আজ তাঁর মুখের প্রশান্তিও যেন নষ্ট হয়েছে, ঈষৎ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে তাঁকে ; বার বার নিজের করতল

নিরীক্ষণ করছেন, যেন আসন্ন কোন অমঙ্গলের বার্তা অন্বেষণ করছেন সেখানে।

পট্টমহাদেবী দ্রৌপদীও স্থির হতে পারছেন না; বিনা প্রয়োজনেই প্রাসাদের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, গৃহসজ্জার বিন্যাস নষ্ট ক'রে পুনশ্চ তা নূতন ভাবে সজ্জিত করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু নানা অসম্বদ্ধ চিন্তা ও অন্যমনস্কতাহেতু বিশৃঙ্খলাই বাড়ছে—মনোমতো ভাবে সুসজ্জিত করা যাচ্ছে না।

বিজয়ী বীরের প্রত্যাবর্তন-সংবাদ রথচক্র ও অশ্বক্ষুরের শব্দেই পাওয়া গিয়েছিল, সেই সঙ্গে গৃহভৃত্য, সেবক ও প্রজাগণের হর্ষোৎফুল্ল জয়ধ্বনিতে। তবু, যুধিষ্ঠির অন্য দিনের মতো স্নেহবশত উঠে প্রত্যুৎগমনের চেষ্টা করলেন না, বরং অধোবদন অর্জুন এসে পাদবন্দনা করার সময়—প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও যেন বিবর্ণ হয়ে উঠলেন। মুখশ্রী পাণ্ডুরবর্ণ ধারণ করল। অস্ফুট স্বরে আশীর্বাদ বাক্য উচ্চারণ করলেন মাত্র, কার্যোদ্ধার হ'ল কিনা, ভ্রাতা অক্ষতদেহে নিরাপদেই ফিরে আসতে পেরেছেন কিনা এ প্রশ্নও করতে পারলেন না।

কিন্তু অর্জুন বৃথা কালহরণ ক'রে—যে দুঃখ নিশ্চিত তাকে দীর্ঘায়ত করতে চাইলেন না। দ্বিধা বা অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকার অর্থ হয়, যদি সামান্য মাত্র আশার সম্ভাবনা থাকে।

তিনি নিজেই দস্যুবিনাশ ও ব্রাহ্মণদের সম্পদাদি পুনরুদ্ধারের সংবাদ দিয়ে—কয়েক নিমেষকাল অপেক্ষা করে করজোড়ে নিবেদন করলেন, 'এবার মহারাজের আদেশ পেলেই নির্বাসন-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে পারি।'

সকল বিপদ ও বিপর্যয়ের মুখেও যিনি অনুদ্বিগ্ন থাকেন—সেই বিজ্ঞতম যুধিষ্ঠিরও ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

এই সংকট কালেরই অপেক্ষা করছিলেন এতক্ষণ, অনিবার্য জেনেও এই আশঙ্কাতেই কণ্টকিত ছিলেন।

তিনি বলে উঠলেন, 'না না, এ কি বলছ! তোমার কিছুমাত্র অপরাধ হয় নি। আমি কিছু মনে করি নি। আপৎকালে সব নিয়মেরই ব্যতিক্রম ঘটে। প্রজার সমূহ বিপদ, ব্রহ্মশাপে সর্ববিনষ্টির সম্ভাবনা—এর চেয়ে আপৎকাল আর কি আসতে পারে? না না, তোমাকে কোথাও যেতে হবে না। বিশেষ রাজ্যের চারিদিকে শত্রু, বিদ্বেষের মেঘ এ রাজ্যের সর্বদিগন্ত আচ্ছন্ন ক'রে আছে—এখন তুমি অনুপস্থিত থাকলে প্রভূত বিপদ।'

অর্জুন সেইভাবে করজোড়েই—বিনত কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'মহারাজ, আমার যা কিছু শিক্ষা, ধর্মাচরণ সম্বন্ধে যা কিছু জ্ঞান ও ধারণা, তা সবই

আপনার প্রসাদে লাভ করেছি, আপনার চরণপ্রান্তে বসেই জীবনগঠনের পথ দেখতে পেয়েছি। আপনার কাছেই শুনেছি—বিবেকের সঙ্গে ছলনা করা যায় না, মিথ্যার সঙ্গে আপোস করা চলে না। সত্যের একটিই মাত্র পথ—ধর্ম ও অধর্মের মধ্যে কোন মধ্যপন্থা নেই। আমরা যে নিয়ম করেছি তা যদি লঙ্ঘন করি—প্রজারা, আমাদের অপত্যগণ কেউ আর আমাদের উপদেশে কর্ণপাত করবে না। না মহারাজ, অন্যায় জেনেও স্নেহবশতঃ তাকে প্রশ্রয় দেওয়া—এ দৌর্বল্য আপনাকে শোভা পায় না। আপনি অনুমতি দিন, দ্বাদশবর্ষকাল দেখতে দেখতে কেটে যাবে। এখানে রণদুর্মর মহাবীর ভীমসেন রইলেন, পাণ্ডব-সিংহাসনের কোন শত্রু তাঁর সম্মুখীন হতে সাহস করবে না।'

যুধিষ্ঠিরের চিত্তস্থৈর্য তবুও প্রত্যাবৃত্ত হ'ল না। তিনি অধিকতর অস্থির ও ব্যাকুল হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে অবিলম্বে এই প্রাসাদে আসার জন্য সংবাদ পাঠালেন। গত কয়েক বৎসরে বিপদে-সম্পদে সর্ব বিষয়ে তাঁর উপর নির্ভর করতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন, কোন কারণে মনস্থির করতে না পারলেই শ্রীকৃষ্ণের উপর সে বিচারের ভারটা ছেড়ে দেন। সেই জন্যই তাঁর দ্বারকা প্রত্যাবর্তনের প্রসঙ্গ উঠলেই নানা কারণ উপস্থাপিত ক'রে সেটা বিলম্বিত করার চেষ্টা করেন।···

কিন্তু গ্রহ বিরূপ, আজ শ্রীকৃষ্ণও ধর্মরাজকে নিরাশ করলেন।

সহজ প্রশান্ত মুখেই যুধিষ্ঠিরের বক্তব্য শুনলেন—সেই দুর্বোধ্য মধুর হাসিমুখে—তার পর, অল্প কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থেকে উত্তর দিলেন, 'ধর্মরাজ, আপনাকে এ বিষয়ে উপদেশ বা পরামর্শ দেওয়া আমার ধৃষ্টতা। অতিরিক্ত স্নেহে বিহ্বল হয়ে পড়েছেন বলেই আপনার প্রজ্ঞাদৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়েছে, না হলে এ প্রশ্নই আপনার মনে দেখা দিত না। যদি সত্যভ্রষ্ট হওয়া অনভিপ্রেত হয় তাহলে অর্জুনের নির্বাসনে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। এ স্বেচ্ছা-আরোপিত নিয়ম—লঙ্ঘন করলে নিজেদের কাছেই চিরদিন লজ্জিত থাকতে হবে। না মহারাজ, অর্জুনের আর এক রাত্রিও রাজধানীতে বাস করা উচিত হবে না। আজ প্রদোষ আসন্ন হওয়ার পূর্বেই তার কর্তব্য গৃহ এবং এই নগর ত্যাগ করা।'

যুধিষ্ঠির ললাটে করাঘাত করলেন শুধু।

প্রাণ ধরে 'যাও' এ শব্দ উচ্চারণ করতে পারবেন না তিনি—এ তো জানা কথাই। দীর্ঘদিনের সঙ্গী তাঁরা—সম্পদে বিপদে, দুঃখে আনন্দে, উৎসবে দৈন্যদশায় চিরদিন একত্র থেকেছেন, ভীম অর্জুন দুজনই প্রধান সহায়—কিন্তু অর্জুনের ওপরই বেশী আস্থা, বেশী নির্ভরতা তাঁর। সেই অর্জুন দীর্ঘদিনের জন্য অজ্ঞাত পথে যাত্রা করবেন—অসহায় বোধ হয় বৈকি।

অর্জুনও আর মৌখিক সম্মতির অপেক্ষা করলেন না। নিজের অন্তঃপুরে গিয়ে অপরা স্ত্রীকে সংবাদ দিয়ে অস্ত্র ও অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি গুছিয়ে দিতে বললেন। তারই বা কি মুখের অবস্থা হ'ল—তাও লক্ষ্য করার চেষ্টা করলেন না।

দেখতে দেখতে এ সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

ভাইয়েরা সকলেই প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টা করলেন, ভীম তো রীতিমতো উত্তেজিত ও নৈর্ব্যক্তিক ভাবে ক্রুদ্ধ—পুরবাসী বিশেষ ব্রাহ্মণরা যখন শুনলেন তাঁদের জন্যেই এই অবস্থা ধনঞ্জয়ের—সকলে বললেন, তাঁরাও অর্জুনের এই অনির্দেশ্য যাত্রার সঙ্গী হবেন। পাণ্ডবগণ, অর্জুন এমন কি পরম বুদ্ধিমান বাক্‌কৌশলী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরও বিবিধ প্রবোধ বাক্য ও আশ্বাস দিয়ে শান্ত করতে বিস্তর সময় লাগল। সকলে নিবৃত্ত হলেনও না। বহু দূর এবং বহুদিন পর্যন্ত তাঁর অনুগমন করলেন।

বহুদূর পর্যন্ত এলেন শ্রীকৃষ্ণও।

দ্বিতীয় দিন সূর্যাস্তকালে এক নির্ঝরিণীতীরে স্কন্ধাবার স্থাপন ক'রে অর্জুন যখন করজোড়ে প্রত্যাবর্তনের অনুরোধ জানালেন—তখন অন্ধকার রজনীর অজুহাতে সে রাত্রিটা সেই বস্ত্রাবাসেই অতিবাহিত করলেন তিনি। তার পরদিন প্রত্যূষে—এই সমস্ত সময় সমস্ত পথ অর্জুনের অনুসঙ্গী হওয়া সম্ভব নয়, মিছামিছি আরও কিছুদূর পর্যন্ত যাওয়া অনর্থক জেনেই—বিদায় নিলেন। যাবার সময় শুধু বললেন, 'এ একরকম ভালই হ'ল তোমার। তুমি স্বেচ্ছায় দীর্ঘকালের জন্য কৃষ্ণাকে এখানে রেখে কোথাও যেতে পারতে না—বাধ্য হয়ে যা করতে হয়—ইচ্ছাপূর্বক তা করা কঠিন।' বলতে বলতে তাঁর নয়নপ্রান্তে যে ঈষৎ কৌতুক নৃত্য করে উঠল তা দেখে অর্জুন আরক্তমুখে মাথা নত করলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলেই চললেন, 'আশা করি তুমি এটাকে বিধিনির্দেশ মনে ক'রে এই অবসরে লাভবান হবে, দেশ ও দেশবাসী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানসঞ্চয় করবে।...আমি তোমাকে ভারতভূমি পরিক্রমা করতে বলেছিলুম, এখন তো বেশী সময় পেলে, তুমি সম্পূর্ণ ভারতখণ্ড পরিভ্রমণ করো। একটা কথা বলে দিই, এ দেশের অনার্য আদিবাসীদের অবহেলা করো না—স্মরণ রেখো, আমাদের সঙ্গে শিক্ষাদীক্ষা জীবনধারণার মিল না থাকলেও—তাদেরও এক ধরনের সভ্যতা আছে, আর সে সভ্যতা আরও প্রাচীন। এ দেশের জলহাওয়া

প্রকৃতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা তাঁদের অনেক বেশী। তাদের সঙ্গে মিশবে অবজ্ঞাভরে নয়—সশ্রদ্ধ চিত্তে। তাদের ঘর থেকে—যদি ভাল লাগে, কন্যা গ্রহণ করতেও দ্বিধা করো না। ব্রহ্মচর্য তোমার দ্রৌপদী সম্পর্কেই, এ নির্বাসন শুধু তাঁর কারণে ; কখনও কারও লালসা অত্যুগ্র হয়ে উঠে ভ্রাতৃবিরোধের বীজ না বপন করে তোমাদের সাংসারিক অনভিজ্ঞতার উর্বর ভূমিকে—এই আশঙ্কায়। তুমি রাজ্যসীমার ঠিক বাইরে কোন জনপদে বসবাস করলেও নিয়ম লঙ্ঘিত হ'ত না, কিন্তু তাতে ভ্রাতৃবিরোধের সম্ভাবনা থেকে যেত। তোমার মন অস্থির হ'ত। লোভের আকাঙ্ক্ষার বস্তু আয়ত্তসীমার মধ্যে থাকলে লালসা উগ্র হয়ে ওঠে। স্থতরাং দূরে যাওয়াই ভাল। তুমি দক্ষিণের দেশগুলি দেখে সমুদ্রতীরের পথ ধরে পূর্বে চলে যেও। তোমার পরিক্রমা শেষ হবে পশ্চিমে, দ্বাদশবর্ষে আমি তোমাকে দ্বারকায় আশা করব।…পূর্ব দেশ সম্বন্ধে একটু সচেতন থেকো। প্রাগজ্যোতিষপুরের ভগদত্ত শক্তিশালী লোক, কৌরবের বন্ধু, সে কারণে তোমাদের শত্রু। ঐ দেশের চারিদিকে যে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য আছে তাদের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করো, স্থবিধা বুঝলে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ো, ভবিষ্যতে সে আত্মীয়তা কাজে লাগতে পারে।…অর্জুন, সাধারণ মানুষের মতো ঐশ্বর্য বিলাসসামগ্রী ও ইন্দ্রিয়সম্ভোগ করার জন্য তোমাদের জন্ম হয় নি—বহু দৈব কর্তব্য পালন করতে হবে, সে কথাটা মনে রেখে সেই ভাবেই প্রস্তুত করো নিজেকে।'

অতঃপর অর্জুনকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ ও দুই গণ্ডে চুম্বন ক'রে শ্রীকৃষ্ণ বিদায় নিলেন।

॥ ১১ ॥

ক্রমে ক্রমে দ্রৌপদীর জন্য তৃষ্ণা ও তাঁর দর্শনাভাব-জনিত চিত্তক্ষোভ প্রশমিত হয়ে আসে বৈকি। সেই হোমাগ্নিসম্ভবা কন্যার স্থরলোকদুর্লভ লাবণ্য—অগ্নিশিখার মতোই প্রজ্বলিত রূপবহ্নিও স্মৃতিমাত্রে পর্যবসিত হয়। নূতন দেশ নূতন মানুষ—অপরিচিত অপরিজ্ঞাত পরিবেশ—মনে নূতন উৎসাহ আগ্রহের সৃষ্টি করে। নব নব বিস্ময়ে মাদকতার আস্বাদ পান। আরও দেখা আরও জানার জন্য ব্যগ্র, উৎস্থক হয়ে ওঠেন।

বাস্থদেবের উপদেশ ও নির্দেশের কথাও মনে পড়ে। ক্রমে তার মর্মও প্রতিভাত হয়। এদেশে এত বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ আছে তা পূর্বে কল্পনা

করাও সম্ভব ছিল না। তাদের সঙ্গে মিশে, তাদের শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মাচরণ ধর্মবিশ্বাস—তাদের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে পরিচিত হ'তে হ'তে অপরূপ অনুভূতি বোধ করেন একটা—যেন এক সুবিপুল অজ্ঞাত নূতন জগৎ তাঁর সম্মুখে অনাবরিত হচ্ছে।

এদের ধারণা কল্পনা থেকে শিক্ষা করারও অনেক কিছু আছে। দেশের কোনও লোক, সামান্যতম ইতরতম ব্যক্তিও অবজ্ঞেয় নয়—এ শিক্ষাও লাভ করেন তিনি। এ যেন ঈশ্বরের এক বিশ্বরূপ। তাঁর বিরাট শক্তি, বিপুল বিভূতি ও সীমাহীন মহিমারই বিচিত্র বিকাশ এরা।...এ দেশ প্রকৃত ভাবে শাসন করতে গেলে—বিশেষ এই বিভিন্ন বৃত্তির বিভিন্ন জীবনধারণার বহুবিচিত্র মনুসন্তানগুলির উপর সার্বভৌমত্ব, একচ্ছত্র-নৃপতিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গেলে আগে এদের জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়া, এদের চিন্তাধারার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করা প্রয়োজন—এই মহামূল্যবান শিক্ষাও লাভ হয় তাঁর। প্রতিদিন প্রতিনিয়তই তাই বাসুদেবের উপদেশ মনে পড়ে, তাঁর দূরদৃষ্টির মূল্য উপলব্ধি করেন।

আর সে মূল্য বোঝেন বলেই তা সামগ্রিক ভাবে পালন করার চেষ্টা করেন। এদেশের আদিম অনার্য অধিবাসীদেরও অবহেলা করেন না, তাদের সঙ্গে বন্ধুর মতো, সমকক্ষ ভাবেই মেশার চেষ্টা করেন—সর্বপ্রকার ঔদ্ধত্য বা গর্ববোধ বিসর্জন দিয়ে।

তাতে উপকৃতও হন। বিস্মিত হন বোধ করি তার চেয়েও বেশী। এদের অস্ত্রশস্ত্র, তার প্রয়োগপদ্ধতি যে এত অগ্রসর—এত নিপুণ ও অব্যর্থ, এত শক্তিশালী—সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না তাঁর। কোন কোন ক্ষেত্রে পরাজয়ের মূল্যেই সে অভিজ্ঞতা লাভ করতে হয়েছে তাঁকে। এই রকম দুটি-একটি ঘটনাতে অন্তরঙ্গতাও ঘটেছে—অর্থাৎ নারীসাহচর্য লাভ হয়েছে। আর সে সাহচর্যে তিনি প্রীত বা তুষ্ট হয়েছেন সে কথা বলাই বাহুল্য। বরং এটুকু বললে অল্পই বলা হয়। সে মিলনের স্মৃতি অন্তর-মধ্যে এক পুলকমাধুর্যে রূপান্তরিত হয়ে থাকবে চিরদিন। আর সে অন্তরঙ্গ পরিচয়ের ফলে এই সব অনার্য জোষিতাদের সম্বন্ধে যে বিস্ময় শ্রদ্ধা আহরণ ক'রে নিয়ে যাচ্ছেন সেও বড় সামান্য নয়।

বিশেষ ক'রে দুটি কন্যা ও তাদের দেশবাসীদের সম্বন্ধেই বিস্ময় শ্রদ্ধা সমধিক। তাদের কথা চিরদিন মনে থাকবে ওঁর। ভবিষ্যতে কোন প্রবল শত্রুর সম্মুখীন হলে এরা যে বৈরী বা উদাসীন হয়ে থাকবে না, এদের সঙ্গে যে

ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বন্ধন স্থাপন ক'রে এদের বান্ধব ও সহায় করতে পেরেছেন —এজন্ম তিনি ঈশ্বরকে ও গুরু-বন্ধু-উপদেষ্টা বাসুদেবকে শত শত ধন্যবাদ দেন।

এই কন্যা দুটির প্রথমা হলেন সুদূর পার্বত্য অঞ্চলবাসী নাগরাজ কৌরব্যের কন্যা উলূপী।

উলূপী কোন্ এক ব্রত উপলক্ষে গঙ্গাস্নানে এসেছিলেন। দৈবের যোগাযোগে ধনঞ্জয় ফাল্গুনীও সেইদিন সেখানে সমাগত। প্রভাতে স্নানের সময়—তিনি যথারীতি ইষ্টপ্রণামাদির পর গঙ্গাজল মাথায় দিয়ে জলে নেমেছেন। নয়নপ্রিয় শ্যামবর্ণের সেই যশস্বী-শিল্পীখোদিত সুনিপুণ ভাস্কর্যকর্মের মতো সুগঠিত অনিন্দ্য-সুন্দর অনাবৃত বলিষ্ঠ দেহের দিকে দৃষ্টি পড়ে পলকে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন উলূপী, চোখ ফেরাতে পারেন নি।

ফেরাবার প্রয়োজনও বোধ করেন নি অবশ্য। সরল পার্বতীরা এ ধরনের নাগরিক শালীনতাবোধে অভ্যস্ত নয়। মনোভাব গোপন করার কোন প্রয়োজন বোধ করে না তারা, বরং সেটাকে কৃত্রিমতা ও মিথ্যাচরণ বলেই জানে।

সুন্দরী রমণীর মুগ্ধদৃষ্টির পূজা বীর্যবান পুরুষকে চুম্বকের মতোই আকর্ষণ করে। সেই বিচিত্র অমোঘ নিয়মে অর্জুনের দৃষ্টিও আকৃষ্ট হয়েছিল।

মুগ্ধ হয়েছিলেন তিনিও।

দ্রৌপদীর মতো অলোকসাধারণ রূপসী ইনি নন ঠিকই। আর্যাবর্তের যে ধরনের গাত্রবর্ণ বা দেহসৌষ্ঠবের সঙ্গে তাঁরা পরিচিত—এ তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানের গৌরবর্ণ রক্তাভ, এখানে পীতাভ। তবু সুগৌর, উজ্জ্বল—তাতে সন্দেহ নেই। পর্বতরাজদুহিতা সুউচ্চ-নাসা নন। কিন্তু নাসার খর্বতা মুখের শ্রী ও সৌকুমার্যকে খর্ব করতে পারে নি। বরং অর্জুনের মনে হ'ল এই দিব্যরূপা শ্রীপ্রদীপ্তা মনোরমা সুকুমারী তন্বঙ্গীর সুকোমল দেহলতার সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম ভারতের খড়্গনাসা একান্তই বেমানান। কন্যার দেহগঠন পুষ্পবল্লরীর মতোই নমনীয়, বুঝি বা ভঙ্গুর। যেন নবনীতকোমল বিশেষণ এই কুমারী-কন্যাকে দেখেই রচিত হয়েছিল।

কিন্তু অর্জুন সুশিক্ষিত, মার্জিত-রুচিসম্পন্ন। ভব্যতা, শালীনতাবোধ, মনোভাব দমনের শিক্ষা তাঁদের মজ্জাগত। ক্ষত্রিয় রাজবংশের প্রাথমিক শিক্ষা এটা। তিনি সবলে নিজের দৃষ্টি ও চিত্তকে সংযত ক'রে স্নানান্তে ইষ্ট-আরাধনায় মন দিলেন। তাতে বিপরীত ফল হ'ল। উলূপী ইতিপূর্বে মহাবলবান পুরুষ-

দেহের গঠনসৌকুমার্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন—এবার সেই বীর পুরুষের মুখের ভক্তি-তন্ময়তা ও ইষ্ট-তদ্গতভাবে ধ্যানমগ্ন মুখের জ্যোতিতে বিহ্বল হয়ে উঠলেন (এসব পরবর্তীকালে উলূপীর মুখেই শোনা)।

অর্জুন পূজা স্তোত্রোচ্চারণ সমাপন ক'রে তীরে উঠে গাত্রমার্জনা করছেন, অকস্মাৎ কতকগুলি পার্বত্য সৈনিক তাঁকে ঘিরে ধরল, এবং ঘটনার তাৎপর্য উপলব্ধি বা বাধা দেবার কোন চেষ্টা করার পূর্বেই তাঁকে কঠিন রেশম রজ্জুতে বেঁধে ফেলল। অস্ত্রধারণের কোন অবকাশই ঘটল না।

তাঁর সঙ্গী অনুচররা অবশ্যই বাধা দিতে গিয়েছিল। সেই সময়ই প্রায়-অলৌকিক এক অভিজ্ঞতা হ'ল ধনঞ্জয়ের। দেখলেন তাঁর সঙ্গীদের একটি শরনিক্ষেপ কার্যের মধ্যে এই তথাকথিত বর্বর পার্বত্য অধিবাসীরা সহস্র শরে আকাশ আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। পাণ্ডবপক্ষের কার্মুক ভল্ল প্রভৃতি অস্ত্র নিমেষে খান খান হয়ে পড়ল, অস্ত্রধররাও শায়ক-বিষে হতচেতন হলেন।

প্রথমটা তো সে অবস্থা দেখে অর্জুন তাদের প্রাণ সম্বন্ধেই হতাশ হয়েছিলেন ; কারণ তাঁর শোনা ছিল এই বন্যদের লঘুভার শরগুলি দৈর্ঘ্যে ক্ষুদ্র হলেও যেমন শাণিত তেমনি তীব্র বিষাক্ত। সাধারণত নাকি এগুলি সর্প-বিষলিপ্ত থাকে, দেহে বিদ্ধ হওয়া মাত্রে সে বিষ শোণিতধারায় মিশে গিয়ে অনুপল-কয়েক মাত্রে আহত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটায়। সৌভাগ্যক্রমে দেখা গেল এরা তত মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহার করে নি, ভেষজ-বিষ-মিশ্রিত শরে আচ্ছন্ন বা মূর্ছিত ক'রে ফেলেছিল মাত্র।

অর্জুন বাধা দেবার কি প্রতিবাদ করার অবকাশ পান নি। চোখের পলক ফেলতে যেটুকু সময় লাগে তার মধ্যেই তাঁকে বেঁধেছে ওরা। বন্ধনমুক্ত হবার প্রয়াস বৃথা এবং অযথা কষ্টকর জেনে সে চেষ্টাও করেন নি। সেই বন্দী অবস্থাতেই তিনি কিছুদূরে নাগরাজ ঐরাবত বংশীয় কৌরব্যের স্থানীয় প্রাসাদে নীত হলেন। অর্জুন নির্বাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন, তাঁদের চেয়ে অনেক খর্ব ও কৃশকায় মানুষগুলি রণঅশ্বের চেয়েও দ্রুতগামী, কষ্টসহ। তাঁর মতো বলিষ্ঠকায় পুরুষকেও একজন অনায়াসে পৃষ্ঠে বহন ক'রে অতি অল্প সময়ে দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম ক'রে নাগপ্রাসাদে নিয়ে গেল।

বুদ্ধিমান অর্জুন আরও মনে করেছিলেন, তাঁর ষষ্ঠেন্দ্রিয় দ্বারা বুঝেছিলেন যে, এ চক্রান্তের মূলে ঐ তম্বঙ্গী রূপসী কন্যাটিই আছেন। আরও সেই জন্যেই তিনি বাধা দেবার বেশীরকম কোন চেষ্টা করেন নি। তরুণী নারী যখন কোন ঈপ্সাযোগ্য তরুণকে বন্দী করে, তখন সেটাকে মধুর ও বৃহত্তর বন্দীদশারই

ভূমিকা বলে বুঝতে হয়—সেখানে কোন দৈহিক অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না। বধ করা উদ্দেশ্য হলে সেই নদীতীরেই বধ করতে পারত।

যা আশা করেছিলেন—কৌরব্য-আবাসে উপস্থিত হবার পর আতিথেয়তা বা আদর যত্নের কোন ত্রুটি হ'ল না। মূর্ছাহত অনুচরগুলিরও সুব্যবস্থা হয়েছে জানা গেল ; তারা অন্যত্র থাকলেও রাজঅতিথি রূপেই সমাদৃত হচ্ছে। তখনও কিছু তন্দ্রাচ্ছন্নতা ছাড়া নাকি কোন বৈকল্য নেই তাদের।

অর্জুনের অনুমান সমর্থিত হতেও বিলম্ব হ'ল না। এই সব পার্বত্য বন্য লোক বৃথা বাক্‌জাল বিস্তার করতে, ভূমিকা করতে কি বক্তব্যকে বক্র দীর্ঘায়ত করতে শেখে নি। স্পষ্ট কথা সংক্ষেপে বলাই তাদের রীতি। কৌরব্যপুরে পূজা বা হোমাগ্নির ব্যবস্থা ছিল। দেখা গেল প্রতি প্রকোষ্ঠেই অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত। অর্জুন তাঁর নিত্যকার অভ্যাসমতোই তাঁর দেবকৃত্য শেষ করলেন। আহার্যও গ্রহণ করলেন বিনা প্রতিবাদে। কেন এই বন্দীদশা—অনাবশ্যক বোধে সে প্রশ্নও করলেন না কাউকে। তার প্রয়োজনও ছিল না। আহার শেষ হতে স্বয়ং উলূপীই তাম্বূল কর্পূর হস্তে দেখা দিলেন। অযথা কোন সঙ্কোচ বা বৃথা কালবিলম্ব না ক'রেই তিনি জানালেন যে তিনি অর্জুনের প্রণয়প্রার্থী, অর্জুন তাঁকে গ্রহণ করলে কৃতার্থ হবেন।

বাসুদেবের অভয়বাণী ও উপদেশ মনে ছিল, ইচ্ছাও প্রতিকূল নয়—তবু অর্জুন আজন্ম-নাগরিক শিক্ষামতোই উত্তর দিলেন, 'ভদ্রে, আমি দ্বাদশ বর্ষের জন্য ব্রহ্মচর্য অবলম্বন ক'রে দেশভ্রমণে ব্রতী হয়েছি, এসময় নারীসহবাস কর্তব্য নয়।'

উলূপী গৃহে প্রবেশ পর্যন্তই অর্জুনের মুখের দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে ছিলেন, সে দৃষ্টিতে এখন ঈষৎ কৌতুকের হাসি খেলে গেল, সে হাসি সঞ্চারিত হ'ল তাঁর অধরকোণেও। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা অপেক্ষাকৃত অর্বাচীনের চাতুর্য বুঝতে পেরে বা প্রার্থনা প্রত্যাখ্যানের জন্য অপরপক্ষ কোন্ কৌশল অবলম্বন করবে তা পূর্বাহ্ণেই জেনে প্রস্তুত থাকলে সেই প্রত্যাশিত যুক্তির সামনে যেমন আত্মপ্রসাদ-মিশ্রিত কৌতুকের হাসি হাসেন—উলূপীর হাসির ভঙ্গী কতকটা সেই রকমেরই।

তিনি স্থিরকণ্ঠে বললেন, 'আপনারা নিয়ম করেছিলেন—আপনাদের মধ্যে কেউ যখন দ্রৌপদীর সঙ্গে বাস করবেন তখন অপর কোন ভ্রাতা সেই স্থানে গেলে দ্বাদশ বর্ষের জন্য নির্বাসনদণ্ড গ্রহণ করবেন—স্বেচ্ছানির্বাসন। তার মধ্যে ব্রহ্মচর্যের প্রশ্নই ছিল না। এর মধ্যে যেটুকু ব্রহ্মচর্য পালন করণীয় সে

কেবল পট্টমহাদেবী দ্রৌপদী সম্বন্ধেই, অর্থাৎ যেটুকু নির্বাসন জনিত দূরত্বের ফলে অবশ্যম্ভাবী, স্বতঃসিদ্ধ। অপর নারীগ্রহণ সম্পূর্ণ আপনার ইচ্ছাধীন, তাতে কোন বাধা নেই।'

বিস্ময়ের অন্ত রইল না অর্জুনের।

ইন্দ্রপ্রস্থ হতে বহু দূরে এই দেশ, এখানের সঙ্গে তাঁদের দূতবিনিময়ও হয় না। তাঁর এই স্বেচ্ছানির্বাসনও এমন কোন গুরুতর ঘটনা নয় যে দেশে দেশে সে বার্তা আপনিই ছড়িয়ে যাবে। তবে? এক্ষেত্রে এই অনুমানই স্বাভাবিক যে, এই সংবাদটা কেউ ভেবে দেখে, হিসাব ক'রে প্রয়োজন বুঝে পূর্বাহ্লেই প্রেরণ করেছে।

কিন্তু তেমন কার গরজ পড়ল? কার এত স্বার্থ এই ব্যাপারে?

তবে কি বাসুদেবই—? এ মিলন কি তাঁরই কাম্য, পূর্বকল্পিত?

কে জানে! বাসুদেবের পক্ষে সবই সম্ভব, তা সত্ত্বেও যেন বিশ্বাস হয় না।

এ গভীর রহস্যেরও যেন তল পান না।

বেশী চিন্তারও অবসর নেই। এই তরুণী বরনারীর দুই চক্ষুতে একাগ্র কামনার বহ্নি, যেন সর্বস্ব নিবেদনের ডালা সাজিয়ে আরতি করছে, সমগ্র সত্তা ওঁর জন্য উৎসুক, উন্মুখ। উৎকণ্ঠ। সে আরতি সে পূজা ওঁরও অরুচিকর নয়।

তবু একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কন্যার সর্বাঙ্গ নিরীক্ষণ ক'রে নিয়ে বললেন, 'কিন্তু সুহাসিনী, তুমি তো পরপূর্বা। ইতিপূর্বে নিশ্চয়ই তোমার বিবাহ হয়েছিল—?'

উলূপী এ অভিযোগে কিছুমাত্র লজ্জিত হলেন না, অকম্পিত কণ্ঠেই উত্তর দিলেন, 'আমি বিধবা কিন্তু অনপত্যা। বিবাহের অল্পকাল পরেই আমার স্বামী নিহত হয়েছেন। আমার অতৃপ্ত কামনা পূর্ণ করলে, আমাকে সন্তান দান করলে আপনার ধর্মপালনের পুণ্য হবে।...আর, ক্ষেত্রজ পুত্রের জন্মদান তো আপনাদের বংশে নতুন কোন ঘটনা নয়।'

আবারও চমকে উঠলেন অর্জুন। এই মেয়েটি যেন সব জানে, তাঁদের সব সংবাদ রাখে। অন্তরঙ্গ গোপন তথ্যও কোনটা জানতে বাকি নেই। হয় এ মায়াবিনী বা কোন অলৌকিক শক্তিসম্পন্না, নয় তো কেউ পূর্বাহ্লেই ক্ষেত্র প্রস্তুত রাখার জন্য একে সব কিছু জানিয়ে দিয়ে গেছে, ওঁর সম্ভাব্য আপত্তির প্রতিযুক্তিগুলি যুগিয়ে দিয়ে গেছে।

এই শেষের সম্ভাবনার কথাটাই ভাবতে ভাল লাগল তাঁর।

আর কোন প্রতিবাদ করলেন না অর্জুন। তৃষ্ণার সময় সুপেয় পানীয় মুখের কাছে এগিয়ে এলে তা প্রত্যাখ্যান করা মূর্খতা।

উলূপীর ঈপ্সা পূর্ণ ক'রে—তাঁর কায়মনোবাক্য-নিবেদিত পূজা গ্রহণ ক'রে অর্জুন তৃপ্ত হলেন। এই পর্বতদুহিতারা সর্বতোসেবায় পুরুষের মনোরঞ্জন করতে পারে—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রইল না তাঁর। সে সুমধুর বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার স্মৃতি পরবর্তী সারাজীবনই বহন করেছেন তিনি। তার পর বহু সুসভ্যা সুশিক্ষিতা নাগরিকাদের সংস্পর্শে এসেছেন, সাহচর্য লাভ করেছেন—তবু বারে বারেই মনে হয়েছে তাঁর—এ অভিজ্ঞতার তুলনা নেই। মনে হয়েছে এসব রাজৈশ্বর্য, এই ঠাট—এই সমস্যা-দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষের বোঝা ফেলে সেই প্রণয়-সর্বস্ব চিত্তসর্বস্বা পার্বতী নারীর কাছেই চলে যান।

অত্যাশ্চর্য দুটি নারীরত্নের দ্বিতীয়া হলেন মণিপুর-রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা।

এঁর অবশ্য বেঁধে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয় নি। বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন নিজেই এসে ধরা দিয়েছেন, বন্ধনকে আকাঙ্ক্ষিত, শ্রেয় বোধ করেছেন।

পথেই দেখা।

কৌতূহলী ধনঞ্জয় অনির্দেশ্য ভাবেই নগরের পথে ভ্রমণ করছেন : এদেশের অনুন্নত-নাসা গৌরকান্তি বিনত মানুষগুলিকে যেমন ভাল লাগছে, তেমনি এখানের ঘরবাড়ির অনাড়ম্বর লঘু অথচ নয়নানন্দ নির্মাণ-কৌশল, বিপণি-সজ্জা, পরিচ্ছদ-পারিপাট্য—সর্ব ক্ষেত্রেই মার্জিত রুচি ও সূক্ষ্ম শিল্প-বোধের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হচ্ছেন।

দ্রুততারও কোন হেতু ছিল না, অন্যমনস্ক হয়েই পথ অতিক্রম করছেন—অকস্মাৎ অপ্রশস্ত যানবাহনবিরল পথে অশ্বপদশব্দ শুনে সচকিত হয়ে ফিরে তাকিয়ে পলকের মধ্যে চমৎকৃত—যেন স্থাণু হয়ে গেলেন।

এ শব্দ তাঁর পরিচিত। বিস্ময় সেইখানেই, চমকিত হয়ে তাকিয়ে ছিলেন সেই কারণেই। অভিজ্ঞ বীরযোদ্ধা যে ভাবে অশ্ব পরিচালনা করেন সেই ভাবেই কেউ অশ্বচালনা ক'রে আসছেন। কোন অলস ধনী ব্যক্তির বিলাসভ্রমণ নয় এ—যে ব্যক্তি আসছে সে অশ্বারোহীরূপেই যুদ্ধবিদ্যাশিক্ষা করেছে, হয়ত যুদ্ধও করেছে; এ বিষয়ে তার পটুতা সন্দেহাতীত।

কিন্তু সে কোন অনুমানের সঙ্গেই এ বর্তমান দৃশ্য মিলল না।

এ কী দেখলেন!

কোন বীরযোদ্ধা নয়, এমন কি পুরুষও নয়। এক অতি সুন্দরী নারী—সুমধ্যমা, সুশ্রোণী, সুস্তনী, সুগৌরী সুগঠিতদেহা নবযুবতী কন্যা সেই সংকীর্ণপথে অতিশয় দক্ষতার সঙ্গে পথিক ও অন্যান্য যানবাহনের বাধা এড়িয়ে সবেগে

স্বচ্ছন্দে অশ্ব পরিচালনা ক'রে চলে গেলেন।*

তাঁর প্রায় পুরুষের বেশ, ঘোড়ার পিঠে পুরুষের মতোই বসেছেন ঋজু ও অনায়াস নির্ভয় ভঙ্গীতে; বাম হস্তে বল্গা, দক্ষিণহস্ত কোমরবন্ধের খড়্গে; কিন্তু বর্মচর্ম কিছু নেই, অর্থাৎ মনে হ'ল এদেশে তিনি কোন শত্রুর আশঙ্কা করেন না, অথবা কোন শত্রুকেই আশঙ্কার যোগ্য মনে করেন না—সম্ভবত আদৌ কোন আশঙ্কাই নেই তাঁর মনে।

কিন্তু বীরচিত্তে মোহ আনয়নের সে-ই একমাত্র কারণ নয়। বীর্যবান রণকুশলী যোদ্ধার ভঙ্গী ও ভাব, অথচ কী সুকুমার তাঁর মুখশ্রী; কী লতার মতো কোমল তাঁর বাহু দুটি; কজ্জলাঙ্কিত দুটি আয়ত নেত্রে কী মোহমদির দৃষ্টি; শিশিরধৌত পুষ্পের মতো নির্মল কলুষলেশবিহীন অপরূপ মুখ; নিবিড় কৃষ্ণকেশরাশি গ্রন্থিবদ্ধ কিন্তু কিছু কিছু স্খলিত হয়ে বাতাসে উড়ছে, দুটি-একটি চূর্ণকুন্তল স্বেদজড়িত হয়ে সেই সপ্তমী-চন্দ্রের মতো চারুললাটে পত্রলেখার কাজ করছে; ঈশ্বরের আশ্চর্য সৃষ্টি সে নারীর দিকে চাইলে পলকে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়, পলক পড়েও না চোখে।…

প্রায় এক দণ্ডকাল সেই ভাবেই স্তম্ভবৎ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। দৃষ্টি স্থির অথচ শূন্য। কোন প্রদীপ্ত তেজস্মান বস্তুতে চোখ পড়লে দৃষ্টি যেমন বহুক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, সেই দীপ্ত পদার্থের আকারে একটা কৃষ্ণছায়া চোখের সামনে ভাসে—তাঁরও তেমনি ভাসছে। সে ছবি আর নেই, বিদ্যুল্লেখার মতোই ক্ষণিক জ্বলে উঠেছিল—কিন্তু ছায়াটা আছে।…কী দেখলেন তা ধারণা করতে পারছেন না ঠিক—শুধু যা দেখলেন তা বড় সুন্দর, এমন অভিরাম ছবি ইতিপূর্বে আর কখনও চোখে পড়ে নি—এই কথাই মনে হচ্ছে বার বার। সুন্দর, অতি সুন্দর।

বহুক্ষণ পরে সম্বিৎ ফিরে এলে দেখলেন চারিপাশের অগণিত পথিকের কৌতূহলী দৃষ্টি তাঁর ওপর নিবদ্ধ। তাঁর বিহ্বলতা—কারণ অনুমান ক'রে—অনেকের চোখেই কৌতুক হাস্যের সৃষ্টি করেছে। এ বিসদৃশ প্রাকৃতজনোচিত অবস্থার জন্য লজ্জিত বোধ করলেন অর্জুন, নিজেকে সংযত ক'রে নিতেও বিলম্ব

---

* মহাভারতে আছে, 'বরারোহা চিত্রাঙ্গদাকে যদৃচ্ছা নগরপথে ভ্রমণ' করতে দেখেছিলেন অর্জুন। অভিধানে বরারোহা শব্দের দুটি অর্থ আছে: সুনিতম্বিনী, উত্তম যানবাহন-আরূঢ়া। আমি শেষের অর্থটিই গ্রহণ করেছি। রাজার পুত্রিকা কন্যা পায়ে হেঁটে পথে ঘুরছিলেন তা মনে করার কোন হেতু নেই।—লেখক।

হ'ল না। অকারণেই নিজ আচরণের স্বপক্ষ-যুক্তি প্রয়োগ করতে গেলেন, একজনকে বললেন, 'এ ভাবে কোন নারীকে পুরুষের মতো অশ্বারোহণ ও অশ্বচালনা করতে দেখি নি তো—একটু হতবাকই হয়ে গেছি—'

সে বৃদ্ধ পথিক স্মিতহাস্যে উত্তর দিলেন, 'সৌম্য, আপনাকে বিদেশী বলে বোধ হচ্ছে, নইলে এত বিস্মিত হতেন না। যাঁকে দেখলেন তিনি কোন সামান্যা নারী নন, উনি রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা। উনি পুরুষের মতো, যুবরাজের মতোই রাজ্যশাসনে পিতাকে সাহায্য করেন, তাঁর কাছে রাজনীতি ও শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন।'

রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা! মণিপুর-রাজকন্যা!

অর্থাৎ একেবারে অলভ্য নয়; অসম্ভব নয় মিলনাকাঙ্ক্ষা।

তবু দু দিন অপেক্ষা করলেন অর্জুন, নিজেকে শান্ত করতে চেষ্টা করলেন। নগরীর উপকণ্ঠে স্কন্ধাবার স্থাপন ক'রে ছিলেন—সহজে বা বিনা কারণে নিজের পরিচয় দেবার ইচ্ছা ছিল না। সেইখানেই একান্তবাস করলেন দু দিন তিন রাত্রি। কিন্তু তাতেও, প্রাণপণে নিজের অন্তরাবেগের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রেও, যখন চিত্তদমন বা প্রবৃত্তিসংযম করতে পারলেন না, ঈপ্সার হ'ল না উপশম—তখন সাড়ম্বরে দেহরক্ষী দূত ঘোষক অনুচর প্রভৃতি নিয়ে রাজোচিত মর্যাদায় রাজপুরী অভিমুখে যাত্রা করলেন। সেখানে পৌঁছে তাঁর জনৈক দেহরক্ষী প্রাসাদ-দেহলীর সম্মুখে রাখা দুন্দুভিতে আঘাত দিয়ে ঘোষণা করল, 'কুরুবংশ-গৌরব ধর্মাত্মা মহারাজা যুধিষ্ঠিরের অনুজ মহাবীর অর্জুন ভারত প্রদক্ষিণে বেরিয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। শত্রুরূপে বা এ রাজ্যের অনিষ্ট কামনায় নয়, যুদ্ধ কি রাজ্যজয়ের অভিপ্রায়েও নয়—প্রীতি- ও সৌজন্য-বিনিময়ের উদ্দেশ্যে, বন্ধু ও সমানধর্মী ক্ষত্রিয় রাজা হিসাবেই তিনি মণিপুরাধিপতির দর্শনপ্রার্থী।'

অর্জুনের শৌর্য, শস্ত্রবিদ্যায় তাঁর অত্যদ্ভুত পারদর্শিতার কাহিনী বহু দেশ অতিক্রম ক'রে এই সুদূর পূর্বপ্রান্তেও পৌঁছেছিল। তাঁর আগমনসংবাদ অপ্রত্যাশিত, বিশেষ বন্ধুরূপে, সৌহার্দ্য স্থাপনের জন্য। রাজা চিত্রবাহন শশব্যস্তে প্রত্যুদ্গমন ক'রে সম্বর্ধনা জানালেন। পাদ্য অর্ঘ্য পানীয় ইত্যাদি যথাযথ নিবেদন করা হ'ল: অতিথিদের শ্রেণী ও পদবী হিসেবে বাসস্থান ও সিধা, পাচক সেবক প্রভৃতিরও ব্যবস্থা হ'ল। অর্জুনের জন্য নির্দিষ্ট হ'ল প্রাসাদের শ্রেষ্ঠ কক্ষ।

চিত্রবাহন ওঁর দুই হাত ধরে নিজের আসনে বসিয়ে বললেন, 'এই শুভ

আগমনে আমি যে কী পরিমাণ সম্মানিত বোধ করছি ও আনন্দিত হয়েছি—তা বলতে পারব না। আশা করছি মহারাজ যুধিষ্ঠির ও আপনার অন্যান্য ভ্রাতারা কুশলেই আছেন। হস্তিনাপুরের রাজপরিবারেরও অবশ্যই মঙ্গল। সুতরাং আমার প্রার্থনা আপনার মণিপুর অবস্থিতি দীর্ঘায়ত হোক, অন্তত বৎসরকাল এদেশে অবস্থান করুন। এখানে ভোজ্য পানীয়ের অভাব হবে না, শিকারের সুযোগ প্রচুর, মণিপুর নৃত্যগীতাদি ও অভিনয়ের জন্য প্রসিদ্ধ—এ রাজ্যের অধিবাসীরা অনেকেই নৃত্যকলা ও সঙ্গীতশাস্ত্রে পারঙ্গম—আপনার চিত্তবিনোদনে অপারগ হবে বলে মনে হয় না।'

'রাজশ্রেষ্ঠ, আমার দীর্ঘতর অবস্থিতি আপনার আনুকূল্যের ওপরই নির্ভর করছে।' বলে উঠলেন অর্জুন।

সৌজন্য প্রকাশ, অভ্যর্থনাপর্ব, প্রতি-আমন্ত্রণ, কুশল-বিনিময়—রাজ আতিথ্যের সর্বজনস্বীকৃত প্রারম্ভিক ভূমিকা। কোন গূঢ় উদ্দেশ্য বা প্রার্থনা থাকলে এইসব প্রাথমিক সবিনয় কথোপকথনের পর তা জানাতে হয়। এই-ই নিয়ম। কিন্তু অর্জুন এই গত দু দিনে ধৈর্য ও স্থৈর্যের প্রায় শেষ সীমায় এসে পড়েছেন। তাঁর ধমনীতে তখন রক্তস্রোত উত্তাল, আশা ও আশঙ্কায় তিনি কণ্টকিত, ক্ষতবিক্ষত ; কামনায় বাসনায় চিত্তাবেগ অসম্বরণীয় হয়ে উঠেছে। তাঁর আর বিলম্ব সইছে না। তিনি বললেন, 'রাজন, রাজকীয় আতিথ্যের প্রধান অঙ্গ হ'ল উপহার বা উপঢৌকন বিনিময়। আমি পথিক, খুব বেশী কিছু আনতে পারি নি, কতকগুলি নবনির্মিত নূতন পদ্ধতির অস্ত্র এনেছি মাত্র। আশা করি তা সামান্য হলেও আপনার কাছে অরুচিকর বা অকিঞ্চিৎকর বোধ হবে না। কিন্তু মহারাজ, আমি যদি প্রগল্‌ভের মতো কোন উপহার পূর্বেই যাচ্ঞা ক'রে নিই, তাহলে সে নির্লজ্জতা ও ধৃষ্টতা আশা করি বয়ঃকনিষ্ঠ হিসাবে মার্জনা করবেন ; এইটুকু আশ্বাস বা প্রশ্রয় প্রার্থনা করছি।'

'অবশ্য, অবশ্য। যাচ্ঞা কি, আদেশ বলুন। আপনি নিঃসঙ্কোচে আপনার ইচ্ছা ব্যক্ত করতে পারেন। নিজের সম্মান ও ধর্ম ছাড়া যা চাইবেন, সাধ্যে থাকলে অবশ্যই পূরণ করব।'

'মহারাজ, আমি আপনার চারুদর্শনা কন্যা চিত্রাঙ্গদার পাণিপ্রার্থী।'

রাজা চিত্রবাহন উপহার প্রার্থনার কথা শুনে ঈষৎ শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। এখন সে সংশয়ের ভ্রূকুটি রেখা মিলিয়ে গেল বটে, কিন্তু রাজা চিত্রবাহন যেন গম্ভীর ও অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ মৌন থেকে বললেন, 'তৃতীয় পাণ্ডব, পাত্র হিসেবে আপনি পৃথিবীর কোন কন্যারই অকাম্য নন। কিন্তু

এক্ষেত্রে একটি অন্য জটিলতা আছে। পিনাকধৃত ভগবান উমাপতির ইচ্ছায় আমাদের বংশে সকলেরই একটি ক'রে সন্তান হয়। এর আগে অবশ্য আমার পূর্বপুরুষদের পুত্রই হয়েছিল, দৈবক্রমে আমারই ঐ কন্যাটি লাভ হয়েছে। অন্য অপত্য আর সম্ভব নয় বলে আমি ঐ কন্যাকে পুত্রিকা রূপে পালন করেছি ; অর্থাৎ ওর গর্ভজাত পুত্র আমাদের বংশধর বলেই গণ্য হবে, এবং এই সিংহাসনও সে লাভ করবে। সে সন্তানের ওপর তার জন্মদাতা বা তার বংশের কোন অধিকার থাকবে না। আমার কন্যা এই রাজ্যের ভাবী শাসক, তারও পতিগৃহবাস সম্ভব নয়। আপনি যদি এই শর্তে আমার কন্যা গ্রহণ করতে সম্মত থাকেন—আমি সানন্দে সাহ্লাদে তাকে আপনার হাতে সমর্পণ করব।'

ক্ষুধার্তের সম্মুখে লোভনীয় সুধাঘ্রাণরুচি সুখাদ্য—তার তখন খাদ্যের গুণাগুণ, দাতার শর্ত, নিজের কতটা প্রাপ্য বা অধিকার—এসব কোন কথাই মনে থাকা সম্ভব নয়। অর্জুনও এসব কথা বিচার ক'রে বৃথা সময় নষ্ট করলেন না। তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিলেন।

তিনি এই বধূ ইন্দ্রপ্রস্থে নিয়ে যাবার জন্য ব্যস্তও নন তত।

দুদিনের সম্ভোগেচ্ছা মিটে গেলেই ভারত-পরিক্রমায় আবার বেরিয়ে পড়বেন, সঙ্গে স্ত্রীলোক না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

অর্জুনের হিসাবে একটু ভুল হয়েছিল। চিত্রাঙ্গদার পূর্ণ মূল্য সেদিন নির্ধারণ করতে পারেন নি।

এর পর এক দুই করে মাসগুলো কোথা দিয়ে কেটে গেল তা বুঝতেও পারলেন না ফাল্গুনী। মাসকয়েক এখানে থেকে বর্ষার প্রারম্ভে চলে যাবেন—এই রকমই মনে ছিল তাঁর। আসলে এতদিন যে কেটেছে, তাঁর এই অবস্থানকাল যে এত প্রলম্বিত হয়েছে, তা অনুভবই করতে পারেন নি। যে আনন্দ উন্মত্ততায় স্থান-কাল-পাত্রের হিসাব থাকে না—সেই আনন্দের ঘূর্ণাবর্তেই দণ্ড পল দিন রাত্রি পক্ষ মাস বৎসর একাকার হয়ে গেছে তাঁর। আনন্দ আর বিস্ময়। উলূপীকেও ভাল লেগেছিল, কিন্তু তার মধ্যে এত নব নব বিস্ময় আবিষ্কার করেন নি। তাই সে গর্ভবতী হতেই তিনি নাগরাজ্য ত্যাগ করেছেন—কী সন্তান হ'ল তা জানার জন্য অপেক্ষা করার কথাও মনে হয় নি তাঁর। এখানে তার বিপরীত। চিত্রাঙ্গদার সঙ্গসাহচর্য ত্যাগ করার কথাই ভাবতে পারেন নি। এমন কি সে অন্তঃসত্ত্বা, সন্তানসম্ভবা হবার পরও না।

আসলে চিত্রাঙ্গদার অপরূপত্ব শুধু দেহে নয়—যা অতি ক্ষণস্থায়ী যৌবনেই

সীমাবদ্ধ—চিত্রাঙ্গদার অপরূপত্ব চিরনবত্বের কোন সীমা নেই, শেষ নেই।··· কোমলে কঠোরে, সংযমে আবেগে, প্রেমে কর্তব্যপরায়ণতায়, রাজকার্যে সেবাব্রতে—অভিনব সে। দিনে রাতে অবিরাম নব নব রূপে উদ্ভাসিত, উজ্জ্বলিত। একদিকে প্রেমিকা নারী, সরলা প্রণয়বিধুরা—মনে হয় কামসর্বস্বা —অন্যদিকে রাজকার্যে রাজনীতিতে ধীরস্থির, অতীব বুদ্ধিমতী, কূটকৌশলী ; আবার শিকারে অস্ত্র চালনায় তার দ্বিতীয়া নেই। অর্জুন আলোচনা ক'রে দেখলেন যুদ্ধবিদ্যাতেও সে শিক্ষার্থী নয়, রণকৌশলের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্বও তার আয়ত্ত।

এইভাবে অর্জুনের মানসপটে ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলায় চিত্রাঙ্গদার। যখনই মনে হয় দেখা শেষ হয়ে গেছে ওঁকে, তখনই আর এক নূতন রূপ প্রকাশ পায়। বিস্ময়ের অবধি থাকে না। এ নারীর সাহচর্যে ক্লান্তি বোধ হয় না, কোন অভিজ্ঞতার বার বার পুনরাবৃত্তি ঘটে না। দ্রৌপদীও অসাধারণ, অতুলনীয়া কিন্তু তিনি মহিষী, প্রেয়সী। চিত্রাঙ্গদা তার থেকেও বেশী—বন্ধু বয়স্যা। জীবনের সর্বকার্যে সর্বদা সঙ্গিনী হবার যোগ্যা। অর্জুনের মনে হয় তাঁর আদর্শ অর্ধাঙ্গিনী।

শেষে একদিন—সুদীর্ঘ তিন বৎসর অতিবাহিত হয়ে যাবার পর—সুপ্তোত্থিতের মতো সচেতন হয়ে উঠলেন অর্জুন। মনে পড়ল ভারত-পরিক্রমার পথে এখনও বহু রাজ্য বাকি আছে। যে কাজের জন্য বাসুদেব পাঠিয়েছিলেন, যে ব্রত দিয়ে—তা আজও অসমাপ্ত, অথবা অর্ধসমাপ্ত মাত্র।

এই অবসরে চিত্রাঙ্গদার একটি পুত্রসন্তানও হয়েছে। অতি প্রিয়দর্শন, অর্জুনের সমস্ত লক্ষণ নিয়ে জন্মেছে। এ ছেলেকে ছেড়ে যেতেও কষ্ট হয়।··· এই কি মায়ার বন্ধন ? নিজেকেই প্রশ্ন করেন মধ্যে মধ্যে, নইলে এমন বোধ হচ্ছে কেন ? মনে হচ্ছে এই তো বেশ, কী হবে দুরাশার পিছনে ছুটে, প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি খুঁজে ?···

ক্ষণিকের এই আত্মবিস্মৃতি ও চিত্তদৌর্বল্যকে জয় করতেও অবশ্য অর্জুনের খুব একটা বিলম্ব ঘটে না। একসময় মনকে দৃঢ় ক'রে তুলে বিদায় প্রার্থনা করেন চিত্রাঙ্গদার কাছে।

চিত্রাঙ্গদা তখন যৌবরাজ্যে অভিষিক্তা, প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের শাসক। সাধারণ নারীর মতো দুর্বলতা তাঁর নেই। তবু এই গত দীর্ঘ তিন বৎসরকাল যে সুখস্বপ্নের মতো কেটে গেছে—তা থেকে রূঢ় বাস্তবে জেগে উঠে বিচলিত

বোধ করেন বৈকি, বিহ্বলা হয়ে পড়েন।

অর্জুনের মতো স্বামীকে, সম্ভবত চিরদিনের মতো, ছেড়ে দেওয়া? তিনি বাষ্পাকুল নেত্রে স্বামীর কণ্ঠলগ্না হয়ে বলেন, 'আর সামান্য কিছু কালও কি থেকে যাওয়া যায় না?'

'না সুচরিতে', অর্জুনও গাঢ় কণ্ঠে উত্তর দেন, 'এমনিই বহুদিন অলস সুখসম্ভোগে কেটে গেছে। আমরা ক্ষত্রিয়, রাজপুত্র, কর্তব্য আমাদের ব্যক্তিগত সকল বিবেচনার উর্ধ্বে। তোমার এই নিরুপায় স্বামীকে তুমি অবশ্যই কর্ম-কর্তব্যহীন হতভাগ্য ক্লীব বা নপুংসকরূপে দেখতে চাও না।...আর, যখনই যেদিনই যাব তখনই তোমার দুঃখ বোধ হবে। তুমি তো সামান্যা সাধারণ স্ত্রীলোক নও, তোমার এ দুর্বলতা শোভা পায় না। তুমি হাসিমুখে বিদায় দেবে—এইটেই আশা করি।'

চিত্রাঙ্গদা তাঁর প্রিয়তমকে আরও নিবিড় বাহুবন্ধনে আবদ্ধ ক'রে তাঁর সুপ্রশস্ত বক্ষ অশ্রুতে সিক্ত ক'রে ব্যথাবিকৃত কণ্ঠে বলেন, 'আমি রাজা চিত্রবাহনের পুত্রিকা—রাজধর্মের দায়িত্বসূত্রে বাঁধা—কিন্তু সে বন্ধন আমার দেহের, কর্তব্যবুদ্ধির—আমার মুখের হাসি কারও ক্রীতদাস নয়। হাসি বা চোখের জল কর্তব্যের ধার ধারে না।'

বীর অর্জুনের চক্ষু দুটিও কি সিক্ত হয়ে উঠেছিল? কে জানে? তবে তিনি কিছুক্ষণ উত্তর দিতে পারলেন না। অনেক পরে বললেন, 'আমি তোমার দ্বারে ক্ষণিকের অতিথি—তা জেনেই তো আমাকে মাল্যদান করেছিলে!'

ম্লান হাসি হাসলেন বোধ হয় চিত্রাঙ্গদা, বললেন, 'আমি আপনাকে মাল্যদান করি নি, আপনি কেড়ে নিয়েছেন। তবে সে কথা থাক। মন কি এত বিচার ক'রে চলে? না হ'লে সব জেনেও—আপনিই বা আমাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে বিবাহ করবেন কেন? আপনি আমাকে নিয়ে যেতে পারবেন না, আমি আপনার একমাত্রও নই—এসব কথা তো তখন বিচার করেন নি!... আমি কোন অনুযোগ করছি না, শুধু স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—মানুষের মন, তাদের প্রেম—কর্তব্য ধর্ম প্রয়োজন এসব বিচার ক'রে চলে না।'

এবার অর্জুন সম্পূর্ণ নিরুত্তর রইলেন।

অবশেষে একসময় চিত্রাঙ্গদাই বাহুপাশ শিথিল করেন। চোখ মুছে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, 'যান আপনি, আর বাধা দেব না। ভাগ্যের বিধান অলঙ্ঘ্য জেনেও তার দুয়ারে মাথা কোটার প্রবৃত্তি আমার নেই, তাতে

আমার ললাটই ক্ষতবিক্ষত হবে, ভবিষ্যৎ পরিবর্তিত হবে না। আমি ভিক্ষাতেও অভ্যস্ত নই। আমরা অনার্য পার্বত্য নারী—আমরা ভালবাসি নিঃশেষে নিঃশর্তে, নিজের বলতে কিছুই রাখি না। প্রেম আমাদের নিঃসপত্ন, সেখানে একটিই মাত্র পুরুষ, একেশ্বর। আপনারা সুসভ্য আর্যাবর্তবাসী, একই হৃদয় বহু নারীকে দিতে অসুবিধা হয় না। আপনারা আমার কথা বা ব্যথা বুঝবেন না, আমি আপনার বহু প্রেয়সীর একজন, অথবা প্রেয়সী বলাও ভুল—ভোগ্যবস্তুর মতোই। প্রহরান্তরেই বিরহ ব্যথা ভোলার জন্য অন্য নারী গ্রহণ করতে পারবেন, তা ভুলতেও বিলম্ব হবে না, কিন্তু আমার জীবনে কোন সান্ত্বনা কোন আশ্রয় আর রইল না।'

বলতে বলতেই, কিছু-পূর্বে-উচ্চারিত দার্ঢ্য সত্ত্বেও—আবেগে ভেঙে পড়েন রাজকন্যা, বলেন, 'কিন্তু সত্যিই আর কি কোন দিন দেখতে পাব না? আর দেখা হবে না?…শুধু যদি আর একটি বারও কাছে পেতাম মনে হচ্ছে অনেক কিছু বলা বাকি রয়ে গেল, জীবনের এখনও কিছু অবশিষ্ট আছে আপনার পায়ে সঁপে দিতে—এই অহঙ্কার, চরিত্রের দৃঢ়তা সব বিসর্জন দিয়ে আপনার কাছে ভিখারিণী হয়ে দাঁড়াতে।…সে কি কিছুতেই সম্ভব নয়?'

অর্জুন প্রণয়াবেগ-গদ্‌গদ কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'প্রিয়তমে, শান্ত হও। ক্ষোভ ক'রো না। যদি জীবিত থাকি, এ অঞ্চল পরিভ্রমণ শেষ হলে অবশ্য একবার আসব, অর্ধবর্ষকাল থেকেও যাব—তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। তারপরও—অবসর আর সুযোগ মতো, কিংবা আমন্ত্রণ পেলে তুমিও ইন্দ্রপ্রস্থে যেতে পারবে, যাবে, এই আমার আশা। চিরদিনের জন্য না হোক, কিছুদিনের জন্য যেতে তো বাধা নেই। আমি আশ্বাস দিচ্ছি, সেখানে মহাদেবী দ্রৌপদীর পরেই মর্যাদার স্থান তোমার জন্য নির্দিষ্ট থাকবে।'

তারপর ক্ষণকাল মৌন থেকে বললেন, 'আর যদি কখনও ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে কারও কোন সংঘর্ষ উপস্থিত হয়—মণিপুর রাজশক্তির সাহায্য পাব তো?'

'বলাই বাহুল্য, ন্যায়ত ধর্মত এ সিংহাসনের আপনিই অধিকারী। আমিও আপনাকে কথা দিচ্ছি, যদি বেঁচে থাকি—আপনার পুত্রকে আপনার উপযুক্ত সমযোদ্ধারূপেই দেখতে পাবেন, তাকে আত্মজ বলে পরিচয় দিতে কোন দিন লজ্জা পাবেন না। প্রয়োজন হলে রণক্ষেত্রে সে আপনার দক্ষিণ পার্শ্বে থাকবে।'

'প্রিয়ে আমি ধন্য, কৃতার্থ।'

অর্জুন তাঁর প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন। পূর্বাঞ্চল ত্যাগ করার পূর্বে আর একবার মণিপুর গিয়েছিলেন।

কিন্তু সে শুধুই প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য।

প্রাণের আকৃতি অবশ্যই ছিল। বড় বেশী ছিল।

বেশী ছিল বলেই মনে হয়েছে বার বার যে, আর নতুন ক'রে সেই আকর্ষণগণ্ডীর মধ্যে—সে ঐকান্তিক, সর্বস্বসমর্পণ-করা প্রেমভাবের মধ্যে গিয়ে দরকার নেই।

মণিপুর ত্যাগ করার পর দীর্ঘকাল এক বিরাট শূন্যতা অনুভব করেছেন। এ অভিজ্ঞতা জীবনে এই প্রথম, আর সেই কারণেই বড় দুঃসহ। যখন দ্রৌপদীকে ছেড়ে আসেন তখনও ক্লেশ বোধ হয়েছিল, মনে হয়েছিল সেই বিচ্ছেদই মর্মান্তিক, আজ বুঝলেন কোন দুঃখ, ভাগ্যের কোন আঘাতই চূড়ান্ত মনে করার কোন কারণ নেই। দ্রৌপদী প্রিয়া, মহিষী; চিত্রাঙ্গদা তার থেকেও বেশী—দাসী, সখী, বান্ধবী, মর্মসঙ্গিনী। কেবলই মনে হয়েছে কদিন—যদি চিত্রাঙ্গদাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারতেন! রণে বনে দুর্গমে সর্বত্র সে ওঁর আদর্শ জীবনসঙ্গিনী, সহমর্মিণী, সহধর্মিণী হতে পারত। রক্ষিকাও বটে। চিত্রাঙ্গদা মহা-বীর্যবতী, রণনিপুণা—সে পরিচয়ও পেয়েছেন ইতিমধ্যে।

সে দুর্বিষহ চিত্তবেদনার পুনরাবৃত্তি বাঞ্ছনীয় নয়, কিন্তু তিনি বাক্যবদ্ধ—যেতেই হ'ল আর একবার। এবার আগে থাকতেই সতর্ক হয়ে ছিলেন, বেশীদিন থাকতে সম্মত হন নি। ছেলে বড় হয়েছে; সে বৃহত্তর বন্ধন, বিপজ্জনক আকর্ষণ। ছেলে ওঁর ঋজুতা ও মায়ের সৌকুমার্য নিয়ে জন্মেছে। ফলে লক্ষের মধ্যেও লক্ষ্য হয় তাকে। এ ছেলেকেও কাছে রাখতে ইচ্ছা করে বৈকি। নিজের মতো ক'রে মানুষ করতে সাধ হয়। যদিও চিত্রাঙ্গদার ওপর পূর্ণ আস্থা আছে ওঁর, তিনি মানুষই করবেন। সে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তিনি, দ্বিতীয় অর্জুন ক'রেই একদা তাকে পিতার কাছে পাঠাবেন। প্রয়োজনের দিনে, বিপদের দিনে সে-শিক্ষার পরিচয় দেবে সে। চিত্রাঙ্গদা নিজে হয়ত যাবেন না কোনদিনই, কোনদিনই হয়ত দেখা পাবেন না আর—এক যদি অর্জুন নিজেই আবার এখানে আসেন কোন প্রয়োজনে তো দেখা হ'তে পারে—তবে বভ্রুবাহন যাবেন এ আশ্বাস দিয়েছেন চিত্রাঙ্গদা।

তবু—সে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভরসায় এমন ছেলেকে ছেড়ে যেতে কার

না কষ্ট হয়! এক একবার মনে হয় জোর ক'রেই নিয়ে যাবেন ছেলেকে ও ছেলের মাকে—অর্জুনকে বাধা দেবে কে?—পরক্ষণেই মনে পড়ে উনি চিত্র-বাহনের শর্ত স্বীকার ক'রে নিয়ে তাঁর পুত্রিকা-কন্যাকে বিবাহ করেছেন। ধর্মে বদ্ধ।

তাই আবার একদা প্রিয়বিরহবেদনাভারাক্রান্ত চিত্তে নিঃসঙ্গ হয়েই বিদায় নিতে হয়। প্রায়শ্চিত্তের কাল তাঁর, ভারতখণ্ড পরিক্রমার ব্রত নিয়ে বার হয়েছেন, একক ভ্রমণই তো করার কথা। দুদিনের এই সুখলাভটুকু স্মৃতিতেই সঙ্গী হোক। যা হবে না, যা হবার নয়—তার জন্য বৃথা বিলাপ বা মনস্তাপে প্রয়োজন নেই।

পরিক্রমা বামাবর্তে করাই বিধি। অর্জুনও সেই ভাবেই যেতে লাগলেন। দক্ষিণে পৌঁছে সমুদ্রতীরবর্তী স্থান দিয়ে ভারতের পূর্ব উপকূল ভ্রমণ শেষ ক'রে রামেশ্বরকে পূজা দিয়ে পশ্চিম উপকূলে পড়লেন। বহু তীর্থে স্নান করলেন এই পথে, বহু দেবতা দর্শন হ'ল। বহু জাতি, বহু আচার-আচরণ বিধিবিধানের সঙ্গে পরিচয় ঘটল। বিপুল ও প্রাচীন অনার্য সভ্যতার কথা বলেছিলেন বাসুদেব, তবু সে যে এত প্রাচীন ও এত বিশাল তা অনুমান করতে পারেন নি অর্জুন। এখন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় অভিভূত হলেন। এইসব নূতন অপরিচিত দেশে কোন কোন নারীর সঙ্গেও অন্তরঙ্গতার সুযোগ যে না ঘটল তাও না। ফলে চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে বিচ্ছেদের নিদারুণ দুঃসহ দুঃখও ক্রমশ মন্দীভূত হয়ে এল।

পশ্চিম উপকূল ধরেই উত্তরের দিকে এগিয়ে গেলেন পার্থ। লক্ষ্য পূর্বেই স্থির ছিল—দ্বারাবতী।

বহুকাল বাসুদেবকে দেখেন নি, ব্যাকুল ও বিষণ্ণ বোধ করছেন। একটু যেন অসহায়ও। তাছাড়া, যা দেখেছেন ও শুনেছেন, যে বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে তা তাঁকে নিবেদন ক'রে আলোচনা না করতে পারা অবধি স্বস্তি পাচ্ছেন না।

সৌরাষ্ট্রে পৌঁছে শুনলেন শ্রীকৃষ্ণ প্রভাসে অবস্থান করছেন। এ স্থানটি তাঁর বড়ই প্রিয়, মধ্যে-মধ্যেই এখানে এসে একা থাকেন। এটিকে বাসুদেবের চিত্ত-বিশ্রাম বলা চলে। কে জানে—এখানের সঙ্গে কোন প্রিয় স্মৃতি বিজড়িত আছে কিনা।

অর্জুনের অবশ্য ভালই হ'ল। প্রথমত ওঁরও প্রভাসে আসার ইচ্ছা বহু-কালের—দেখবার ইচ্ছা স্থানটিতে কী এমন আছে যা ওঁর গুরু ও আত্মীয়

পুরুষোত্তমকে এত আকৃষ্ট করে! দ্বিতীয়ত তবু কিছুক্ষণ আগে দেখা পাবেন বাসুদেবের। পার্থ পূর্ব-সংবাদ পাঠানোর অপেক্ষা করলেন না, শেষ একদিন প্রায় নিরবচ্ছিন্ন ভাবে রথ চালনা করিয়ে প্রভাসে পৌঁছলেন।

কিন্তু দেখা গেল উনি সংবাদ না পাঠালেও বাসুদেবের এ শুভাগমন বার্তা পেতে কোন অসুবিধা হয় নি। প্রভাসের প্রবেশপথেই তিনি অপেক্ষা করছিলেন। আবারও সেই আতঙ্ক-বিস্ময়মিশ্রিত সম্ভ্রমের ভাব বোধ করলেন অর্জুন। সত্যই কি অন্তর্যামী এই মানুষটি—যাঁকে সখারূপে আত্মীয়রূপে ভাবতেই ভাল লাগে?

শ্রীকৃষ্ণ ওঁকে দেখেই নিবিড় আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন। অর্জুন কি বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, 'এখনই ব্যস্ত হবার কোন কারণ নেই। দ্বাদশ বৎসর ধরে দেশভ্রমণের বিবরণ একদিনে বলা বা শোনা যাবে না। দীর্ঘ পথশ্রমে ক্লান্ত, তোমার ব্রতও শেষ, এখন তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্রাম করো। কথা যা কিছু কাল হবে।'

তবু রাত্রে পাশাপাশি শয্যায় শুয়ে কিছু কিছু বলতে গেলেন অর্জুন। দেখলেন, হয় বাসুদেব পূর্বেই সংবাদ পেয়েছেন, নয়তো প্রসঙ্গ শুরু করা মাত্র বুঝে নিয়েছেন—অথবা ঐ যা-সন্দেহ, তিনি অন্তর্যামী; কিম্বা এ সবের তিনিই চক্রী। অর্জুন যা করেছেন যেখানে গেছেন বাসুদেবই তার নিয়ন্তা, বাসুদেবের ইচ্ছার বাইরে যেতে পারেন নি।

বাসুদেব হেসে বললেন, 'নাও, এখন নিদ্রা যাও। একা চিত্রাঙ্গদা হ'লে বলতাম তাঁকে স্বপ্ন দেখ—কিন্তু উলূপী, চিত্রাঙ্গদা, অপ্সরা ভগিনীরা—আরও কত সারা জম্বুদ্বীপে ছড়িয়ে আছে কে জানে! এ ক্ষেত্রে একজন কাউকে স্বপ্ন দেখে অনিদ্রায় কাটবে সে আশঙ্কা নেই।'

অর্জুন অপ্রতিভ হয়ে কি বলতে যাচ্ছিলেন, বোধ করি এ ব্যাপারে নিজের দায়িত্ব কত কম সেইটেই প্রমাণ করতে চাইছিলেন, বাসুদেব বাধা দিয়ে বললেন, 'না না, এতে লজ্জার কোন কারণ নেই। আমি একটু পরিহাস করছিলাম মাত্র।...এ ভালই হ'ল বন্ধু। দেশে দেশে আত্মীয়, দেশে দেশে বান্ধব, এইটেই আমি চেয়েছিলাম। পূর্বদিক অনেকটা নিরাপদ রইল, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের ভগদত্ত খুব বেশী শত্রুতা করতে পারবেন না।'

পরদিনই দ্বারকা রওনা দিলেন কৃষ্ণার্জুন।

পূর্বদিন অর্জুনকে প্রত্যুদ্গমন করতে আসার মধ্যে, যাতে প্রভাসে এক দিন

কালক্ষেপ হয়—তার একটা গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল বাসুদেবের। সেটি পরের দিন দ্বারকায় পৌঁছে বুঝতে পারলেন অর্জুন।

না, প্রথমে তাও বুঝতে পারেন নি।

নগরীর প্রবেশপথে, সমুদ্রতীরের পোতাশ্রয়েই বিরাট এক তোরণ নির্মিত হয়েছে, বিজয়-তোরণ, বিভিন্ন বিচিত্র পত্রপুষ্প-সম্ভার ও পতাকায় সুসজ্জিত, চারুচিত্রিত। নগরীতে প্রবেশ ক'রেও দেখলেন সর্বত্র উৎসবসজ্জা। প্রধান প্রধান রাজপথে অসংখ্য তোরণ, তোরণগুলির মধ্যে পুষ্পমাল্যের চন্দ্রাতপ। প্রতি গৃহেই উৎসব সমারোহ, প্রতি গৃহস্থই হর্ষ-প্রকাশের জন্য প্রস্তুত, উন্মুখ।

সাধারণত রাজা কোন যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে এলেই এ ধরনের উৎসব-সমারোহ ঘটে। বিস্মিত অর্জুন প্রশ্ন করলেন, 'এ যে বিজয়-মহোৎসবের আয়োজন। তবে কি বৃষ্ণিবংশীয়রা কোন যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন ? না চির-শত্রু জরাসন্ধ নিহত হয়েছে ?'

মৃদু হাসিতে বাসুদেবের মুখ রঞ্জিত হয়ে উঠল। কোন কৌতুকের ষড়যন্ত্র সফল হ'লে যেমন হাসে মানুষ—তেমনি। বললেন, 'না, তেমন কিছু নয়। তবে ঠিকই অনুমান করেছ, এক বিজয়ী বীরের সংবর্ধনারই আয়োজন বটে।'

'বিজয়ী বীর ? কে সে ?' কণ্ঠে আহত বিস্ময়ের স্বর।

তখনও বুঝতে পারছেন না অর্জুন কথাটা।

অবশ্য আর বেশী বিলম্বও হ'ল না।

বাসুদেব উত্তর দেবার পূর্বেই যে সমস্ত অন্ধক ও বৃষ্ণি বংশীয়েরা উৎসব সাজে সজ্জিত হয়ে মাল্য চন্দন মধু ধূপ ইত্যাদি নিয়ে অভ্যর্থনার জন্য প্রধান রাজপথ ধরে আসছিলেন—তাঁরা অর্জুনকে দেখে ওঁর নাম যুক্ত ক'রেই জয়ধ্বনি ক'রে উঠলেন। সে জয়ধ্বনি প্রতিধ্বনির মতো পুনরুচ্চারিত হতে হতে বহুদূর অবধি তরঙ্গায়িত হ'ল।

পুনরুচ্চারিত হতে লাগল গৃহে গৃহে। অলিন্দগুলি থেকে পুষ্পবৃষ্টি ও মঙ্গলধ্বনি হতে লাগল।

'এবার বুঝলে বন্ধু, কার অভ্যর্থনার আয়োজন !' বাসুদেব সস্নেহ পরিহাস-তরল কণ্ঠে বললেন।

আনন্দ-লজ্জা-রঞ্জিত মুখে অর্জুন বললেন, 'কিন্তু আমি তো কোন বিজয়লাভ করি নি, এ অকারণ সম্মানে বিব্রতই বোধ করছি যে।'

'যুদ্ধে জয়লাভ তোমার মতো রণ-সুপণ্ডিত শস্ত্রশাস্ত্রজ্ঞর পক্ষে এমন কোন

কঠিন কাজ নয় বন্ধু। তার চেয়ে অনেক কঠিন—দীর্ঘকাল ধরে যে স্বদুশ্চর ব্রত তুমি পালন করেছ! এ কাজ ইতিপূর্বে কেউ করেন নি, অচিরভবিষ্যতেও কেউ করবেন বলে মনে করি না। বিজয়ী রূপে, রক্তবন্যা প্রবাহিত ক'রে নয়—বন্ধু রূপে সমগ্র ভারতের বিভিন্ন জাতি-উপজাতি-সংস্কৃতি-ভাষার সঙ্গে এই যে যোগসূত্র স্থাপন করলে—যে কোন বৃহৎ যুদ্ধজয়ের থেকেও ঢের বেশী কঠিন কাজ এ, ঢের বেশী কৃতিত্ব!'

অর্জুন মাথা নত ক'রে এই শুভেচ্ছা ও প্রশংসা গ্রহণ করলেন। ভাবাবেগে-বিচলিত তাঁর কণ্ঠ থেকে কোন উত্তর প্রকাশিত হ'ল না।

দ্বারকায় একদিন মাত্র অবস্থান ক'রেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিয়ে রৈবতকে চলে গেলেন। সেখানে কি একটা ব্রত উপলক্ষে উৎসব আছে, সে উৎসবে সহজেই অর্জুনের ক্লান্তি অপনোদন হতে পারবে, এই কথাই বললেন সকলকে। শুধু এই বিজয়সংবর্ধনা জানাতেই রাজধানীতে আসা, নইলে সেখানেই চলে যেতেন আগে।

রৈবতক সম্বন্ধে অর্জুনের কৌতূহল সমধিক।

এই স্থানটি নির্বাচন ও এখানে জনপদের পত্তন শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ রাজনীতিক প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টিরই আর এক নিদর্শন। জরাসন্ধের আক্রমণ-আশঙ্কাতেই তিনি এতদূরে, সহস্র যোজন ব্যবধানে সমুদ্রবেষ্টিত দ্বারকাপুরী বেছে নিয়েছিলেন তাঁদের নিরাপদ বাসস্থান হিসেবে। স্থলপথে যার যত বিক্রম জলপথে সে তত অসহায়। এর প্রমাণ আগে বা পরে বিস্তর পাওয়া গেছে।

কিন্তু এ তো গেল বাসস্থান, রাজধানী। রাজ্য না থাকলে রাজধানীর মূল্য কি?

সে রাজ্য স্থাপন মূল ভূখণ্ড ছাড়া সম্ভব নয়। প্রজাপত্তন গোপালন বা কৃষিকর্ম—উপার্জনের যে কোন উপায়ই হোক—বিস্তৃত ভূমিসম্পদ প্রয়োজন। জলবেষ্টিত ক্ষুদ্র দ্বীপে সেটা সম্ভব নয়।

মূল ভূখণ্ডে রাজ্যশাসন করতে গেলে সেখানেও একটা প্রজাসংযোগকেন্দ্র থাকা প্রয়োজন। প্রতি পদে সমুদ্র পেরিয়ে প্রজারা অভাব অভিযোগ জানাতে আসবে কেন? আসা সহজও নয়। তাছাড়া বেশির ভাগ লোকেই সমুদ্রে পাড়ি দিতে ভয় পায়।

সেই কারণেই প্রমোদাবাসের নামে এই দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করা। কিন্তু এখানে থাকলেই শত্রুভয়ও থাকবে। সে জন্যই এই পর্বতশিখরটি বেছে

নিয়েছিলেন বাসুদেব। এখানের আবহাওয়া অতীব মনোরম, চিরবসন্ত বিরাজিত এখানে। নয়ন-আরাম এখানের দৃশ্য। উপরে অনেকখানি সমতল-ভূমি, বাসগৃহাদি নির্মাণের উপযোগী। একাধিক নির্ঝরিণী থাকায় পানীয়জলের অপ্রাচুর্য নেই—অথচ এখানে আসার একটিই মাত্র পথ, সেটিও যথেষ্ট সংকীর্ণ। অর্থাৎ একটু বিবেচনা-মতো ঠিক স্থানটি নির্বাচন ক'রে প্রহরারত থাকলে একশত লোক এক অনীকিনীর মহড়া নিতে পারে।...

রৈবতকে পৌঁছে যেমন পরিতৃপ্ত তেমনি চমৎকৃত হলেন অর্জুন।

অভিরাম দৃশ্য, স্নিগ্ধ বাতাস—নিমেষমধ্যে মন এবং দৃষ্টি আরাম বোধ করল। নগরীর—নগরী না বলে গণ্ডগ্রাম বলাই হয়ত উচিত—নির্মাণকৌশলও বড় সুন্দর। কোথাও এই দৃশ্যের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ চক্ষুর পীড়াদায়ক বৃহৎ হর্ম্যাদি নির্মাণের চেষ্টা করা হয় নি; অট্টালিকার পাশে পর্ণকুটীর—ধনী দরিদ্র উচ্চনীচের বাসস্থান চিহ্নিত ক'রে—কোন ভেদ ঘোষণা করে নি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটির, তৎসংলগ্ন বিস্তীর্ণ পুষ্পোদ্যান, প্রতি চতুষ্পথে একটি ক'রে মন্দির।

তবে বিস্ময় সে কারণেই শুধু নয়।

বাসুদেব পূর্বাহ্ণেই জানিয়েছিলেন—কী একটা পূজা উপলক্ষ ক'রে তিনদিন ব্যাপী উৎসব হবে, সেই কারণেই যাদব-প্রধানরা দ্বারকা ত্যাগ ক'রে রৈবতক যাচ্ছেন। আরও বলেছেন পূজাটা উপলক্ষ মাত্র, লক্ষ্য উৎসব। অন্ধক ও বৃষ্ণি বংশীয়েরা উৎসবের জন্য পঞ্জিকা খুঁজে পূজার তিথি বার করেন।

কিন্তু সে উৎসব যে এই বস্তু—অর্জুন তা কল্পনাও করতে পারেন নি। তাঁর বাল্য-কৈশোরও অবিরাম ভ্রমণে কেটেছে—জীবনরক্ষার জন্য স্থান থেকে স্থানান্তরে যেতে হয়েছে—তার পরও, এই তো দ্বাদশ বৎসর ধরে সমগ্র ভারত প্রদক্ষিণ ক'রে এলেন, কোথাও এমন উৎসব-উন্মত্ততা দেখেন নি। এখানে সকলেই, তরুণ প্রবীণ নির্বিশেষে, যুগলবদ্ধ হয়ে পথে বেরিয়ে পড়েছেন। সঙ্গে নারী—হয়ত অনেক স্ত্রীর একজন, কেউ হয়ত পরস্ত্রী বা বারনারীও নিয়েছেন সঙ্গে। সকলেরই দৃষ্টি সুরা অথবা সিদ্ধিতে আরক্ত, ঢুলুঢুলু করছে। প্রত্যেকেই যথেষ্ট পুষ্পাভরণ ধারণ করেছেন, সমস্ত উর্ধ্বাঙ্গ চন্দনপরিলিপ্ত। বেশভূষার পারিপাট্যও—প্রভাতে যথেষ্ট ছিল, এখন এই দ্বিপ্রহরের মধ্যভাগে কিঞ্চিৎ শিথিল; কারও উত্তরীয় স্খলিত, কারও বা অঞ্চল ভূলুণ্ঠিত। কোথাও নৃত্যগীত-নাটকাদি অভিনীত হচ্ছে, অনেকে সেখানে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে নানারূপ মন্তব্য করছেন অথবা সাধুবাদ দিচ্ছেন; কেউ বা নিজেরাই নৃত্যগীতসহকারে ভ্রমণ করছেন, কোথাও বা পাশা ইত্যাদি জুয়া খেলার আসর বসেছে, সেগুলো

কেন্দ্র ক'রে বহু জনসমাগম। তবে পথে পথে গান গেয়ে ঘুরে বেড়ানোর দলই বেশী। স্বয়ং আর্য বলদেব রেবতীকে নিয়ে মদিরামত্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এছাড়া, শাম্ব, প্রদ্যুম্ন, অক্রূর, সারণ, সাত্যকি, হার্দিক্য প্রভৃতি গোষ্ঠী-প্রধান বা রাজকুমাররাও একাধিক বনিতা নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়েছেন, সকলেই আমোদ-প্রমোদের নব নব পন্থা আবিষ্কারে, উপায়-উদ্ভাবনে ব্যস্ত।*

অর্জুন বাসুদেবের সঙ্গে দর্শক হিসেবেই অনেকক্ষণ পথে পথে ঘুরে বেড়ালেন। বাসুদেব এই ধরনের মত্ততা পছন্দ করেন না, সে কথা এঁরাও জানেন, তাই ওঁকে দেখে ক্ষণিকের জন্য সঙ্কোচ বোধ করছে সবাই, এমন কি বলদেবও চোখোচোখি হ'লে লজ্জিত হয়ে পড়ছেন।

বাসুদেব ইচ্ছা ক'রেই একটা বিশেষ দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন কিনা কে জানে, সহসা একসময় ওঁরা নগরের মধ্যভাগে বড় মন্দিরটির সামনে এসে পড়লেন। এই মন্দিরটিই এ উৎসব-সমারোহের কেন্দ্রবিন্দু, তিনদিন ধরে এখানেই পূজা দেবার কথা।

অবশ্য ওঁরা যখন পৌছলেন তখন আর বিশেষ ভিড় নেই, অল্প দু-চারজন পূজা দিতে এসেছেন বা পূজা শেষ ক'রে চলে যাচ্ছেন। স্ত্রীলোকই বেশির ভাগ।

দৈব, অথবা বাসুদেবের যোগাযোগ।

এই পূজার্থিনীদের মধ্যে একটি কিশোরী কন্যাকে দেখে কখন অর্জুনের গতি বন্ধ হয়ে গেছে, স্থির নিশ্চল বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছেন, তা তিনি বুঝতেও পারেন নি। এমন কি এভাবে অনাত্মীয় কোন নারীর দিকে পলকশূন্য নেত্রে চেয়ে থাকা যে শিষ্টাচারবিরুদ্ধ—সে জ্ঞানও ছিল না।

নিজের আচরণ, পরিবেশ, সঙ্গী—কিছু সম্বন্ধেই যে অবহিত নয়—তার ভব্যতাবোধ থাকবেই বা কি ক'রে? অর্জুনের কোন বিষয়েই আর কোন সচেতনতা ছিল না।

অল্পবয়সী কুমারী কন্যা। সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া নিশ্চয়ই, কারণ সঙ্গে অনেকগুলি দাসী বা সহচরী রয়েছে, পূজার উপকরণাদি বহন ক'রে এনেছে তারা।

সুন্দরী অনেক দেখেছেন বৈকি। দ্রৌপদীর তো কথাই নেই। সাম্প্রতিক-কালেও কয়েকটি সুন্দরী তরুণীকে দেখলেন। চিত্রাঙ্গদা অনিন্দ্যসুন্দরী না

---

* মধ্যযুগের পাশ্চাত্ত্য দেশে carnival নামে পরিচিত উন্মত্ত-আনন্দোৎসবও অনেকটা এই ধরনের। কার্নিভাল অনুষ্ঠান রোমে সম্ভবত এখনও প্রচলিত আছে।

হলেও তাঁর অন্য আকর্ষণ আছে, সে আকর্ষণ বীর হৃদয়ের চিত্তে কম তরঙ্গের সৃষ্টি করে না। কিন্তু এই লোকললামভূতা বিশাল-তাম্র-নয়না মেয়েটির শান্ত শ্রীতে যে মাধুর্য, শ্রদ্ধাতদ্‌গত ভঙ্গীতে, লজ্জাস্পর্শবিনত দৃষ্টিতে, গতির কোমল ছন্দে, দেহের যৌবনোচ্ছ্বাসে যে অত্যাশ্চর্য ঐন্দ্রজালিক মায়া, তা অভিভূত করে, মোহগ্রস্ত করে।—এ রূপ আর কোনও মেয়ের মধ্যে দেখেন নি এতাবৎ।

তাছাড়াও, বলিষ্ঠ পুরুষের চিত্ত চায় আশ্বাস ও প্রশ্রয়ের সূর্যতাপে একটি কোমল লতা-প্রাণকে সংসারের ঝড়ঝঞ্ঝা থেকে রক্ষা করতে। দ্রৌপদী ও চিত্রাঙ্গদার মতো কন্যাতে সে সাধ মেটে না। সুভদ্রাতে মেটে।

ফাল্গুনীর এই প্রস্তরীভূতপ্রায় অবস্থা, নিমেষহীন দৃষ্টি, উন্মুক্ত ওষ্ঠে আবদ্ধ নিশ্বাস—বাসুদেবের চোখ এড়ায় নি। হয়ত এ তিনি জানতেন, আশাই করেছিলেন! হয়ত অর্জুনের অজ্ঞাতে এদিকে ইচ্ছাপূর্বকই নিয়ে এসেছেন, এ নাটকের অবতারণা করবেন বলে।

কিছুক্ষণ প্রিয় বন্ধুর দুর্দশাটা উপভোগ ক'রে মৃদু কৌতুকের হাসি হেসে বললেন, 'এ কি, অরণ্যবাসী ব্রহ্মচারীর মন এত সামান্য কারণে উতলা কেন? ...মনে হচ্ছে চিত্রাঙ্গদার চিত্রও স্মৃতির দিগন্তে অস্ত গেল!...আমার তো দুর্নাম চিরকালের, কিন্তু দৃঢ়চেতা ফাল্গুনীও যে দেখি ক্ষণে ক্ষণে চিত্ত হারিয়ে ফেলেন!'

অর্জুন এবার লজ্জিত হলেন, আত্মসচেতনও হলেন কতকটা, কিন্তু প্রকৃতিস্থ হ'তে পারলেন না তখনই। বিহ্বল লজ্জাজড়িত কণ্ঠেই প্রশ্ন করলেন, 'এ—এ মেয়েটি কে?'

'এ সুভদ্রা। আমার পিতা বসুদেবের কন্যা, সারণের সহোদরা।'

ততক্ষণে সুভদ্রা মন্দিরে প্রবেশ করেছেন, ইন্দ্রজালের প্রভাব দৃষ্টির অন্তরাল হওয়াতে অনেকটা কমে গেছে। অর্জুনও পরিবেশসচেতন হয়ে উঠেছেন। সেই মণিপুরের মতোই তিনি যে অনেকের কৌতূহল ও কৌতুকের পাত্র হয়ে উঠেছেন তা বুঝে বিষম লজ্জিত হয়ে পড়েছেন। 'ছিঃ ছিঃ, বাসুদেব কী মনে করলেন, কত দুর্বল ভাবলেন আমাকে, কি অভব্যই ভাবলেন বা'—সে কথা মনে ক'রে আর মাথা তুলতে পারছেন না।

ততক্ষণে অবশ্য দুজনেই চলতে শুরু করেছেন। মন্দিরের পাশ দিয়েই যাওয়া, তবু লজ্জাতেই—ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও—সেদিকে আর তাকাতে পারলেন না।

কিন্তু, যতই লজ্জা পান না কেন, মনের মধ্যে উদ্বেলিত উচ্ছ্বাস গোপন করাও সম্ভব হ'ল না বেশীক্ষণ। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'অপূর্ব! সত্যই বলছি, এমন আর কখনও দেখি নি। এ স্বতন্ত্র, একক।'

শ্রীকৃষ্ণ খুব সহজ ভাবেই উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, আমার এই ভগ্নীটির রূপের বিশিষ্টতা আছে তা অবশ্যস্বীকার্য। রূপ ছাড়াও—গুণেরও তুলনা নেই বোধ করি। এত মধুভাষিণী, মিষ্ট চরিত্রের মেয়ে কমই দেখা যায়—এত সেবাপরায়ণা, এত স্নেহশীলা, কোমলপ্রাণা।...এ তোমার কৃষ্ণার বিপরীত। কৃষ্ণা কেন, তোমার কোন চিত্তপ্রিয়ার সঙ্গেই এঁর মিল নেই। কৃষ্ণা মহিষী, গৃহিণী; চিত্রাঙ্গদা নর্মসহচরী, কর্মসহচরী—সুভদ্রা মর্মসঙ্গিনী, সেবিকা। কৃষ্ণা নব নব কীর্তিতে কর্মে উদ্বুদ্ধ করবেন; সুভদ্রা শ্রান্তি অপনোদন করবেন, শান্তি আনবেন প্রাণে। আমার পিতারও সর্বাধিক প্রিয় এই সন্তান, তাঁর নয়নের মণি।...তা দ্যাখো, বল তো তাঁকে জানাই!'

অর্জুন মস্তক আরও নত ক'রে প্রায় অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বললেন, 'ওঁর স্বয়ম্বরের কি কোন আয়োজন হচ্ছে? তেমন কোন অভিপ্রায়—?'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'সুভদ্রা যদি সত্যই তোমার মন আকৃষ্ট ক'রে থাকেন তো—'

কথা শেষ হবার পূর্বেই অর্জুন বলে ফেললেন, 'হ্যাঁ, মনে হচ্ছে এ কন্যাকে না পেলে জীবনধারণের কোন অর্থই নেই। মনে হচ্ছে এঁর জন্যই এতকাল অপেক্ষা করেছি, ইনিই আমার তৃষ্ণার শান্তি, জীবনের পূর্ণতা—'

'ধীরে বন্ধু, ধীরে। এমন আরও কতবার মনে হবে। তুমিই যথার্থ বীর, আবেগসর্বস্ব।...সে কথা যাক, বলছি যদি সত্যই এমন দুর্বল হয়ে থাকো—স্বয়ম্বরের ঝুঁকি নিতে যেয়ো না।'

'কেন? ঝুঁকি বলছেন কেন?'

হাসলেন বাসুদেব, তাঁর নিজস্ব সেই হাসি। বললেন, 'তোমার নিজের ওপর এত বিশ্বাস! বন্ধু, মেয়েদের মন এক আশ্চর্য বস্তু—দেবতারাও তার তল পান না—তুমি তো কোন্ ছার। স্বয়ম্বর মানেই তো কন্যাটির অভিরুচির উপর নির্ভর করা। একবার স্বয়ম্বর ঘোষণা করলে মেয়ে যাকে নির্বাচন করবে তার হাতেই সম্প্রদান করতে হবে। কথা দিলে কথা ফেরানো যায় না। সুভদ্রা যে তোমার গলাতেই মালা দেবেন তার কোন নিশ্চয়তা আছে? দ্রৌপদী যে কর্ণকে প্রত্যাখ্যান ক'রে তোমায় বরণ করলেন! তখন তোমার পরিচয়ও তো জানতেন না! তোমার নিজের সম্বন্ধে যতটা উচ্চ ধারণা,

আমার ভগ্নীর যদি ততটা না থাকে ? মেয়েরা হৃদয়ের আজ্ঞায় চলে, বিচার-বিবেচনার ধার ধারে না। পুরুষকে পছন্দ করার সময় সবাই যে তার শৌর্য কি কুলশীল কি পাণ্ডিত্যের কথা চিন্তা করবে এমন কোন নিয়ম নেই। এক-একজনের এক এক রকমের মতি-বুদ্ধি। একেবারে অপাত্রে প্রণয় দিয়েছে এমন ইতিহাসও তো বিরল নয়। যদি এঁকে না পেলে তোমার কষ্ট হবে ভাবো—তাহলে স্বয়ম্বরের জালে পা বাড়িও না।'

'তবে ?' অর্জুন বুঝতে পারেন না কথাটা, 'তাহলে কি এমনি—মানে আপনার পিতাকে বললে—'

'না, তিনিও যে স্বেচ্ছায় সানন্দে প্রবলা সপত্নীর ঘরে প্রিয় কন্যাটিকে দান করবেন তারও কোন স্থিরতা নেই। বিশেষ এ পাত্র, যতই হোক, রাজা নয়, রাজভ্রাতা।'

'তবে ?' আবারও সেই বিমূঢ় প্রশ্ন।

'তোমার প্রয়োজন—তুমি গ্রহণ করবে! অত চিন্তার কী আছে! তুমি ক্ষত্রিয় বীর—মাটির মতো স্ত্রীলোকও বীরভোগ্যা। ইচ্ছা প্রবল হয়ে থাকে, নিয়ে চলে যাও। হরণ করো।'

'আপনার ভগ্নীকে হরণ ক'রে নিয়ে যাব ?'

'দোষ কি ? বিবাহার্থে বলপূর্বক কন্যা হরণ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অবিধি কি অন্যায় নয়।'

'কিন্তু—', লোভ ও বিবেকের মধ্যে দোলাচল-চিত্ত অর্জুন বলেন, 'তার পরও যদি আমাকে পছন্দ না করেন সুভদ্রা ?'

বাসুদেব বললেন, 'মূর্খ! স্ত্রীলোকরা যে গায়ের জোরের ওপরই বেশী জোর দেয়, পছন্দ করে—সেটা এতকালেও বোঝ নি! যাও, কালই উত্তম অবসর, এ পূজা ও উৎসবের শেষ দিন কাল। এই সময়ে সুভদ্রা আসেন, তার কারণ এ সময় ভিড় থাকে না, এদিকে বড় কেউ আসে না। বাধা দেবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না। আর যাদব-প্রধানদের কাছে এ সংবাদ পৌছে তাঁরা প্রস্তুত হতে হতে তোমরা বহু দূর চলে যেতে পারবে।'

অর্জুন অবনত হয়ে বন্ধুকে নমস্কার জানালেন—কৃতজ্ঞতা ও কৃতার্থতার পরিচয় স্বরূপ।

॥ ১৩ ॥

এটাও যে দৈবের যোগাযোগ নয়, বাসুদেবের ইচ্ছাতেই এই সংঘটন—অর্জুন সেটা জানতে পারলেন অনেক পরে।

শ্রীকৃষ্ণ ঠিকই বলেছিলেন ; এই অপহরণের সংবাদ, ভীত ও সন্ত্রস্ত সহচরীর দল এবং মন্দিরের পূজারী যখন গোষ্ঠীপ্রধানদের খুঁজে বার ক'রে জানালেন—জানানোও সহজ হয় নি, তিনদিন-ব্যাপী সুরাপানের প্রভাব থেকে মুক্ত ক'রে অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করাতে যথেষ্ট সময় লাগল—তখন অর্জুনের রথ বহুদূর পৌঁছে গেছে, রৈবতক থেকে নেমে সমতলে পৌঁছেও বেশ খানিকটা চলে গেছেন তিনি।

পূর্বদিন রাত্রে বাসুদেবই সব নির্দেশ দিয়েছিলেন। কোথায় রথ নিয়ে দাঁড়াতে হবে, কোন্‌খানে কোন্ পথ দিয়ে ঘুরে গেলে বিশেষ কারও চোখে পড়বে না—ইত্যাদি। সুভদ্রা পূজা শেষ ক'রে অন্যমনস্ক ভাবে মন্দির থেকে নিষ্ক্রান্ত হবেন, দেবারাধনার তন্ময়তায় তখনও কিছুটা আচ্ছন্ন থাকবেন তিনি—সে-ই অবসর।

অর্জুনকে বেশী বলতে হয় নি। সামান্য আভাস দিতেই সমস্ত চিত্রটা কল্পনা ক'রে নিতে পেরেছিলেন। খুব একটা বলপ্রয়োগেরও প্রয়োজন হয় নি। অর্জুনের শৌর্যখ্যাতি শোনাই ছিল, এখানে আসার পর দেখাও হয়েছে, মনে হয়ত সুভদ্রারও কিছু অভিলাষ জেগে থাকবে—তিনি সামান্য একটু প্রাথমিক বাধার পর বেশ শান্তভাবেই মেনে নিয়েছিলেন এই হরণোদ্যোগটা ; উচ্চকণ্ঠে পথচারীদের সচেতন ক'রে সাহায্য ভিক্ষা করা কিংবা রথ যখন অপেক্ষাকৃত মন্দগতিতে যেতে বাধ্য হচ্ছে তখন নেমে পড়ার চেষ্টা—কোনটাই করেন নি।

কিন্তু মনোভাবের এত সূক্ষ্ম সম্ভাব্য বিশ্লেষণ এঁরা করবেন তা সম্ভব নয়। যাদব-প্রধানদের কর্ণে ও মস্তিষ্কে সংবাদটা পৌঁছতে—মধুচক্রে নয়—একেবারে ভৃঙ্গরোলচক্রে-লোষ্ট্রবৎ প্রতিক্রিয়া জাগল—একটা প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হুঙ্কার উঠল চারিদিকে। মত্ততা ছুটে গেল অধিকাংশরই। সকলেই অর্জুন ও তাঁর বংশ সম্বন্ধে কটুবাক্যে মুখর হয়ে উঠলেন। যাদবদের অপমান করেছেন, আতিথ্যের অমর্যাদা করেছেন ফাল্গুনী, সকল প্রকার শিষ্টাচারের নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন। কেউ বললেন, এটা দুঃসহ স্পর্ধা, কঠিন শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন—যাতে সুদূর ভবিষ্যতেও এমন দুষ্কার্য, দুর্বৃত্তজনোচিত আচরণ করতে কেউ সাহস না করে। বলদেব বললেন, 'চলো এখনই রওনা হওয়া যাক, পাণ্ডবদের সকলকে বধ ক'রে

ওদের ঐ নূতন রাজধানীটা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে আসি।'

সাত্যকি, শাম্ব, সারণ প্রভৃতি মহাবীরগণও যথেষ্ট আস্ফালন ও স্পর্ধা প্রকাশ করতে লাগলেন। বললেন, 'মৃত্যু ঘনিয়ে এলেই মূর্খদের এই রকম দুঃসাহস দেখা দেয়। মূঢ় জানে না যে, কাদের কাছে এই ধৃষ্টতা প্রকাশ করতে এসেছে!'

সকলেই উত্তপ্ত, ক্রোধোন্মত্ত। সুশৃঙ্খল ভাবে রণসজ্জা করা দুষ্কর। তবু দেখতে দেখতে, সহস্রাধিক যোদ্ধা, অশ্ব, রথ, অস্ত্রবাহী অশ্বতর প্রভৃতি প্রস্তুত হ'ল—প্রায় প্রহর কালের মধ্যেই।

বাসুদেবের কাছে এ সব সংবাদই পৌঁছচ্ছিল—যাতে দণ্ডে দণ্ডে নিয়মিতভাবে পৌঁছয় সে ব্যবস্থা তিনিই ক'রে রেখেছিলেন—কিন্তু তিনি বিচলিত হন নি, অথবা ক্রুদ্ধ আত্মীয়দের শান্ত করার চেষ্টা করেন নি।

বরং তাঁর অভ্যাসমতো আত্মবিশ্লেষণে নিমগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। এ কাজ কেন করলেন, এই প্রশ্নটাই তাঁর অন্তরসত্তাকে পীড়া দিচ্ছে। উত্তর একটা তো প্রস্তুতই আছে; আপাত-কারণ স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ। পাঞ্চাল, নাগরাজ্য, মণিপুর, মদ্র প্রভৃতি দেশ বিবাহ ও অন্যান্য আত্মীয়তাসূত্রে পাণ্ডবদের সঙ্গে বদ্ধ, এঁরা বিপক্ষে যেতে পারবে না। এদের সঙ্গে যদি বৃষ্ণি ও অন্ধক বীরগণও যুক্ত থাকেন তাহলে পাণ্ডবরা ভবিষ্যৎ অনিবার্য সংঘর্ষকালে খুব বেশী নিঃসঙ্গ হয়ে পড়বে না। এঁরা পক্ষে যদি নাও থাকেন, বিপক্ষে যেতে পারবেন না।

কিন্তু এই স্থূল কারণটা ছাড়া কি আর কিছু নেই?

কোথাও গোপনে কি অন্য কোন অভিপ্রায় কাজ করে নি?—একটা বিশেষ তথ্য: এই বিবাহ হলে দ্রৌপদীর মনে অর্জুনের প্রতি অতটা শ্রদ্ধাতদ্‌গত প্রেম, অত ঐকান্তিক আসক্তি থাকবে না, কিছুটা বরং বিদ্বেষ বা বিতৃষ্ণা কাজ করবে?

পাঞ্চালী, পাঞ্চালী! এ তুমি কি করলে! কেন বাসুদেবকে এমনভাবে সংশয়াচ্ছন্ন করছ বার বার!

এই কুটিল অভিপ্রায় যদি তাঁর মনে দেখা দিয়ে থাকে, তার প্রভাবেই ঐ আপাত-সৎ কারণটা খুঁজে নিয়ে থাকেন তো—সেটা তাঁর যথেষ্ট অন্যায় হয়েছে। সেক্ষেত্রে অর্জুনকে সুভদ্রা-হরণে প্ররোচিত করার কোন অধিকার নেই তাঁর।

সকলে প্রায় যখন যুদ্ধযাত্রায় প্রস্তুত, আরও যাঁরা পিছনে থাকলেন তাঁরা কীভাবে দলবদ্ধ হয়ে সৈন্যসামন্তসহ এই অগ্রগামী দলের সঙ্গে কোথায় যোগ দেবেন সে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে—তখন বলদেবেরই স্মরণ হ'ল কথাটা।

একটু যেন উদ্বিগ্নভাবেই প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ? শ্রীকৃষ্ণ কই? কই, তাঁকে তো দেখছি না! এ বিষয়ে তাঁর কি বক্তব্য সেটা তো আগে শোনা দরকার। তিনি কি এ সংবাদ পান নি!'

আসলে এই ভ্রাতাটি সম্বন্ধে চিরদিনই একটা অস্বস্তি আছে বলদেবের মনে। সাধারণত সকলে যেমন ভাবে, তাঁর অনুজের চিন্তা সে পথ ধরে যায় না,—এ উনি বরাবরই দেখেছেন। অন্য একটা যুক্তি প্রয়োগ ক'রে এদের সঙ্কল্প কার্যধারা সব গোলমাল ক'রে দেন। শেষ মুহূর্তে নিজেদেরই অপ্রতিভ হ'তে হয়। তাই বাসুদেবের সম্মতি ও সমর্থন না পেলে কোন কাজেই পুরোপুরি অগ্রসর হ'তে ভরসা পান না উনি।

বলদেবের উৎকণ্ঠা অপরের মনে সংক্রমিত হ'তেও বিলম্ব হ'ল না। সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকজন ছুটল বাসুদেবের গৃহে, তাঁকে সংবাদ দিতে।

যাদববীরগণ রণসজ্জায় সজ্জিত, রথ-অস্ত্রাদিও প্রস্তুত, এবার উনি তাঁদের নেতৃত্ব দেবেন, সেই অপেক্ষাই করছে সকলে।—তারা জানাল।

শ্রীকৃষ্ণ যেন বহু—বহু দূর থেকে তাঁর মন ও সচেতনতাকে আহরণ ক'রে নিয়ে এলেন।

জোর ক'রেই মনের ক্লিন্নতা, সূক্ষ্ম অন্যায়-বোধ দূর ক'রে সক্রিয় হয়ে উঠলেন।

বাইরে বেরিয়ে বলদেবের সামনে কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়িয়ে খুব নিরীহভাবেই প্রশ্ন করলেন, 'আর্য, আমাকে স্মরণ করেছেন?'

ক্রোধে ও উত্তেজনায় বলদেবের কণ্ঠ দিয়ে স্বরই বেরোতে চায় না কিছুক্ষণ। অবশেষে অতিকষ্টে উষ্মারুদ্ধকণ্ঠে বলে ওঠেন, 'স্মরণ করেছেন মানে! তুমি কি কিছু শোন নি নাকি! আর্যা পৃথার ঐ কুলাঙ্গার ছেলেটা কি করেছে শোন নি? তোমার তো একান্ত প্রিয় বন্ধু, তোমার নির্বন্ধাতিশয্যেই তাকে আমরা এত সম্মান করেছি, কিন্তু সে তার যোগ্য নয়। যার সদ্বংশে জন্ম সে অন্নগ্রহণ ক'রে ভোজনপাত্র চূর্ণ করে না—অন্নদাতার অনিষ্ট করে না। সুভদ্রাকে হরণ ক'রে সে আমাদের মাথায় পা দিয়েছে। অতি হীন সে, অতি নীচমনা। আমাদের এত সখ্য ও আতিথ্যের এই প্রতিদান! এ অপমান আমরা কখনও সহ্য করব না। আমি একাই প্রয়োজন হলে পৃথিবী কৌরবশূন্য করব।'

'অর্জুনের সুভদ্রা গ্রহণ করার কথা শুনেছি বৈকি। কিন্তু এর দ্বারা সে কী এমন দুষ্কর্ম বা অন্যায় করল সেইটেই তো বুঝতে পারছি না।'

'তার মানে!' একজন অন্ধক-বংশীয় প্রধান বলে উঠলেন, 'ও, তোমার যে প্রিয় বন্ধু, তুমি তার দোষ দেখবে কেন?'

'হ্যাঁ, সে আমার বন্ধু, কিন্তু সে-ই তার একমাত্র পরিচয় নয়। আর সে আমার বন্ধু এ পরিচয় দিতে এখনও আমি লজ্জাবোধ করছি না।' তারপর সেই ব্যক্তির দিকে পিছন ফিরে বলদেবকে সম্বোধন ক'রে বললেন, 'অর্জুন যে পাত্র হিসেবে খুবই যোগ্য তাতে আশা করি আপনিও দ্বিমত হবেন না। সে আমাদের পিতৃষ্বসার পুত্র, কুরুবংশের সন্তান। একা মহাদেব ছাড়া তার সমান রণদক্ষ বীর পৃথিবীতে নেই। আপনার প্রিয় ছাত্র দুর্যোধন পাণ্ডবদের প্রতি খুবই অবিচার ও অত্যাচার করেছে—তৎসত্ত্বেও আজ পাণ্ডবরা পূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত। তাদের নগর নির্মাণ, রাজ্যশাসন-পদ্ধতি, ন্যায়নীতি-নির্ণয় প্রভৃতি ইতিমধ্যেই অপর রাজারা অনুকরণ করতে আরম্ভ করেছেন। সম্প্রতি সে দ্বাদশ বর্ষ ধরে অতি স্বল্পসংখ্যক অনুচর নিয়ে সারা ভারত ভ্রমণ করেছে; চারিদিকে বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা সম্পর্ক স্থাপন, সৌহার্দ্য বিনিময় ক'রে তাদের রাজ্যের ভিত্তি আরও দৃঢ় করেছে। তার শৌর্য, অস্ত্র-শিক্ষা, চরিত্রের দৃঢ়তা ও বিনয় সারা ভারতখণ্ডের আদর্শ।'

বলদেব ইতিমধ্যেই বেশ খানিকটা নরম হয়েছেন। তিনি আমতা আমতা ক'রে বললেন, 'তা বেশ তো, তাই না হয় হ'ল—তাই বলে এমন ভাবে—বলপূর্বক হরণ করা—'

'ক্ষত্রিয়ের বিবাহার্থ কন্যা-হরণ করা কিছু অনিয়ম নয়, অন্যায়ও নয়। এমন অনেকেই করেছেন। কুরুপিতামহ মহাভাগ ভীষ্ম অপরের জন্যও করেছেন। তা ছাড়া আর কী ভাবেই বা সে এ কন্যাকে বিবাহ করতে পারত! আমরা স্বয়ম্বর ঘোষণা করি নি। কোন কোন কুলে পণপ্রথা প্রচলিত আছে, পাত্র সর্বোচ্চ পণ দিয়ে কন্যা গ্রহণ করে। আমরা তাতে প্রস্তুত নই, কন্যা বিক্রয় করব না। তিনিই বা ভিক্ষুকের মতো দান গ্রহণ করবেন কেন? এক্ষেত্রে যা প্রকৃষ্ট পন্থা—বীর্যশুল্কে কন্যা গ্রহণ করা—অর্জুন তাই করেছেন। আমি তো এর মধ্যে কোন অন্যায় কি অপরাধ দেখছি না!'

বলদেব হতভম্বের মতো কিছুক্ষণ ভাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে থেকে ওঁর মনের তল পাবার বৃথা চেষ্টা করে বললেন, 'তা তুমি কি করতে বলো এখন?'

'আমাদের উচিত দ্রুত দূত প্রেরণ ক'রে সাদরে সসম্মানে আমন্ত্রণ জানিয়ে

তাদের ফিরিয়ে আনা—এবং যথারীতি উভয়ের বিবাহের ব্যবস্থা করা। আমি ইতিমধ্যেই মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি প্রার্থনা ক'রে ইন্দ্রপ্রস্থে দূত পাঠিয়েছি, মনে হয় তাঁর কোন আপত্তি হবে না। তবে যতদিন না সে দূত ফিরে আসে —সেই কটা দিন অপেক্ষা করতে হবে—তার পূর্বে অনুষ্ঠান শেষ করা শোভন হবে না।'

'বেশ!...তাহ'লে সব কাজ তো তুমি ক'রেই রেখেছ! বৃথাই আমরা এতক্ষণ ধরে উত্তেজনা প্রকাশ করলাম।...অমন মাধ্বীর আমেজটা নষ্ট হয়ে গেল মিছিমিছি।'

বলদেব যেন নিশ্চিন্ত হয়ে পুনশ্চ মাধ্বী ও রেবতীর খোঁজে গেলেন। যাদব-প্রধানদের ক্ষোভ ও ক্রোধ সকলের হয়ত অত সহজে প্রশমিত হ'ল না—কিন্তু বাসুদেবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবে কে?

তবে অর্জুন ফিরে এসে বিনয়বচনে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে অনেকেই আবার সহজ হয়ে এলেন। দ্বারাবতী বসুদেবকন্যা সুভদ্রার আসন্ন বিবাহোৎসবের আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর পরে প্রিয়সন্দর্শন, প্রিয়মিলন।

দ্রৌপদী স্বাভাবিকভাবেই—অভিমানাহত অন্তরের যুক্তির বিরুদ্ধেই বোধ করি—উৎসুক, উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের সুগৌরী সুন্দরী ভগিনীকে বিবাহ ক'রে আনছেন—এ সংবাদ শোনার পর একটা অভিমান তো বোধ করবেনই। সুগভীর অভিমান। আর সে অভিমান যে অকারণ এমন অপবাদ তাঁকে কোন বিবাহিতা নারীই দিতে পারবেন না।

অর্জুন যে আর একটি বিবাহ করেছেন, ক্ষত্রিয় রাজবংশের কন্যা,—অনার্য-কন্যাদের মতো সুদূর শ্রুতিমাত্র-পরিচয় নয়, তারা এখানে আসবে না কোন-দিনই, এলেও ক্ষণিকের জন্য, এখানের জীবনযাত্রা রীতিনীতি ঐশ্বর্য-আড়ম্বরের সঙ্গে পরিচিত হবার কৌতূহলে, সে প্রবৃত্তির অবসানে ফিরে যাবে আবার—এ পরিচিত ঘরের কন্যা, আত্মীয়া, এ আসবে ঘর করতে এবং তাঁর মতো চার বৎসর অন্তর স্বামীসঙ্গলাভের ভাগ্য তার নয়, সে-ই প্রকৃত গৃহিণী হয়ে থাকবে, ঘরণী—সে আশঙ্কা যতই থাক—অভিমান এ কারণেও ততটা নয়। রাজবংশের বধূ কে আর কবে নিঃসপত্ন অধিকার পেয়েছে স্বামীর! বিশেষ যে স্ত্রী নিজেই সব সময় কাছে থাকতে পারবে না, তার তো এতটা আশা করাও অন্যায়।

আর সপত্নী তো ইতিপূর্বেই এ পুরে অনেক এসে গেছে।

না, সে জন্য নয়।

অভিমানের অন্য গূঢ় কারণ আছে। রমণীমনবেত্তার কাছে তা প্রত্যক্ষও। অর্জুন বিবাহের পরই যদি নববধূকে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে আসতেন—তা হলে অত দুঃখ বা আশঙ্কার (আশঙ্কাও, সে মনোভাব অস্বীকার করলে মিথ্যাচরণ হবে) কারণ থাকত না।

দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রান্ত হবার পরেও অর্জুন তাঁর কৃষ্ণাকে দেখার জন্য অধীর হয়ে উঠলেন না—দীর্ঘ ব্রহ্মচর্যব্রত পালনান্তে আসছেন, কৃষ্ণার সঙ্গে সাহচর্যে তাঁরই যে অগ্রাধিকার—সে বিষয়ে পাণ্ডব ভ্রাতারা সকলেই একমত, সেই মতোই নির্দেশ বা অনুমতি দেওয়া আছে দ্রৌপদীকে—এ তথ্য না জানার কথা নয় ফাল্গুনীর। তৎসত্ত্বেও পূর্ণ এক বৎসর কাল রৈবতক-প্রভাসের নির্জন প্রমোদাবাসে নবোঢ়া বধূকে নিয়েই মত্ত রইলেন—এ আচরণের অর্থ তাঁর কাছে তো বটেই—অন্য সকলের কাছেও স্পষ্ট। এখানে এলেই দ্রৌপদীর অগ্রাধিকার, অর্থাৎ অন্তত এক বৎসর কাল সুভদ্রাকে দূরে রাখতে হবে, হৃদয় থেকে না হলেও শয়নমন্দির থেকে—অন্তত নিত্য মিলনের সম্ভাবনা থাকবে না—সে বুঝেই কি অর্জুন এই কালহরণ করেন নি? দ্বাদশ বৎসর যে এর মধ্যেই অতিক্রান্ত হয়ে গেছে—সে হিসাব কৃষ্ণা স্ত্রীলোক হয়েও রেখেছেন, আর অর্জুন রাখতে পারেন নি? না এতটা ভ্রান্তি বা অনবধানতা বিশ্বাসযোগ্য নয়।...

অভিমানের আর একটি কারণ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের এক অকারণ, অপ্রত্যাশিত পত্রাঘাত।

পত্রটি এসেছে গোপনে। ব্যক্তিগত দূত এসে দ্রৌপদীর নিজের হাতে দিয়ে গেছে।

শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর বন্ধুরূপেই জানতেন দ্রৌপদী।

বন্ধুরও বেশী, স্নেহশীল অগ্রজরূপে। উপকারী শুভার্থীরূপে।

বিপদে সম্পদে যে সর্বদা কল্যাণ কামনা করে—এমন অগ্রজবন্ধু।

সেই বাসুদেব অর্জুনের এই বিবাহ সংঘটন করিয়েছেন—জেনে শুনে, সুপরিকল্পিত ভাবে দুজনের যোগাযোগ ঘটিয়েছেন—এই সংবাদটাই তো যথেষ্ট। একে বিশ্বাসঘাতকতা বলেই মনে হয়েছে দ্রৌপদীর। নিজের ভগ্নীকে গছিয়ে দিয়েছেন বাসুদেব—বন্ধুর ওপর অধিকতর প্রভাব বিস্তারের জন্য।

দ্রৌপদী বীর্যশুল্কে ক্রীতা স্ত্রী মাত্র—সুভদ্রা বন্ধুর ভগিনী, সুন্দরী, তার প্রতি

অর্জুনের অধিকতর আসক্তি স্বাভাবিক—এসব জেনেও অর্জুনকে এই বিবাহে প্ররোচিত করার একটিই মাত্র অর্থ দ্রৌপদীর কাছে—দ্রৌপদীর অনিষ্ট করা।

কিন্তু তাতেও যেন আশা মেটে নি বাসুদেবের।

তীব্র আঘাতের উপরও অপমান যোগ করেছেন। এই পত্রটি পাঠিয়েছেন। শুষ্ক পত্র। স্নেহসম্পর্কহীন।

সাধারণ কুশল প্রশ্নের পর সুভদ্রার্জুনের বিবাহবার্তা জানিয়েছেন বাসুদেব। তবে সে বিষয়ে তাঁর যে কিছুমাত্র সঙ্কোচ নেই সেটা স্পষ্ট। এই সংবাদ দ্রৌপদীর মনে ঈর্ষা ও সপত্নী সম্বন্ধে বিদ্বেষ উৎপাদন করেছে কিনা—সেই উদ্বেগই বেশী।

অর্জুনের মতো সর্বনারীকাম্য স্বামীর হৃদয়ে একাধিপত্য করবে—শ্রীকৃষ্ণ আশা করেন—এ অন্যায় মনোভাব দ্রৌপদীর নেই। কোন একমাত্র নারীর হৃদয়বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে পারে যে পুরুষ—বিধাতা অর্জুনকে সে সাধারণ পরিমাপে তৈরী করেন নি। এর ধাতু অন্য, সঞ্চও অন্য। দ্রৌপদী নিশ্চয় এতদিনে স্বামীর এই বিরাটত্ব অনন্যত্ব উপলব্ধি করেছেন—এবং স্বামী সম্বন্ধে প্রাকৃত নারীর মনোভাব পোষণ করেন না। শ্রীকৃষ্ণের ধারণা তিনি প্রসন্ন মনেই সুভদ্রাকে অনুজারূপে গ্রহণ করবেন। ইত্যাদি—

ক্ষোভে দুঃখে কৃষ্ণার চোখে জল এসে গেল।

কী মনে করেন বাসুদেব ওঁকে? কৃষ্ণাকে? বাসুদেব আর তাঁর প্রাণের বন্ধু অর্জুন?

ইতর, কলহপরায়ণা, মনোভাব-দমনে-অসমর্থা, অশিক্ষিতা গ্রাম্য নারী?

দেব-অংশে, দৈবকার্যে জন্ম দ্রৌপদীর, হোমাগ্নিতে তাঁর আবির্ভাব। জন্ম-শিক্ষিতা তিনি। মহিষী হবার জন্যই তিনি পৃথিবীতে এসেছেন। সামান্য সাত্বত-কন্যাকে তিনি ঈর্ষা করবেন!—যার পিতা সেদিন পর্যন্ত শ্যালকের কারাগারে বন্দী ছিল, বন্দীশালাতেই যে নির্লজ্জের মতো সন্তান উৎপাদন করেছে!···এ ঈর্ষা মনে জন্মাবার আগে যেন মৃত্যু হয় তাঁর!

কিন্তু, তিনি ভাবছেন, বাসুদেবের কথা।

বাসুদেব কেমন ক'রে তাঁকে এত হীন কল্পনা ক'রে নিজেই হীন ছোট হয়ে গেলেন!

* * *

এ পত্র প্রেরণ করা যে উচিত হয় নি তাঁর—সে বিষয়ে বাসুদেব কি কম সচেতন!

এ জন্য নিজের কাছেই লজ্জার সীমাপরিসীমা ছিল না যে তাঁর !

কিন্তু এ পত্র না পাঠালেও শান্তি পেতেন না তিনি। এ যে তাঁর এক ধরনের প্রায়শ্চিত্ত—সে কথা কাকে তিনি বোঝাবেন। দ্রৌপদীকে তো নয়ই —অপর কাউকেও এ রহস্যের কথা বলা যাবে না কোনদিন। সকল রহস্যের নিয়ন্তা অন্তর্যামীর যিনি অন্তরপুরুষ—তিনিই শুধু সাক্ষী রইলেন—নিজের মানবমানসের সামান্য সুগোপন একটা কুটিল চিন্তার আভাস পাওয়া মাত্র কী অব্যক্ত যন্ত্রণা শুরু হয়েছে তাঁর, কী গ্লানি !

অথচ সে কথাটাও হয়ত সম্পূর্ণ সত্য নয়, তাঁর এই বিবাহ-সংঘটনের একমাত্র কারণ নয়। তবু, নিত্যশুদ্ধ, ন্যায়-ধর্মের পূর্ণ মূর্তি তাঁর যে সত্তা—চিন্তাটা অনুমানের আকার ধারণ করার কলুষটুকুও সহ্য করতে পারেন নি। ···দ্রৌপদীর অপ্রীতিভাজন, তাঁর চোখে অর্জুনকে বিদ্বেষের পাত্র ক'রে তোলার জন্যই যদি এ আয়োজন হয়ে থাকে তাঁর—নিজেকেও দ্রৌপদীর কাছে হীন অবজ্ঞেয় করার জন্যই এ পত্র তাঁকে পাঠাতে হয়েছে, অনুতাপের মূল্য শোধ করতে—ঈষৎ আংশিক দণ্ড ভোগ করতে।

'কৃষ্ণা, তোমার চোখে আমি না কোনদিন তোমার স্বামীদের চেয়ে বড় হয়ে উঠি—এই আশীর্বাদই তোমাকে করছি !'

* * *

মনে মনে যতই নিজেকে নিরাসক্ত ও সাধারণ মানবোচিত মানঅভিমান বা প্রাকৃত ঈর্ষার উর্ধ্বে মনে ক'রে থাকুন দ্রৌপদী—অর্জুন সম্মুখে উপস্থিত হওয়া মাত্র তাঁর রাজ্যের সামান্যতম প্রজার স্ত্রীর মতোই অভিমানে ফেটে পড়লেন।

'আপনি—আপনি আবার এখানে কেন ?···কী আশ্চর্য, পুরাতন ছিন্ন পাদুকা আর পুরাতন প্রেমিকা—উভয়েই যে নূতনের আগমন মাত্রে অসহ্য হয়ে ওঠে এ কে না জানে! পুরাতন বন্ধনে নূতন দৃঢ়তর গ্রন্থি পড়লে পূর্বের গ্রন্থি শিথিল হয়ই। অন্যরকম যে আশা করে, সে মূর্খ। বৃথা চক্ষুলজ্জাতে প্রয়োজন নেই, আপনি আপনার সেই যাদবনন্দিনীর কাছেই যান, তাকে নিয়েই সুখে থাকুন—আমার বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই !'

স্ফুরিত ওষ্ঠাধর, বিদ্যুৎবর্ষী দৃষ্টি, মর্মভেদী কণ্ঠ ও তীব্র কঠিন বাক্য—সর্বোপরি 'আপনি' সম্বোধন!

অর্জুন দেবদানবগন্ধর্ব যে কোন শত্রুর সামনেই অকুতোভয়ে দাঁড়াতে পারেন—কিন্তু অভিমানাহত প্রেয়সীর সামনে দাঁড়াবার মতো সাহস তাঁর নেই।

এক্ষেত্রে কী করণীয়, কী করলে এ উষ্মা প্রশমিত হবে তাও জানেন না। এমন অভিজ্ঞতা পূর্বে কখনও হয় নি।···তিনি যৎপরোনাস্তি বিব্রত ও অপ্রতিভ ভাবে বার বার ক্ষমাপ্রার্থনা করতে লাগলেন। স্বকার্য-সমর্থনে কিছু কিছু যুক্তিপ্রয়োগের চেষ্টাও যে না করলেন তা নয়। কিন্তু আচরণে ও উচ্চারণে এমন অপটুত্ব ও অসংলগ্নতা প্রকাশ পেল যে অত দুঃখ ও ক্ষোভের মধ্যেও কৃষ্ণা তার কৌতুকরসটুকু উপভোগ না ক'রে পারলেন না। হয়ত কিছু আশ্বাসও লাভ করলেন।

অর্জুনও আর বেশীক্ষণ দাঁড়াতে সাহস করলেন না প্রিয়তমা স্ত্রীর সামনে। গলদ্‌ঘর্ম হয়ে আরক্ত মুখে চিন্তিত চিত্তে নিজের প্রাসাদে ফিরে গেলেন। সেখানে নববধূবেশে সজ্জিতা সুভদ্রা অপেক্ষা করছেন—স্বামীর সঙ্গে শ্বশ্রূমাতা ও জ্যেষ্ঠা যাতা এবং সপত্নীকে প্রণাম জানাতে যাবেন বলে প্রস্তুত হয়ে। তাঁকে কী বলবেন? দ্রৌপদীর কাছে নিয়ে গেলে হয়ত বিস্তর কটুবাক্য ও বক্রোক্তির সম্মুখীন হ'তে হবে; বাসুদেবের ভগ্নীর অবমাননার অর্থ সমগ্র যদুবংশের অপমান—তাঁদের মতের বিরুদ্ধে বিনা অনুমোদনে বিবাহ ক'রে এনেছেন, এক্ষেত্রে সুভদ্রাকে যদি এখানে বিদ্বেষের সম্মুখীন হ'তে হয় তো বন্ধুর বদলে বৃষ্ণি ও অন্ধকগণ শত্রুতেই পরিণত হবেন। এই সব নানা দুশ্চিন্তায় অর্জুনের অশান্তির অবধি রইল না।···

সে অশান্তি ও দুর্ভাবনা নিমেষে শতগুণ বেড়ে গেল যখন এসে দেখলেন, সুভদ্রা তাঁর রাজকুলকন্যা ও রাজবধূর মহার্ঘ্য বস্ত্র-অলঙ্কার খুলে ফেলে অতি দীনা গোপবধূর বেশ পরিধান করেছেন।

আশঙ্কায় কণ্ঠ শুষ্ক হয়ে গেল মহাধনুর্ধর ফাল্গুনীর। এ বেশ পরিবর্তনের একটিই অর্থ বুঝলেন তিনি—সুগভীর অভিমান। কিন্তু—দ্রৌপদীর বিরূপতার কথা ইতিমধ্যেই এঁকে কে জানিয়ে গেল? তবে কি কৃষ্ণা নিজেই এর মধ্যে কোন সহচরী বা দাসীকে দিয়ে অপমানকর কোন বাক্য বলে পাঠিয়েছেন?

প্রশ্ন করতেও সাহস হয় না। কোনমতে আড়ষ্ট কণ্ঠে শুধু উচ্চারণ করেন, 'এ—এসব কি ভদ্রা?'

কিন্তু সুভদ্রার অভয়ভরা মধুর হাসি যেন নিমেষে, শরতাবসানের উত্তর-সমীরের মতোই, সমস্ত চিন্তার মেঘ উড়িয়ে দিল। তিনি বরং ঈষৎ অপ্রতিভভাবেই হেসে বললেন, 'অগ্রজ শ্রীকৃষ্ণের এই রকমই নির্দেশ আছে। আমি যেন দীনহীন বেশে, সামান্যা গোয়ালিনীর মতো পট্টমহাদেবীকে প্রণাম করতে যাই—কোনরকম মহার্ঘ্য বেশভূষা বা আড়ম্বর না থাকে!'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে অর্জুন আরও একবার মনে মনে বাসুদেবের প্রজ্ঞাকে অভিনন্দন জানালেন।

তবু আশঙ্কা যে একেবারে দূরীভূত হ'ল তা নয়। নারীজাতির মনোভাবের অন্ত পাওয়া সম্ভব নয়, বাসুদেবের এই উক্তিই তাঁকে অনেকখানি দুর্বল ক'রে দিয়েছে।

অবশ্য কুন্তী সম্বন্ধে সংশয়ের কারণ ছিল না কখনই।

সেখানে সসমাদর অভ্যর্থনাই হবে, সে জানা কথা। কে জানে, কুন্তী হয়ত কৃষ্ণার একাধিপত্যে খুব তুষ্টও ছিলেন না; তিনি সাগ্রহে সস্নেহে একেবারে বুকে টেনে নিয়ে মস্তক আঘ্রাণ ও চুম্বন করে সুভদ্রাকে বার বার আশীর্বাদ করলেন। বরং এই নিরাড়ম্বর বেশের জন্যই অনুযোগ করতে লাগলেন।

কিন্তু—

এইবার দ্রৌপদী।

অরাতি-ত্রাস অর্জুন দুরু-দুরু বক্ষে শুষ্ককণ্ঠে যজ্ঞের অশ্বের মতো গিয়ে দাঁড়ালেন সুভদ্রাকে একটু এগিয়ে দিয়েই।

কিন্তু দেখা গেল অতটা আশঙ্কার কারণ ছিল না। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ-নির্দেশ সুভদ্রা ভাল ভাবেই স্মরণ রেখেছেন। তিনি জ্যেষ্ঠা যাতাকে প্রণাম ক'রে বললেন, 'আমি আপনার এক নূতন দাসী, আমাকে সেবার অধিকার দিয়ে কৃতার্থ করুন।'

দ্রৌপদীও ততক্ষণে আত্মস্থ হয়েছেন। হয়ত কিছু পূর্বের আচরণের জন্য লজ্জিতও; অর্জুনের ম্লান-মুখ অপরাধীসুলভ শঙ্কিত দৃষ্টিও তাঁকে পীড়া দিচ্ছিল। তিনি প্রণতা সুভদ্রাকে যথেষ্ট অবনত হবার আগেই জড়িয়ে তুলে নিয়ে গাঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ ক'রে বললেন, 'কল্যাণী, তোমার স্বামী নিঃসপত্ন হোন, তুমি সৌভাগ্যবতী হও।'

অর্জুন এতক্ষণে কিছুটা সুস্থ বোধ করলেন। কৃষ্ণার দিকে সকৃতজ্ঞ দৃষ্টি তুলে ভাল ক'রে চেয়ে দেখলেন, সেখানেও, দুটি পদ্মপলাশতুল্য আয়ত চোখের চাহনিতে—শুধু আশ্বাস বা ক্ষমাই ফুটে ওঠে নি, সে যেন দুটি পরিপূর্ণ সরোবরের মতোই প্রেমে ও কামনায় টলটল করছে।

॥ ১৪ ॥

ভগ্নীকে দরিদ্র গোপবধূর মতোই শ্বশুরালয়ে পাঠালেও—তার মর্যাদা বিস্মৃত হন নি শ্রীকৃষ্ণ। প্রাপ্যও না। ওদের সাড়ম্বরে পুর-প্রবেশ কৃষ্ণার প্রীতিপ্রদ হবে না জেনেই অমন একা নিরাড়ম্বর ভাবে তাঁর কাছে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন, সাধারণ গৃহস্থঘরের বধূর সঙ্গে যা লোকজন থাকে—তাও নিতে দেন নি।

উপহার-যৌতুকাদি এল—এঁরা এসে পৌঁছবার অল্প কদিন পরেই।

প্রজাসাধারণ বা রাজকর্মচারীরা যেমন প্রথমটার জন্যও প্রস্তুত ছিল না, তেমনি এই দ্বিতীয়টার জন্যও না।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়। অনেকের কাছে এটা বাড়াবাড়িই বোধ হ'ল। কেউ কেউ উপযাচক হয়ে কৃষ্ণাকে এসে বলে গেলেন যে, পাঞ্চালদের থেকে নিজেদের প্রাধান্য বা শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্যই যাদবদের এই মাত্রাধিক্য। যতটা বাড়াবাড়ি করছে, এতটা সাধ্য ওদের নেই। এমন ভাবে ঋণগ্রস্ত হয়ে ঐশ্বর্যের পরিচয় দেয় মূর্খরাই। প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য এ ব্যাকুলতা দেখে তাঁদের মনে করুণারই উদ্রেক হয়। ইত্যাদি—

যে অপরিমাণ যৌতুক-দ্রব্যাদি নিয়ে এলেন ওঁরা, তার বর্ণনা দেওয়া আমাদের দুঃসাধ্য। ব্যাসদেব বলেছেন :

"মহাযশস্বী শ্রীমান কমললোচন কৃষ্ণ বৈবাহিক রীতিক্রমে বর ও বরপক্ষীয়গণকে উত্তম উত্তম ধন প্রদান করিলেন এবং সুভদ্রাকে জ্ঞাতিদেয় যৌতুক-স্বরূপ বহু ধন দিলেন। তিনি পাণ্ডবদিগকে সুশিক্ষিত নিপুণ-সারথিসহ অশ্বচতুষ্টয়যুক্ত কিঙ্কিণী-জাল-মালাবিভূষিত সুবর্ণমণ্ডিত সহস্র রথ ঃ মথুরা-প্রদেশীয় তেজস্বী বহুদুগ্ধপ্রদ অযুত গো ; চন্দ্রবর্ণ বিশুদ্ধ হেম-ভূষিত সহস্র ঘোটকী ; কৃষ্ণকেশরযুক্ত শ্বেতবর্ণ, বায়ুসম-দ্রুতগামী সুশিক্ষিত সহস্র সজ্জ্য অশ্বতরী ; স্নানপানোৎসবে প্রয়োগ-নিপুণা পরিচর্যাদক্ষা, বয়ঃপ্রাপ্তা, গৌরবর্ণা, সুবেশা, সুকান্তিমতী, সুঅলঙ্কৃতা, কণ্ঠদেশে-শতসুবর্ণ-হার-সুশোভিতা সহস্র পরিচারিণী ; বাহ্লিক দেশীয় পৃষ্ঠবাহ শতসহস্র অশ্ব ; নানাবিধ মহার্ঘ বস্ত্র ও কম্বল প্রভৃতি বিবিধ সামগ্রী প্রীতমনে প্রদান করিলেন এবং সুভদ্রাকে মনুষ্যের বহনীয় দশভার বিশুদ্ধ ও বিমিশ্র দুই প্রকার উৎকৃষ্ট সুবর্ণ যৌতুক স্বরূপ দিলেন।

"হলধর রাম প্রীতিযুক্ত হইয়া বিবাহোপলক্ষে সম্বন্ধের গৌরববৃদ্ধি নিমিত্ত ত্রিবিধমদস্রাবীকারী, গিরিশৃঙ্গসদৃশ, সাহসী, সমরে অনিবর্তী, হেমমালা-বিভূষিত নিনাদপটু-ঘণ্টাবিলম্বিত, উপবেশন পর্যঙ্কযুক্ত মনোহর সহস্র মাতঙ্গী

হস্তিপকের সহিত ধনঞ্জয়কে উপহার দিলেন। বস্ত্রকম্বলাদি-রূপ-ফেনযুক্ত মহাগজরূপ মহাগ্রাহাকুলিত ও পতাকা-রূপ-শৈবাল সমাকুল সেই মহাধনরত্ন-সমূহরূপ জলপ্রবাহ বিস্তীর্ণ হইয়া পাণ্ডুসাগরে প্রবেশ করিয়া পরিপূর্ণ করাতে তাহা শত্রুগণের শোকাবহ হইয়া উঠিল।"*

এছাড়াও বৃষ্ণি, ভোজ ও অন্ধক জ্ঞাতি ও আত্মীয়রা এনেছিলেন অপরিমিত যৌতুক।

"ধীমান মহাকীর্তিমান দানশীল অক্রূর, বৃষ্ণি-সেনাপতি মহাতেজস্বী অরিন্দম অনাধৃষ্টি, অতিতেজস্বী উদ্ধব, সাক্ষাৎ বৃহস্পতিশিষ্য মহানুভব সত্যক, সাত্যকি, সাত্বত, কৃতবর্মা, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, নিশঠ, শঙ্কু, চারুদেষ্ণ, ঝিল্লী, বিপৃথু, সারণ, গদ—ইহারা এবং আর আর অনেকেই বহুবিধ বহু পরিমিত যৌতুক লইয়া আগমন করিলেন।"

এরকম সমারোহ, এত ধনরত্ন ইন্দ্রপ্রস্থের প্রজাসাধারণ কখনও দেখেন নি, তাঁরা বিহ্বল হয়ে পড়বেন—এতে আর আশ্চর্য কি?

বলা বাহুল্য, পাণ্ডবপক্ষেও এর যোগ্য সমাদর, আদর-আপ্যায়ন, আতিথ্য বা প্রতিসৌজন্যের ত্রুটি ঘটল না।

উৎকৃষ্ট পানভোজন ও বিশ্রাম-ব্যবস্থা আতিথেয়তার প্রধান অঙ্গ, সে ব্যবস্থার ভার নিলেন স্বয়ং ভীমসেন। এত অল্পকাল মধ্যে এতগুলি লোকের উপযুক্ত রসনাতৃপ্তিকর, সুস্বাদু, নানা রসের খাদ্য, সুমিষ্ট ফল ও পানীয়, উৎকৃষ্ট সুরা, সুকোমল শয্যা, উত্তম গৃহ—অভাবে সুপ্রশস্ত, সুসজ্জিত বস্ত্রাবাস প্রভৃতির সুব্যবস্থা ভীমসেন ছাড়া আর কারও পক্ষে সম্ভব হ'ত না। এ ছাড়াও অন্য আয়োজন আছে। সে ভার পড়ল নকুল ও সহদেবের উপর। অর্জুন ওপক্ষের জামাতা—এই কারণেই ঈষৎ লজ্জিত ভাবে তিনি কতকটা উদাসীন রইলেন। তবে তাতে কোন ক্ষতি হ'ল না। নকুল-সহদেবও যে যথেষ্ট করিৎকর্মা অচিরেই তা প্রমাণিত হ'ল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সুপটু নটনটী নর্তক-নর্তকী গায়ক-গায়িকা দ্বারা নৃত্যগীত, অভিনয়—রুচিভেদে মৃগয়া প্রভৃতি মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা হয়ে গেল। ব্যক্তিগত সেবার জন্য অসংখ্য প্রিয়দর্শন দক্ষ ভৃত্য ও সুন্দরী পরিচারিকাও নিযুক্ত হ'ল।

বয়স-ভেদে চিত্ত-বিনোদনের ভিন্ন ভিন্ন আয়োজন দরকার।

কেউ কেউ অন্তরঙ্গ-ক্রীড়ামোদী, তাঁদের জন্য অক্ষবিদ ও মল্লবীর আনানো

* অনুবাদগুলি বর্ধমান মহারাজার সংস্করণ মহাভারত থেকে গৃহীত।

হ'ল মদ্র দেশ থেকে। কেউ বা—অক্রূর প্রভৃতি—সৎপ্রসঙ্গ আলোচনায় উৎসুক। স্বয়ং যুধিষ্ঠির তাঁদের সঙ্গদান করতে লাগলেন। দু'চারজন দর্শন-শাস্ত্রপারঙ্গম পণ্ডিতকে আমন্ত্রণ করে আনা হ'ল। অর্থাৎ, কোন দিকেই কারও কোন অসন্তোষ বা অভাববোধ না থাকে—পাণ্ডব-ভ্রাতারা সেজন্য সদাসর্বদা সজাগ ও সতর্ক হয়ে রইলেন।

কুটুম্বরা অতিথি হয়ে এলে সদাই হোতার ত্রুটি-সন্ধানের চেষ্টা করেন। সকলের পক্ষে না হলেও অনেকের পক্ষেই এ সত্য প্রযোজ্য। যাদব-দলেও সে রকম লোকের অভাব ছিল না। কিন্তু বহু চেষ্টা ক'রেও আদর-আপ্যায়ন-ব্যবস্থার কোন ছিদ্র খুঁজে না পেয়ে তাঁরা ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। শেষে "আতিথ্যের আয়োজন বড় বেশী, এত উত্তম ভোজনে ও উৎকৃষ্ট সুরাপানে আমাদের শরীর অসুস্থ হয়ে পড়বে" এই অজুহাতে গৃহপ্রত্যাগমনের জন্য ব্যস্ত হলেন। যাঁরা ছিদ্রান্বেষী নন, তাঁরা দায়িত্বশীল ব্যক্তি, তাঁরাও 'বহুদিন দেশ ছেড়ে থাকা উচিত নয়' এই বোধে দ্বারকা প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রার্থনা করলেন।

পাণ্ডবরাও—বলা অধিক—অন্তরে অন্তরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কিছু শুষ্ক সৌজন্যের পর সে অনুমতি দিলেন—কিন্তু বাসুদেবকে ছাড়তে রাজী হলেন না। সকলে সম্মিলিতভাবে ওঁকে অনুরোধ জানালেন আর কিছু দিন ইন্দ্রপ্রস্থে অতিবাহিত করার জন্য।

কে জানে, হয়ত বাসুদেবেরও সেই উদ্দেশ্য ছিল, তিনি সহজেই সম্মত হয়ে গেলেন। সামান্য-সংখ্যক কিছু দেহরক্ষী ও অনুচর নিজের জন্য রেখে বাকী সকলকেই দ্বারকার দিকে রওনা ক'রে দিলেন। সাবধানে—মগধাধিপতি জরাসন্ধর আশ্রিত ও অনুরক্ত দেশগুলি বাঁচিয়ে—বিনয়ে সৌজন্যে মিত্র-রাজ্যের সঙ্গে সৌহার্দ্য দৃঢ়তর ক'রে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন।

অতঃপর পানভোজন, মৃগয়া ও রাত্রে নৃত্যগীতাদি উপভোগ, এ ছাড়া কোন কাজ রইল না। কদিনে অতিথি নিয়ে ব্যস্ত থাকায় রাজকার্যে অনেক ক্ষতি হয়েছে, পাণ্ডবরা এখন সেই সব অবহেলিত অবশ্য-করণীয় কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। যুধিষ্ঠির শুধু অর্জুনকে নির্দেশ দিলেন, 'তুমি সর্বদা বাসুদেবের সঙ্গে থাকো, তাঁকে সাহচর্য ও সেবায় তুষ্ট করো। আপাতত কোন শত্রুর আক্রমণাশঙ্কা দেখা যাচ্ছে না, সুতরাং তোমার যা দায়িত্ব—প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, তার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই। বাসুদেবের মনোরঞ্জনেই তুমি

পূর্ণ মনোনিয়োগ করো।'

বাসুদেব যেন এই ঢালা অনুমতিরই অপেক্ষা করছিলেন। তিনি অর্জুনকে নিয়ে নগরসীমার বাইরে যমুনাতীরে চলে গেলেন। তখন গ্রীষ্মকাল সমাসন্ন, জলবিহারে সকলেই উৎসুক। কিছু পুরনারীও সঙ্গে ছিলেন, আহারাদি ও অন্যান্য সেবার কোন অসুবিধা হ'ল না। কিন্তু দেখা গেল বাসুদেবের গৃহ অপেক্ষা অরণ্যেই প্রীতি বেশী—তিনি অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে প্রধানত নদীতীরের বনময় অঞ্চলে মৃগ ও বরাহ শিকার ক'রেই বেড়াতে লাগলেন।

বিলাসে ও ব্যসনে স্বচ্ছন্দ গতিতে কেটে যাচ্ছিল দিনগুলি, নদী-স্রোতের মতোই। উচ্ছল হয়ে উঠেছেন পুরনারীরাও। তাঁদের প্রমত্ত আচরণ দেখে মনে হচ্ছিল আনন্দই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য, ব্যসনই ইষ্ট।

কিন্তু সুখ বা ব্যসন বাসুদেবের যে একমাত্র লক্ষ্য নয় এখানে আসার—তা অর্জুনও বুঝেছিলেন, শুধু প্রধান উদ্দেশ্যটা কি—সেটাই ধরতে পারছিলেন না।

কয়েক দিন পরেই জানা গেল অবশ্য।

সহসাই একদিন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্বভাবানুযায়ী প্রত্যূষে উঠে একা খাণ্ডব-অরণ্যে চলে গেলেন।

অর্জুন এতদিনে বাসুদেবের এ আচরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তাই তিনি এবার আর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন না, কি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন না। শান্তমনে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাগমনের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

হয়ত দ্রৌপদী প্রভৃতির প্রমোদোৎসবের ঈষৎ যতিভঙ্গ হ'ল। কিন্তু বাসুদেব যে কোন গুরুতর কারণে এই ভাবে আত্মগোপন করেছেন—এমন সন্দেহ কারও হ'ল না।

আসলে বাসুদেব এভাবে একা গভীর অরণ্যে গিয়ে কি করেন সে বিষয়ে কারও কোন ধারণা নেই। অর্জুনেরও না। তিনি কখনও ভাবেন শ্রীকৃষ্ণ নির্জনে ধ্যানস্থ থাকেন কোথাও, কখনও মনে হয় শুধুই ঐ বনানীর শান্ত গম্ভীর সৌন্দর্য উপভোগ করেন। আবার মনে হয় উনি একা জনহীন স্থানে বসে তাঁর কার্য ও কর্তব্য সম্বন্ধেই চিন্তা করেন। দু'একবার প্রশ্ন করতে গেছেন—কিন্তু বিশেষ সদুত্তর পান নি, তাতেই মনে হয়েছে—এ বিষয়ে কৌতূহল প্রকাশ বাসুদেব পছন্দ করেন না। তাই আর অধিক প্রশ্ন করতে সাহস হয় নি।

তবে যতই কল্পনা বা ধারণা করুন, বাসুদেবের প্রয়োজন ও কার্য-কারণ সম্বন্ধে অভ্রান্ত অনুমান অর্জুনের সাধ্যাতীত। এমনিতেই ওঁর চিন্তার বুদ্ধির

তল পাওয়া যায় না—এই খাণ্ডব অরণ্যে গিয়ে উনি যা করেন তা যে কোন মানুষেরই কল্পনার অতীত। এমন কি অর্জুনেরও।

সেদিন প্রত্যাবর্তনে বেশ একটু বিলম্ব হ'ল।

তার কারণ—সেদিনও উনি খাণ্ডবপ্রস্থে নিষাদ কীলকেরই অনুসন্ধানে গিয়েছিলেন। যে সব স্থানে তার থাকার কথা—যে সব স্থানে সে থাকে—তার সবগুলিই দেখেছেন বাসুদেব কিন্তু তাকে পান নি। এ অনুপস্থিতি একটু দুর্জ্ঞেয়ই বোধ হয়েছে বাসুদেবের। এখন তিনি নিয়মিতভাবে কীলককে বৃত্তি দেন, তার সুরাপানের মূল্য যোগান। শর্ত—প্রতি মাসের পূর্ণিমা ও কৃষ্ণা দ্বাদশীতে সে এই অরণ্যে উপস্থিত থাকবে, যদি বাসুদেবের কোন প্রয়োজন পড়ে—তিনি নিজে এসে অথবা কোন বিশ্বস্ত অনুচরের দ্বারা যোগাযোগ করবেন। অনুচরের ক্ষেত্রে কী অভিজ্ঞান থাকবে, সে সম্বন্ধেও পূর্ব নির্দেশ দেওয়া আছে—যাতে সে অভিজ্ঞান দেখা মাত্র বাসুদেবের প্রেরিত লোক বলে বুঝতে পারে কীলক।

ইতিমধ্যে এমন প্রয়োজন পড়েছেও। বাসুদেব ঠিক ঠিক তাকে খুঁজে পেয়েছেন। কতকগুলো বিশেষ স্থান ঠিক করা আছে—তারই কোনটাতে কীলক থাকবে। থাকেও সে। আজই তার ব্যতিক্রম দেখছেন।

প্রায় সারা দিনই ঘুরলেন শ্রীকৃষ্ণ—সেই জনহীন বিষধর-সরীসৃপ অধ্যুষিত হিংস্র-পশু-সমাকীর্ণ অরণ্য দেশে। এদের কাউকেই ভয় নেই তাঁর। আজ পর্যন্ত কোন ঋক্ষ কি শার্দুল তাঁকে আক্রমণ করে নি, শঙ্খচূড়ের উদ্যত ফণা নেমে গেছে, তাঁর দৃষ্টি পড়া মাত্র। না, তিনি চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন অন্য কারণে। বিশেষ প্রয়োজন আজ কীলককে—তাকে যথাস্থানে না দেখতে পেয়ে বিরক্তও।

অবশেষে প্রায় যখন ওকে খুঁজে পাবার আশা বিসর্জন দিয়ে ফিরে আসছেন, বনস্থলীর শুষ্ক পত্ররাশিতে দ্রুত পদক্ষেপের শব্দ উঠল। অভ্রান্ত অনুমানে ফিরে দাঁড়ালেন বাসুদেব।

হ্যাঁ, কীলকই। কীলক সত্যিই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে। তার সর্বাঙ্গ ধূলিধূসর, দেহ ঘর্মাক্ত—ঘর্মের সঙ্গে ধূলি মিশে কর্দমাক্ত বলাই উচিত, দৃষ্টি ক্লান্ত, মদ্যপানে আরক্তও।

বাসুদেব ভ্রূ-কুঞ্চিত করলেন! তবে কি লোকটা মদ্যপান ও আনুষঙ্গিক কদর্য ব্যসনেই মত্ত ছিল, স্থান কাল তিথির হিসেব এবং তার অবশ্য-পালনীয় শর্ত মনে রাখে নি, স্মরণে পড়ে নি যে আজই কৃষ্ণা দ্বাদশী?

বোধ হয় তাঁর ভ্রূকুটির অর্থ কীলকও বুঝল। সেও রূঢ় কণ্ঠে উত্তর দিল, 'না

হে, তা নয়। তোমারই কাজ করছিলাম। বাড়তি কাজ। তুমি বলো নি—বলার সময় হয় নি—তবু তোমার কাজ মনে করেই করছিলাম। নইলে, যতই নেশা করি, এসব হিসেবে আমার ভুল হয় না।'

'আমার কাজ? কী কাজ?' বাসুদেবের প্রশান্তি ফিরে এসেছে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই।

'হস্তিনাপুরে গেছলাম মাংস বেচতে। সেখানে দেখলাম বেশ একটু গরম ভাব। বাড়তি লোকজনের আমদানি। বাইরের লোক এসেছে বলেই জিনিসপত্রের দরও চড়া, মাংস দ্বিগুণ দামে কিনতে চাইছে। কী ব্যাপার—শুনলাম দুর্যোধনের আমন্ত্রণে চেদী ও মগধ থেকে বিশেষ রাজদূত এসেছে। তাঁদেরই দেহরক্ষী, পরিচারক ইত্যাদিতে এত ভিড়। সহসা এদের কেন ডাকতে হ'ল—ভাবলাম। মনে পড়ল জরাসন্ধ শিশুপাল দুজনেই তোমার শত্রু—হ্যাঁ, অনেকদিন পথে পথে ঘুরছি, এসব খবর জানতে বাকী নেই। আজ কেউ তোমার কাছ থেকে আসতে পারে, তুমিও এখানে আছ জানি—তোমাকে দেবার মতো কোন খবর আনতে পারি কিনা ভেবে ওদের দলে মিশে গেলাম। দেহরক্ষী সৈন্যরা নিজেদের খুব বড়-কেউ ভাবে—আমার এই দেশী-মদের গন্ধে নাক তুলবে হয়ত—পাচক পরিচারক গাত্রসংবাহকরা তা করবে না। আর যত গোপন-কথা মন্ত্রণাই হোক না কেন—দাসদাসীর অগোচর থাকে না। সেই ভেবেই দুদিন ধরে যেচে তাদের মদ খাওয়ালুম, মাংসর চড়া দাম পেয়েছি, তাতে ক্ষতিও হয় নি—তাতেই এত দেরি, দ্বিতীয় প্রহরের আগে যাত্রা শুরু করতেই পারলুম না, তবু তো সারা পথ দৌড়েই আসছি—'

'তা বার্তাটা কি?'

'দুর্যোধন চায়, জরাসন্ধ তার দলবল বন্ধুবান্ধব নিয়ে এসে এদের এই নতুন রাজধানী ছারখার করুক; পাণ্ডবদের বধ করুক। এ রাজ্য সে জয় করে দুর্যোধনকে দিলে সে তখন জরাসন্ধকে সাহায্য করবে—তোমাকে বধ করতে, তোমার বংশ লোপ করতে।'

বাসুদেব হাসলেন।

ঈর্ষায় উন্মাদ হয়ে গিয়ে শিশুত্ব প্রাপ্ত হয়েছে দুর্যোধন। তা নইলে এমন অবাস্তব কথা ভাবত না, ওদের কাছে ও প্রস্তাব করত না। সে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হতে পারে—জরাসন্ধ শিশুপাল জ্ঞান হারান নি নিশ্চয়। পাণ্ডবদের আক্রমণ করলে বৃষ্ণি অন্ধক পাঞ্চালরা দর্শক মাত্র হয়ে থাকবে না। সে এক ঘোরতর সংগ্রাম বাধবে। এত শক্তিই যদি থাকবে—জরাসন্ধের লক্ষ্য যে বৈরী, সেই

যাদবদেরই তো ধ্বংস করতে পারত। সদ্য কংস-শাসন-মুক্ত দীর্ঘদিনের পরাধীনতায় ক্লৈব্যাভ্যস্ত যাদবদের আক্রমণ করেই সে পরাজিত পদানত করতে পারে নি, শ্রীকৃষ্ণ বলদেবকে বধ করা সম্ভব হয় নি—বার বার মথুরা অবরোধ করেছেন, সহস্র সহস্র সৈনিক নিহত হয়েছে সে চেষ্টায়। এখন সমুদ্র পার হয়ে সেই সুদূর পশ্চিম-দেশে গিয়ে যাদবদলন কতটা সম্ভব হবে—সেটুকু বোঝার মতো বুদ্ধি জরাসন্ধের আছে নিশ্চয়। নইলে তিনি আজ উত্তর ভারতের রাজচক্রবর্তী বলে স্বীকৃত হতেন না। কন্যাদের বৈধব্যের জ্বালা, তাদের হাহাকার সহ্য করতে না পেরেই মথুরায় হানা দিয়েছিলেন, তাছাড়া—বোধ হয় যাদবদের কষ্ট সহ্য করার শক্তি কতটা তাও অনুমান করতে পারেন নি। যাই হোক, তাতেই শিক্ষালাভ হয়েছে আরও—এখন দুর্যোধনের কণ্টক দূর করতে তিনি ওদের সঙ্গে—পাণ্ডবদের আক্রমণ করলে যাদবরা দর্শক মাত্র হয়ে থাকবে না এ তো জানাই—প্রচণ্ড যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বেন, এত নির্বোধ তিনি নন।

তবু, আর বিলম্ব করাও উচিত নয়।

যে উদ্দেশ্যে এসেছেন সে কাজ ত্বরান্বিত করাই বরং প্রয়োজন এখন।

কীলক ঈষৎ কুণ্ঠিত অপ্রতিভ ভাবেই বলছে শুনলেন উনি, 'ওদের—মানে জরাসন্ধদের কী যুক্তি হবে তা অবশ্য জানা গেল না। এরা এই বার্তা নিয়ে দেশে ফিরে গেলে তারা বিবেচনা করে দেখবে।'

'তারা কি স্থির করবে তা আমি জানি, সে জন্য চিন্তা নেই। শোন, তোমাকে যে কাজের জন্য ডেকেছি। দানব-স্থপতি ময়ের কোন সন্ধান পেলে?'

'না। নাগরাজ তক্ষকের ভয়ে সে এমনই আত্মগোপন করেছে যে, কিছুতেই তাকে খুঁজে বার করতে পারছি না। তবে সে এই অরণ্যেই যে আছে—এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।'

'আশ্চর্য! এই অরণ্যেই সে আছে—তবু তার সন্ধান পেলে না?'

'না। ওরা অনেক রকম মায়া জানে, ছদ্মবেশ ধারণ করা এমন কোন কঠিন কাজ নয় ওদের কাছে। দীর্ঘকাল অনাহারে থাকতে পারে। যে যেখানে আছে—সেখান থেকে যদি বার না হয় ধরব কী ক'রে?'

'তা হলে কী কর্তব্য মনে করো?'

'কে জানে, কোন উপায় তো মনে পড়ছে না।'

'এই বনে আছে—সে বিষয়ে তো কোন সন্দেহ নেই?'

'না। সেটা আমি নিশ্চিত জানি। সব দিক দেখে সব রকম ভাবে সে সংবাদ নিয়েছি। এই বনে তাকে ঢুকতে দেখেছে অনেকেই, বেরোতে দেখে

নি একজনও। তার বাড়িতে খবর নিয়েছি, সমস্ত আত্মীয়-বান্ধবের কাছে—কোথাও সে যায় নি।'

'তা হলে এক কাজ করো। প্রয়োজন-মতো কিছু বিশ্বস্ত সহকারী সংগ্রহ করতে পারবে? অবশ্যই তাদের পারিশ্রমিক দেব, অকৃপণ হাতেই দেব।'

'কাজটা কি?'

'এই খাণ্ডবদাবে অগ্নিসংযোগ করতে হবে। চারিদিক ঘিরে সে বৃত্তাগ্নি জ্বলবে, কোথাও না ছেদ থাকে। শুধু একটিমাত্র পথ থাকবে মুক্ত, সে পথ আমি ও অর্জুন পাহারা দেব। দানব-স্থপতি যত বড় মায়াধর ঐন্দ্রজালিকই হোক, পাবক তাকে দগ্ধ করবে না—তা সম্ভব নয়।'

'কিন্তু ঠাকুর, ওরা নানা ছদ্মবেশ ধারণ করতে পারে, তুমি চিনবে কি ক'রে।'

'কোন প্রাণীই যদি পরিত্রাণ না পায় তো সে পালাবে কী ক'রে? এটুকু সে বুঝবে যে স্ব-রূপেই বরং নিরাপদ, তাকে বধ করার কোন হেতু নেই।'

'কিন্তু এত বড় বনস্থলীতে আগুন লাগাবো, লোকে রাগ করবে না? নানা কথা জিজ্ঞাসা করবে না?'

'কী আর জিজ্ঞাসা করবে! দাবানল কিছু অপ্রাকৃত ঘটনা নয়। রটনা করো যে যজ্ঞে নিরন্তর হবি পান করে অগ্নির অগ্নিমান্দ্য হয়েছে, তাই তিনি মাংস ভোজন করে রসনাকে প্রকৃতিস্থ করার জন্য এই অরণ্য আহারে প্রবৃত্ত হয়েছেন।'

'বেশ, তাই না হয় বলব। কিন্তু চারিদিক থেকে এত বড় বনে আগুন লাগানো—অনেক লোক চাই; সে লোক সংগ্রহ করতে কয়েক দিন সময় লাগবে!'

'তা হোক, কত দিন আর লাগবে? এর মধ্যে একটু নজর রেখো, দানব না পালায়। আগামী শুক্লা একাদশী দিন স্থির রইল। যদি সমগ্র বনস্থলী দাহ শেষ হতে সারা দিনেও না কুলোয়—প্রথম রাত্রে জ্যোৎস্না পাওয়াই বাঞ্ছনীয়।...কাল তুমি এখানে অপেক্ষা ক'রো, আমি এক সহস্র নিষ্ক পাঠাবো, আশা করি তাতেই কাজ চলে যাবে।'

কীলকের দৃষ্টি নিমেষে লুব্ধ হয়ে উঠল অর্থের পরিমাণ শুনে। সে সবেগে বার কতক ঘাড় নাড়ল।

তারপর, বাসুদেব ফিরে যেতে উদ্যত হয়েছেন—এমন সময় কি ভেবে বললে, 'শোন—'

আরক্ত চক্ষু দুটির দৃষ্টি কঠিন ও কুটিল হয়ে উঠল কীলকের। সে বলল,

'তুমি কি বলো আমি বুঝি না। বিশ্বাসও হয় না, আবার অবিশ্বাসও করতে পারি না তোমাকে।...তুমি যে বলো এখন পাণ্ডবদের সাহায্য ক'রে গেলেই আমার প্রতিহিংসার পথ সুগম হবে—এ কি ঠিক?'

'আমি মিথ্যা বলি না নিষাদ।' শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দেন শ্রীকৃষ্ণ। সহজ স্বাভাবিক স্বর—কিন্তু মনে হয় যে অরণ্যের বহু দূর পর্যন্ত এক গম্ভীর লয়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।

'কে জানে! তবু বিশ্বাস না ক'রে যখন কোন উপায় নেই, তখন করলুম। দ্যাখো ওই বনে দেব-দত্ত এক বিরাট ধনু আছে, গণ্ডকের মেরুদণ্ডে তৈরী—আজ পর্যন্ত এমন অস্ত্র নাকি তৈরীই হয় নি পৃথিবীতে—যা ঐ ধনুকে কাটতে পারে। ঐ ধনু, প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, বিশাল এক গদা আর দুটি রথও লুকানো আছে। কেউ জানে না এমন ভাবে গোপন করা আছে। সেগুলি যদি সরিয়ে না নাও, আগুনে নষ্ট হবে, তোমরা পেলে তোমাদের শক্তির সীমা থাকবে না, অজেয় হবে। নেবে তোমরা?'

বাসুদেবের মুখভাবে লোভ বা অশোভন ব্যগ্রতা প্রকাশ পেল না বটে—তবে দৃষ্টি তাঁরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, 'হ্যাঁ, শুনেছি। গাণ্ডীব ধনু, —কপিধ্বজ রথ, কৌমুদকী গদা—এদের কথা শুনেছি। কোথায় আছে সন্ধান পাই নি। চলো, এখনই দেখে আসি। তেমন বুঝলে আগামী কালই সেগুলি সরিয়ে নেব।...আর, তোমার এই আনুকূল্যও আমি স্মরণ রাখব নিষাদ, তোমার যা আকূতি তা পূর্ণ হবে, প্রতিশোধলালসা চরিতার্থ হবে। পাণ্ডবদের পুত্রনাশ বংশনাশ তুমি দেখতে পাবে, তোমাকে সত্যই বলছি।'*

---

* কীলক নিষাদের সঙ্গে বাসুদেবের প্রথম সাক্ষাৎকারের পরিচ্ছেদটি পাঠ ক'রে কিছুদিন পূর্বে পণ্ডিত-প্রবর পরমবৈষ্ণব হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন মহাশয় আমাকে সস্নেহ তিরস্কার ও অনুযোগ করে চিঠি দিয়েছিলেন, আমি নিষাদের মুখে ভাল শুদ্ধ ভাষা বসিয়েছি বলে। কী ধরনের ভাষায় মহাভারতের যুগের অনার্য নিষাদেরা কথা কইত—তা আমরা কেউই জানি না। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে নমুনা দিয়েছিলেন, তা বীরভূম অঞ্চলের সাঁওতালী ভাষা। সেটা দিতে ঠিক মন সরে নি। গ্রীক ভাষার কাব্য যখন ইংরেজীতে অনুবাদ হয়, তখন তা সবই ইংরেজীতে লেখা হয়। মহাভারতের সবটাই, কথোপকথন সুদ্ধ, সংস্কৃতে লেখা, তার অনুবাদও যা হয়েছে—বর্ধমানরাজ বা কালীপ্রসন্ন সিংহ সংস্করণে তা আগাগোড়া এক ধরনের সাধু ভাষাতে লেখা। কৃত্তিবাসী রামায়ণে কিছু কিছু প্রাকৃত ভাষা আছে বটে—অঙ্গদ-রায়বার পর্বে বিশেষ করে—কিন্তু সেও কি রামায়ণের ভাষা? ঠিক কীলকের মুখে মানায় এমন প্রাকৃত ভাষা যদি মনে পড়ে, কিম্বা কেউ আমাকে দয়া ক'রে জানান—পরবর্তী মুদ্রণের সময় বদলাবার চেষ্টা করব।—লেখক।

॥ ১৫ ॥

পঞ্চদশ দিনরাত্রিব্যাপী সেই প্রায়-প্রলয়াগ্নিলীলায় বিরাট খাণ্ডব বন তার অসংখ্য পশু পক্ষী সরীসৃপ ও কিছু কিছু অরণ্যচারী মানবসহ ভস্মীভূত হয়ে গেল। তবে পশু-পক্ষী ও সর্পাদিই বেশী। পিশাচধর্মী যে সব বর্বর মানুষ আরণ্যক জীবনে অভ্যস্ত, হিংস্র জন্তুর মতোই জীবনযাপন করে—কীলক ও তার সহচররা পূর্বাহ্ণেই তাদের সতর্ক করেছে। কেউ কেউ শুনেছে, কেউ শোনে নি। যারা শুনেছে তারাও অনেকে বিশ্বাস করে নি। ভাবতে পারে নি এত বড় বনটা সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হবে। যখন প্রত্যক্ষ দেখল তখন আর কেউ সে বহ্নিবলয় থেকে বার হ'তে পারল না। অগ্নিশিখার একটা সর্বনাশা মোহ আছে, তাতে সব জ্ঞান অভিজ্ঞতা বুদ্ধি যুক্তি আচ্ছন্ন হয়ে যায়। সেই প্রলয়ঙ্কর লেলিহান শিখাকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করতে দেখে অর্ধনর বনচারীদের উদ্‌ভ্রান্তি জন্মাবে, এ আর আশ্চর্য কী।

কিন্তু তা হোক ; বাসুদেবের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। মহৎ উদ্দেশ্যে দু-চারটে প্রাণী কি মানুষ নিহত হলে দোষ নেই। যারা অবিরতই মরছে—নানা কারণে—তাদের মৃত্যুটা এমন কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। ময়দানবকে বাসুদেবের প্রয়োজন। এই খাণ্ডব দগ্ধ না হলে তাকে পেতেন না, সেইটেই বড় কথা।

দানবস্থপতি ময় দানবশত্রু মহেন্দ্রের ভয়ে তাঁরই বন্ধু নাগরাজ তক্ষকের আরণ্য আবাসে আত্মগোপন ক'রে ছিলেন। এই সময় তক্ষকরা থাকেন না, সেই সুযোগ। ইন্দ্র আর যেখানেই সন্ধান করুক না কেন—পরম মিত্রর ঘরে তাঁর শত্রুকে অন্বেষণ করবেন না। তক্ষক বন্ধুর বিদ্বেষভাজন ব্যক্তিকে আশ্রয় দেবেন ইন্দ্রের কাছে তা বিশ্বাস্য নয়। কল্পনারও অগোচর।

কিন্তু—বাসুদেবের অনুমান অভ্রান্ত। আগ্রাসী অগ্নির সামনে অন্য কোন ভয়েই আত্মগোপন ক'রে থাকা সম্ভব নয়। শুধু তাও না, আত্মপরিচয় নিজেকেই দিতে হ'ল। এই বহ্নিবেষ্টনী থেকে অব্যাহতির একমাত্র যে সঙ্কীর্ণ পথ—সে পথে কালান্তক কৃতান্তসহচরের মতোই প্রহরায় ছিলেন বাসুদেব ও অর্জুন। পাছে ছদ্মবেশে বা অজ্ঞাতপরিচয় সামান্য বনচর হিসাবে তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে যান—তাঁরা নির্বিচারে সেই নিষ্ক্রমণ পথের পলায়নপর সমস্ত প্রাণীকেই বধ করছিলেন।

ময় বহুক্ষণ অপেক্ষা করেছিলেন তাও, দাবানল হয়ত একসময় আপনিই নিভে যাবে—এই আশায়। কিন্তু যখন আর সম্ভব হ'ল না, তখন সেই পথের

সামনে এসে তারস্বরে অর্জুনের দয়া ভিক্ষা করলেন, 'হে ফাল্গুনী আমাকে রক্ষা করো, আমি তোমার কাছে চিরঋণী থাকব। আমি তোমার শরণ নিলাম। তোমাদের বংশে শরণার্থীর জন্য প্রাণ দেওয়ার দৃষ্টান্ত ভূরিভূরি—আশা করি আজ তুমি সে ঐতিহ্য বিস্মৃত হবে না।'

তার পরই পরিচয় দিয়েছিল, 'আমি দানবস্থপতি—দানবদের বিশ্বকর্মা ময়, আমাকে রক্ষা করলে অবশ্যই আমি তোমার কোন প্রিয় কর্ম ক'রে তোমার ঋণ শোধ করব।'

অর্জুন অবশ্য এ পরিচয় জানবার পূর্বেই, শরণার্থী প্রাণভিক্ষা চাইছে এ-ই যথেষ্ট কারণ বোধে, অস্ত্র সম্বরণ করেছিলেন ; হাত তুলে শ্রীকৃষ্ণকেও ইঙ্গিত করেছিলেন নিরস্ত হ'তে। এখন—পরিচয় পাবার পর, আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি আয়ত্তাধীন জেনে—আর কোন প্রয়োজনও রইল না। একেবারেই অস্ত্রত্যাগ করলেন তাঁরা। অবশ্য তখন—না বন না বনচর—কিছুই বিশেষ অবশিষ্ট ছিল না। কে রক্ষা পেল আর কে পেল না তা নিয়ে মাথাও ঘামালেন না বাসুদেব আর। তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে, প্রয়োজন সিদ্ধ—তিনি শ্রান্তদেহে নিশ্চিন্ত চিত্তে যমুনার তীরবর্তী প্রমোদাবাসে প্রত্যাবর্তন করলেন। অগ্নিতাপে দেহটাও প্রায় অর্ধদগ্ধ, তৈল ও ঔষধ প্রয়োগ আশু প্রয়োজন, তখন আর ময়দানবের সঙ্গে বাক্যালাপেও কালক্ষেপ করলেন না। দানবস্থপতির সম্মানের উপর একটু নির্ভর করা যায়, কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করতে তিনি আসবেনই।

অর্জুনকে খাণ্ডব-দাহনের এ প্রয়োজনের কথাটা বলেন নি বাসুদেব—ময়দানবের কথাটা।

সে প্রয়োজনও হ'ল না। কয়েকদিন পরে যখন ময়দানব নিজেই এসে দেখা ক'রে অর্জুনকে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি আমার প্রাণ দান করেছ, আমার কাছে সেটা বিপুলতম ঋণ। সম্পূর্ণ শোধ করার সাধ্য নেই হয়ত—কিন্তু আংশিক হিসাবেও সে ঋণ কীভাবে শোধ করতে পারি—তোমার কোন্ প্রিয়কার্য সাধন ক'রে—যদি জানাও তো অনুগৃহীত হই।' তখন অর্জুন বাসুদেবকেই দেখিয়ে দিলেন। বললেন, 'আমার কোন প্রয়োজন বা তেমন কোন বাসনা নেই—তুমি আমার এই সখা ও আত্মীয় শ্রীকৃষ্ণের কোন আজ্ঞা পালন বা প্রিয়কার্য সাধন করলেই আমার ঋণ শোধ হবে। তুমি এঁকেই জিজ্ঞাসা করো।'

শ্রীকৃষ্ণ বোধ করি এও জানতেন। উত্তরও প্রস্তুত ছিল তাঁর। দ্বিধামাত্র না ক'রে তাই বললেন, 'দেখ, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির নূতন রাজ্য পত্তন ক'রেও অল্পদিনেই যশস্বী ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় হয়ে উঠেছেন। পাণ্ডবদের যা শক্তি, কর্মকুশলতা এবং বুদ্ধিমত্তা—যুধিষ্ঠির অচিরে রাজচক্রবর্তী বলে গণ্য হবেন তাতেও সন্দেহ নেই। রাজচক্রবর্তী বলে স্বীকৃত হ'লেই দেশবিদেশ থেকে নৃপতিরা আসবেন, শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি জানাতে। সে অবস্থার বড় বিলম্বও নেই। অথচ সেদিনের উপযুক্ত কোন ব্যবস্থা, এ রাজধানীতে করা যায় নি অত্যাপি। আমার ইচ্ছা—অবশ্য তুমি যদি তোমার প্রাণের মূল্য শোধ করা আবশ্যক মনে করো—তুমি এখানে, এই নূতন নগরীর উপান্তে একটি উপযুক্ত স্থান নির্বাচন ক'রে এমন একটি সভাগৃহ নির্মাণ ক'রে দাও, যা সর্বতোভাবে ভারতখণ্ডের ভাবী মহারাজচক্রবর্তীর উপযুক্ত হয়। হে দানবস্থপতি, আমি জানি, শিল্প-সৃষ্টির সকল দিকেই তোমার নৈপুণ্য শিল্পীশ্রেষ্ঠ বলে খ্যাত বিশ্বকর্মার অপেক্ষা অনেক বেশী। স্থপতি হিসাবেও তুমি অদ্বিতীয় তাতেও সন্দেহ নেই। তুমি তার সর্বজন-প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসাবেই এমন একটি সভাগৃহ নির্মাণ করো—যা বিপুলতায়, সৌন্দর্যে ও অভিনবত্বে এই ভূমণ্ডলে অভিনব ও অনির্মিতপূর্ব বলে স্বীকৃত হয়। সে সভাভবন এমন হবে যা শুধু এই জম্বুদ্বীপেই নয়, সারা বিশ্বে কোথাও কেউ নির্মাণ করে নি, কল্পনাও করতে পারে নি—পরেও করবে না—ন ভূতো ন ভবিষ্যতি। মানবজাতির ইতিহাসেই যেন চিরবিস্ময়ের তুলনারূপে লিখিত থাকে তাঁর বিবরণ। হে মহাস্থপতি, এ কার্য সমাপ্ত হলে শুধু আমার প্রিয়সাধন কি তোমার জীবনঋণই শোধ হবে না—এ গৃহ যুগে-যুগান্তরে তোমার অক্ষয় কীর্তি ঘোষণা করবে।'

ময় স্থির হয়ে অর্ধনিমীলিত নেত্রে নতমস্তকে কৃতাঞ্জলিপুটে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন—তার পর বাসুদেবকে নমস্কার ক'রে বললেন, 'তাই হবে। তবে এই ধরনের সুবিপুল গৃহ নির্মাণ বহু ব্যয়সাধ্য, আশা করি আপনিও তা জানেন। অসংখ্য শিল্পী ও কারিগর লাগবে, সহস্রাধিক সাধারণ শ্রমিক। তা ব্যতীত উপকরণের প্রশ্ন আছে। শ্বেত প্রস্তর, স্ফটিক, স্বর্ণ, রৌপ্য, মণিমাণিক্যাদির তো কথাই নেই। লক্ষ লক্ষ স্বর্ণনিষ্ক প্রয়োজন হবে। সে সব কে যোগাবেন—মহারাজাধিরাজ যুধিষ্ঠিরের সে সঙ্গতি আছে কিনা জানি না, সন্দেহ প্রকাশের ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন—তবে এ সব স্থূল কথাগুলো পূর্বাহ্নেই সেরে নেওয়া আবশ্যক, তাতে বিস্তর সুবিধা হয়, অকারণে কালক্ষেপ করতে হয় না। কাজ আরম্ভ ক'রে উপকরণ বা ধনাদি সরবরাহে বিঘ্ন উপস্থিত হওয়া,

বা পরের প্রসন্নতার জন্য অপেক্ষা করা—শিল্পকর্ম কেন, যে কোন বৃহৎ কর্মের পক্ষেই ক্ষতিকর; অযথা বিলম্ব তো ঘটেই, অনেক সময় সে কর্মও সমাধা হয় না।'

বাসুদেব যেন কতকটা উদাসীনভাবে প্রত্যুত্তর দিলেন, 'উপকরণ ও অর্থ সরবরাহের দায়িত্ব আমার, কর্মী সংগ্রহের ভার তোমার ওপর রইল।'

শঙ্কিত বিস্ময়াহত অর্জুনের যখন বাঙ্‌নিষ্পত্তি সম্ভব হ'ল তখন ময়দানব আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি লাভে নিশ্চিন্ত এবং প্রসন্ন হয়ে বিদায় নিয়েছেন।

ব্যাকুল অর্জুন বললেন, 'এ কী করলেন আপনি! না না, এত সম্পদ বা অর্থ আমাদের কোথায়? এ যে কুবেরেরও অসাধ্য কাজ! আপনি নিবৃত্ত করুন ওকে—'

'তুমি তো আমার ওপরই ছেড়ে দিয়েছিলে, এখন আবার সে কথা ফিরিয়ে নিয়ে আমাকে অপমানিত করতে চাও নাকি?'

এই একটি মাত্র প্রশ্নে অর্জুনকে নির্বাক ক'রে দিলেন বাসুদেব।

দেখা গেল শ্রীকৃষ্ণ উপকরণ সংগ্রহের প্রতিশ্রুতি—তার পূর্ণ দায়িত্ব সম্বন্ধে চিন্তা ও বিবেচনা ক'রেই দিয়েছিলেন।

এই দানবস্থপতি ময়ই ইতিপূর্বে কৈলাসের উত্তরে বিন্দুসরোবরের তীরে দানবরাজ বৃষপর্বার জন্য একটি সভাগৃহ নির্মাণ করেছিলেন। বিশেষ যজ্ঞের জন্যই তা প্রস্তুত হয়েছিল, এখন তার বহু তৈজস উপকরণাদি পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে। বাসুদেব সে কথা স্মরণ করিয়ে দিতে ময় সেই প্রাসাদ ভেঙে সেখানকার মূল্যবান স্ফটিক, শ্বেত প্রস্তর ও মণি-রত্নাদি আনানোর ব্যবস্থা করলেন। এ ছাড়া সেই জনহীন তুষারাবৃত পার্বত্য দেশে যুগযুগান্তর ধরে বিস্তর স্বর্ণ ও মণিমুক্তা জমে ছিল—কিম্বদন্তী বৃষপর্বারও আগে দেবরাজ ইন্দ্র বহু বৎসর যজ্ঞ করেছিলেন—সে সময় অসংখ্য হিরণ্ময় চৈত্য বা মন্দির নির্মাণ করেন, সেগুলিও এখন কাজে লাগল।

এসব উপাদান বিনা বাধাতেই আনা গেল। সেই সঙ্গে ময় আরও দুটি জিনিস নিয়ে এলেন, বৃষপর্বার দেবদত্ত নামে মহানাদী এক শঙ্খ এবং বিশ্বে অতুলনীয় একটি গদা। ময় শঙ্খটি অর্জুনকে ও গদাটি ভীমকে উপহার দিলেন। সে শঙ্খের গম্ভীর ভীমনাদ বহু দূর পর্যন্ত পৌঁছয়, সহস্র সহস্র শ্রোতার মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। গদাটিও স্বর্ণখচিত কিন্তু সাধারণ মানুষের যোগ্য বা সহজায়ত্ত নয়। বৃষপর্বা বিশেষ কারিগর দ্বারা এটি নির্মাণ করান, আকৃতিতে

তেমন বিশাল বা ভয়াবহ না হলেও অতিশয় গুরুভার—বিশেষ বলশালী ব্যক্তি ছাড়া কেউ তা আস্ফালন করতে বা যুদ্ধে ব্যবহার করতে পারেন না। এ গদা নিক্ষিপ্ত হলে ভূপাতিত বা নিহত হবেন না—ভীমসেন ও দুর্যোধন ছাড়া সে সময়ও এমন মল্লবীর কেউই ছিল না। শত্রুনিধনে অদ্বিতীয় সেই গদাটি পেয়ে ভীমসেন আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন। অর্জুনও এবার গাণ্ডীব ধনু, কপিধ্বজ রথ, অক্ষয় তূণীর এবং দেবদত্ত শঙ্খ পেয়ে বিশ্বত্রাস অপরাজেয় যোদ্ধা রূপে পরিগণিত হলেন।

অতঃপর ময় সেই আশ্চর্য সভা নির্মাণে প্রবৃত্ত হলেন। স্থান নির্বাচনই সর্বাধিক সমস্যা। ময় এমনই একটি স্থান বেছে নিলেন—গ্রীষ্মে অসহ তাপ, শীতে হিমতীক্ষ্ণ উত্তর বাতাস সেখানে অধিবাসীদের ক্লিষ্ট করতে না পারে, অতি বর্ষণে জল না জমে বৃক্ষরাজি নষ্ট হয়। ঈষৎ-উচ্চ অথচ সমতল কঠিন মৃত্তিকা দেখে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ দুদিকেই দশ সহস্র হস্ত হিসাবে সভাগৃহ নির্মাণের ভূমি নির্বাচন করলেন। অধিকাংশই পতিত জমি, তার মধ্যে জনপদ বা গ্রাম বিশেষ ছিল না, যা দু-চার ঘর অরণ্য অধিবাসী ছিল তাদের রাজ-আদেশে অন্যত্র উৎকৃষ্টতর জমি দিয়ে পুনর্বসতির ব্যবস্থা হ'ল।*

দানবস্থপতি হিমালয় থেকে বহু উপকরণ ও সম্পদ আহরণ ক'রে ছিলেন। শুধু বৃষপর্বা বা ইন্দ্রই নন, তারও পূর্বে বহু বিখ্যাত ব্যক্তি সে স্থানে দীর্ঘকাল ধরে যজ্ঞাদি করেছেন। শিববাসভূমি কৈলাসের কাছেই এই স্থান দেবদানব–গন্ধর্বদের প্রিয় সাধনক্ষেত্র। সেই সব যজ্ঞকারদের পরিত্যক্ত অপরিমিত ঐশ্বর্যে সে স্থান কুবেরের ভাণ্ডার হয়ে আছে। পরিত্যক্ত বলেই অধিকার নিয়ে কোন দুশ্চিন্তা নেই। যে গ্রহণ করবে তারই সে সম্পদ। ময় আট হাজার বলিষ্ঠ অনার্য আদিবাসী সংগ্রহ ক'রে তাদের সাহায্যে সেই প্রস্তর, স্ফটিক ও মণিমাণিক্য স্বর্ণ বহন করিয়ে আনলেন এবং তাদের আর বিদায় দিলেন না, তারাই শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে লাগল। সভাগৃহ নির্মাণ সমাপ্ত হলে মহারাজ যুধিষ্ঠির তাদের মধ্যে বহু লোককেসেখানের প্রহরী নিযুক্ত করেছিলেন।

সেই আট হাজার প্রভূত বলশালী শ্রমিক, সহস্রাধিক স্থাপত্য শিল্পী এবং ময় স্বয়ং—এক বৎসর দুই মাস কাল অহোরাত্র পরিশ্রম ক'রে সেই সভাগৃহ নির্মাণ সমাপ্ত করলেন। শ্রীকৃষ্ণ যা বলেছিলেন তা-ই ক'রে দিলেন ময়—'ন

* অনেকের ধারণা এই সভাস্থলেই বর্তমানের মীরাট শহর গড়ে উঠেছে।

ভূতো ন ভবিষ্যতি'। তেমন সভাগৃহ পূর্বেও পৃথিবীর কুত্রাপি নির্মিত হয় নি, সম্ভবত পরেও হবে না।

'ময় ত্রিলোক-বিখ্যাত মণিময় সভা নির্মাণ করলেন যার দীপ্তিতে যেন সূর্যের প্রভাও বিনষ্ট হ'ল। এই বিশাল সভা নবোদিত মেঘের ন্যায় আকাশ ব্যাপ্ত ক'রে রইল। তার প্রাচীর ও তোরণ রত্নময়, অভ্যন্তর বহুবিধ উত্তম দ্রব্যে ও চিত্রে সজ্জিত।·· ময় দানব সেখানে একটি অতুলনীয় সরোবর রচনা করলেন, তার সোপান স্ফটিক-নির্মিত, জল অতি নির্মল, বিবিধ মণিরত্নে সমাকীর্ণ এবং স্বর্ণময় পদ্ম মৎস্য ও কূর্মে শোভিত। যে সমস্ত রাজারা দেখতে এলেন তাঁদের কেউ কেউ সরোবর বলে বুঝতে না পেরে জলে পড়ে গেলেন। সভাস্থলের সকল দিকেই পুষ্পিত বৃক্ষশোভিত উদ্যান হংসকারণ্ডবাদি সমন্বিত পুষ্করিণী ছিল।'*

সভা শেষ হ'লে যুধিষ্ঠির গুরুজনদের অনুমতি ও ব্রাহ্মণদের অনুমোদন নিয়ে ঘৃত-মধুযুক্ত পায়স, মৃগ-শূকর মাংস ও অন্যান্য সুস্বাদু বিবিধ ভোজ্য দিয়ে কয়েক হাজার ব্রাহ্মণভোজন করালেন এবং দেবপূজা ও দেববিগ্রহ স্থাপন ক'রে পরিশেষে সভা প্রবেশ করলেন এবং দুর্লভ মণিমাণিক্যখচিত নবনির্মিত সিংহাসনে আসীন হলেন। এই উপলক্ষে বেশ কয়েক দিন ধরে মল্লযুদ্ধ, লাঠিখেলা, নৃত্যগীত অভিনয় অনুষ্ঠান প্রভৃতি উৎসব সমারোহ চলল।

এই আশ্চর্য ও অতুলনীয় সভাগৃহের খ্যাতি দেশবিদেশে পরিব্যাপ্ত হওয়ায় অনেক মিত্ররাজ্য থেকে নরাধিপরা রবাহূত হয়েই দেখতে এলেন। তাঁদেরও বিস্ময়ের সীমা রইল না। তাঁরা কেউ কেউ এই উপলক্ষে হাস্যাস্পদ ও অপ্রতিভও হলেন। স্ফটিকের গৃহপ্রাচীরকে মুক্ত নিষ্ক্রমণ পথ ভেবে মস্তকে আঘাত পেলেন, আবার সরোবরের অতিস্বচ্ছ জলের মধ্যে দ্যুতিমান স্বর্ণনির্মিত ও মণিরত্নশোভিত পুষ্পবৃক্ষ দেখে উদ্যান বোধে সে পুষ্প আহরণ করতে গিয়ে জলমগ্ন হলেন।

প্রাচুর্যের ও ঐশ্বর্যেরও শেষ নেই, সসম্ভ্রম বিস্ময়বোধেরও না। সবটাই যেন অলৌকিক অবিশ্বাস্য বোধ হয় তাদের। পাণ্ডবদের ধৈর্য সৌজন্য এবং লোকোত্তর শৌর্যের খ্যাতি ইতিমধ্যেই ভারত-খণ্ডের নৃপতিমহলে সম্ভ্রমের সৃষ্টি করেছিল, সেই সঙ্গে—বিশেষ কৃষ্ণার স্বয়ম্বরের পর—একটু মাৎসর্যেরও। এখন এই ঐশ্বর্য দেখে সে দুই মনোভাবই আরও বৃদ্ধি পেল। এই কুবেরেরও-ঈর্ষা-

* মর্মানুবাদ—রাজশেখর বসু।

উৎপাদনকারী অপরিমাণ সম্পদ—পাণ্ডবরা স্বীয় ভুজবলে আহরণ করেছেন এই রকমই প্রতীতি হ'ল সকলের। সুদুর্গম হিমালয় পর্বতের গহন বিজন প্রদেশ থেকে এই বিপুল, সংখ্যাগণনার অতীত ঐশ্বর্য সংগৃহীত হয়েছে তা কেউই জানত না, ময়ও কাউকে বলেন নি, কারণ তাহলে স্বর্ণলোলুপ এই সব নৃপতিরা গলিত-মাংসের-স্তূপে-গৃধ্রদের মতো সেখানে গিয়ে পড়তেন ও ময়ের কাজে ব্যাঘাত জন্মাতেন।

সুতরাং পরশ্রীকাতর দর্শকের দল সক্ষোভ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করতে করতেই নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। সে বক্ষবেদনা প্রকাশ করতে বা একদা এই সম্পদ কোন দিন এখান থেকে বলপূর্বক হরণ করতে পারবেন—এমন স্বপ্ন দেখতেও সাহস করেন নি।

কিন্তু এই দেশের সর্বপ্রান্ত থেকে আগত অগণিত নৃপতি ও সম্ভ্রান্ত দর্শকের ঈর্ষা-বিস্ময়-মিশ্রিত প্রশংসা ও চাটুবাদ, প্রজাদের সহর্ষ জয়ধ্বনি, কৌরব ভ্রাতাদের গাত্রদাহের কৌতুককর কাহিনী—কিছুই পাণ্ডবদের পরিপূর্ণ তৃপ্তি দান করতে পারল না।

এই সমস্ত কিছুর মূল যিনি, আসল সংঘটনকারী—যাঁর পরিকল্পনা-নির্দেশেই এই স্বপ্ন-কল্পনার বস্তু আকার ধারণ ক'রে পাণ্ডবদের স্বপ্নেরও অতীত সৌভাগ্য দ্যোতনা করছে—যাঁর দুঃসাহসিক ব্যবস্থাপনাতেই এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে—পাণ্ডবদের একান্ত শুভানুধ্যায়ী সেই মানুষটি কোথায়!

সেই বাসুদেব?

তিনি আসছেন না কেন?

যাঁর সর্বাগ্রে আসবার কথা, সর্বাপেক্ষা আনন্দ লাভের কথা?

সভাগৃহ মোটামুটি একটা আকার পরিগ্রহ করার সময় থেকেই ধর্মরাজ সাদর আহ্বান জানিয়ে দূত পাঠাতে আরম্ভ করেছেন, সমাপ্তির পথে এসেছে বুঝে জানিয়েছেন সাদর আমন্ত্রণ, এ গৃহপ্রবেশে তাঁরই অগ্রাধিকার, সবিনয়ে সে কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—কিন্তু সে সভাগৃহের প্রতিষ্ঠাযজ্ঞ ও প্রবেশ, অধিরোহণ প্রভৃতি অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেল—তবু তিনি এলেন না কেন? যাঁর আগ্রহ উৎসাহ সর্বাধিক হবার কথা—সেই বাসুদেব এমন উদাসীন ও বীতস্পৃহ রইলেন কেন?

তবে কি পাণ্ডবদের কোন অপরাধ হয়ে গেল কোথাও?

ওঁদের কি এত দ্রুত গৃহপ্রবেশ অকর্তব্য হয়েছে? উচিত ছিল তাঁর আগমন পর্যন্ত অপেক্ষা করা?

এর কোন উত্তর মেলে না কারও কাছ থেকে। কেউই এ রহস্যের সমাধান করতে পারেন না। এমন কি বৃষ্ণি ও অন্ধক প্রধানদের কাছ থেকেও কোন সদুত্তর লাভ করতে পারলেন না যুধিষ্ঠিরের প্রেরিত দূতগণ।

তাতেই পাণ্ডবদের অস্বস্তি বৃদ্ধি পায়। এমন একটি করায়ত্ত সুভোগ্য বস্তুও শান্তিতে ভোগ করতে পারেন না।

কেন যে বাসুদেব অযথা এই বিলম্ব করেছেন—সত্যই তা দ্বারাবতীতে কেউ জানত না।

যাদবরা ভাবছেন সুভদ্রার শ্বশুরালয়ে প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ইন্দ্রপ্রস্থে অযথা দীর্ঘকাল কাটিয়ে এসেছেন—আলস্যে বিলাসে ব্যসনে মৃগয়ায়—তাতে রাজকার্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেই কারণেই বিব্রত অনুতপ্ত শ্রীকৃষ্ণ এখন আর পুরী ত্যাগ করতে পারছেন না।

বাসুদেবের এই দুর্বোধ্য আচরণ—তাঁর গোপন অন্তর্দ্বন্দ্বের ইতিহাস—তাঁর প্রিয়তমা মহিষীরাও জানতেন না।

তাঁদের জানানোর মতো নয়ও কথাটা।

দানবস্থপতি স্থান নির্বাচন ক'রে গৃহ নির্মাণের সূচনা করছেন এইটুকু দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে ইন্দ্রপ্রস্থ ত্যাগ করেছেন বাসুদেব।

ইতিপূর্বে বহুবারই ইন্দ্রপ্রস্থে এসেছেন ও দ্বারকায় ফিরেছেন—কিন্তু এবারের এই আসা-যাওয়ার মধ্যে একটু বিশেষত্ব ছিল। এখন তিনি এ পুরীর কুটুম্ব, আত্মীয়। সেক্ষেত্রে বিদায়-পর্বের কতকগুলি নিয়মরীতি আছে, তা তিনি—নিজে সর্বসংস্কারের অত ত হলেও—মানতে বাধ্য। সেবকদের পারিতোষিক দান, আত্মীয়-গুরুজনদের বস্ত্রাদি প্রণামী, গৃহদেবতা-পুরদেবতার পূজার্চনা, ব্রাহ্মণদের সাদর সম্ভাষণ প্রণামাদি জ্ঞাপন ও সম্মান-দক্ষিণা প্রদান—সর্বোপরি আত্মীয়দের বয়স পদবী সম্পর্ক ইত্যাদি বিচার ক'রে বিদায় সম্ভাষণ জ্ঞাপন ও কর্তব্যানুগ আচরণ—এই শ্রেণীর বিদায় গ্রহণের আবশ্যিক অঙ্গ।

এমনিই একটি অবশ্য (এবং অকারণ)-কর্তব্য সুভদ্রাকে তাঁর জ্যেষ্ঠা সপত্নী ও যাতার হাতে সমর্পণ করে লৌকিক সৌজন্যাচার হিসাবে তাঁকে এই অনুজার রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রশ্রয়দানের অনুরোধ জ্ঞাপন।

সেই সময় কৃষ্ণার হাতে সুভদ্রার হাতখানি রাখতে গিয়ে কৃষ্ণার হাত স্পর্শ করতে হয়েছিল। না, স্পর্শ মাত্র নয়, এক হাতে তাঁর হাত ধরে অপর হাতে সুভদ্রার হাত এনে ধরিয়ে দিতে হয়েছিল। সেই সুরনারী-দুর্লভ, মদনেরও

কাম-আনয়নকারী করপদ্মের স্পর্শ সেদিন অকস্মাৎ তেজস্কর মাধ্বীর মতো উগ্র মাদকতার সঞ্চার করেছিল বাসুদেবের দেহে।

যৌবনোষ্ণ অথচ স্বেদার্ত, পুষ্পদলের মতো কোমল সেই অপরূপ করকমল স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে কী একটা পুলকবেদনাতুর শিহরণ অনুভব করেছিলেন বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ—'দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহ' যিনি, যিনি সকল বাসনা-কামনাকে কালীয় নাগের মতো মথিতবিমর্দিত ক'রে ইন্দ্রিয়জিৎ হয়েছেন। ক্ষণকালের জন্য—বোধ করি নিমেষকালের বেশি নয়—একটা বিহ্বলতা, অননুভূতপূর্ব চিত্ত-চাঞ্চল্য অনুভব করেছিলেন—সামান্য তরুণ যুবার মতোই।

না, এ দেহটাকে দোষ দিতে পারবেন না শ্রীকৃষ্ণ। সে করযুগল সামান্য সাধারণ নয়, সে স্পর্শের লোকোত্তর অভিনবত্ব তো নয়ই।

দেহের সঙ্গে অনুভূতির সহজ সম্পর্ক, সেই অনুভব-শক্তি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনের কাছে বিদ্যুৎরেখাবৎ গতিতে সেই বার্তা পৌছে দিয়েছে যে আকৈশোর নানা ভাবে অসংখ্য সুন্দরীর সংস্পর্শে এলেও এমন করাঙ্গুলি স্পর্শ করার ঘটনা ইতিপূর্বে ঘটে নি কখনও।

নিমেষকালই বোধ করি—একটি নিমেষপাতের সময়টুকু—তার বেশী নয়।

কিন্তু সেই অত্যল্প সময়েই তাঁর চিত্ত-অবশতা, তাঁর একটা পুলকবিস্ময় কৃষ্ণা বুঝেছেন। বুঝেছেন ঐ পরিমাপহীন অল্প সময় মধ্যেই। পরিবেশ ও তার ফলে মুখের বর্তমান পরিস্থিতি—পরিবেশ ও কর্তব্য-অনুযায়ী কৌতুকমধুর অভয়হাস্য ওষ্ঠভঙ্গীতে লেগে থাকা সত্ত্বেও কেমন এক রকমের স্থির নিশ্চল দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলেন বাসুদেবের চোখের দিকে।

তাতে কি বিস্ময় প্রকাশ পেয়েছিল? কৌতুহল?

অনুযোগ, তিরস্কার?

অথবা সীমাহীন অথচ সুগোপন বেদনাবোধ?

তা বোঝা যায় নি, এতই পাথরের মতো ভাবপ্রকাশহীন সে চাহনি।

ওষ্ঠপ্রান্তের প্রসন্ন হাসির রেখাটুকু তেমনিই আছে, মুখের ভঙ্গিতে অভয় আশ্বাসেরও অভাব নেই—তার মধ্যে সেই দৃষ্টির বিশেষত্বটুকু অবশ্যই আর কারও চোখে পড়ে নি—বাসুদেব ছাড়া। বাসুদেবের সে অভিভূত অবস্থাও কেউ লক্ষ্য করে নি।

ক্ষণিককালের সে বিহ্বলতা অপসারিত হ'তেও বিলম্ব হয় নি।

দ্রৌপদীর সেই দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে দৃষ্টি মিলেছিল সঙ্গে সঙ্গেই। সে চাহনির ভাষাও তাঁর অন্তরে পৌছেছিল—অথবা বলা যায় তীব্র আঘাতে বেজেছিল।

সঙ্গে সঙ্গে—তাঁর পক্ষে একান্ত অস্বাভাবিক ভাবেই—লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিলেন।

তারপর অবশ্য সবই স্বাভাবিক নিয়মে চলেছে। উভয় পক্ষেই যথোচিত বাক্যবিন্যাসে অসুবিধা হয় নি, কণ্ঠস্বরেও কোন জড়তা ছিল না আর। দ্রৌপদীও তাঁর নীলোৎপল-পলাশতুল্য নেত্রের আশ্চর্য রহস্যময় দৃষ্টিতে মুখের কৌতুক-হাস্যটুকু টেনে এনে স্থানকালপাত্র ঘটনার যথোপযুক্ত সৌজন্য প্রকাশ করেছিলেন, কিছু হাস্যপরিহাসও; সুভদ্রাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ ক'রে যথেষ্ট স্নেহ-প্রকাশ ও অভয়দান করেছিলেন—সত্যকারের স্নেহপাত্রী অনুজার মতোই। ওঁর মনের সেই কিছুকালের মানসিক বিপর্যয়ের ইতিহাস উপস্থিত পুরনারী সহচরী দাসীর দল কেউই জানতে কি বুঝতে পারে নি।

অতি সামান্য ঘটনা।

অনুক্ত, অস্বীকৃত, অপ্রকাশিত।

তবু সেইটেই প্রচণ্ডভাবে বিচলিত করেছে বাসুদেবকে।

দেহ দেহের ধর্ম পালন করবেই। এ জানা কথা। কিন্তু উনি ভেবেছিলেন সেই অবশ্যম্ভাবী সত্যটুকুকে তিনি জয় করতে পেরেছেন। দ্রৌপদী সম্বন্ধে তাঁর যে দুর্বলতা সে শুধুই গুণগত। কৃষ্ণার অসাধারণ মনীষা, ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি, কর্মৈষণা ও কর্তৃত্বশক্তি দেখেই তিনি মনের কোন প্রত্যন্ত প্রদেশে একটু ইচ্ছাতুর ক্ষোভ অনুভব করেন, এই নারীরত্নকে সঙ্গিনী পেলে তাঁর আরব্ধ ও ঈপ্সিত কর্মযজ্ঞ কত সহজ হ'ত এই ভেবে।

তবে কি তিনি আত্মপ্রতারিত হয়েছেন?

এই সংশয়, চিত্ত-অস্থিরতা থেকেই ইন্দ্রপ্রস্থগমনে অনীহা দেখা দিয়েছে তাঁর।

অবশ্য এভাবে পাণ্ডবদের পরিহার ক'রে বেশীদিন যে চলতে পারবেন না এও নিশ্চিত। দূতের পর দূত আসছে, হয়ত এবার ধনঞ্জয় কিংবা ধর্মরাজ স্বয়ং এসে উপস্থিত হবেন।

এ আশঙ্কা সত্ত্বেও তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক এই সঙ্কোচটুকু কাটিয়ে মনস্থির করা কঠিন হ'ত—যদি না তাঁর মহিষী রুক্মিণী ওঁকে সাহায্য করতেন। রুক্মিণীকে তিনি কিছু বলেন নি, কিন্তু রুক্মিণীর এই এক আশ্চর্য শক্তি—স্বামীর মনেরক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র অভিপ্রায় ও দ্বিধাদ্বন্দ্বও তিনি যেন ওঁর পক্ষ্মপাতনে অনুভব করতে পারেন। তাঁর সুগভীর প্রেমেই এটা সম্ভব হয়েছে, এই সিদ্ধি প্রিয়তমা

সত্যভামাও লাভ করতে পারেন নি।

তিনিই একদিন এ প্রসঙ্গ তুললেন। বললেন, 'যদুনাথ, এই অশোভন জাড্য, এই ইতরমানবোচিত সঙ্কোচ আপনাকে শোভা পায় না।'

'সঙ্কোচ!' যেন চমকে উঠলেন বাসুদেব।

'হ্যাঁ। আপনার মুখেই বহুবার শুনেছি, দেবতাই হোন আর দেবাদিদেবই হোন, বা স্বয়ং ভগবানই হোন, মর্ত্যভূমে বিচরণকারী নরদেহধারী মাত্রেরই দেহের সহজ গতিপ্রকৃতি, তার ধর্ম তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অধীনতা স্বীকার করতে হবে। যদি কোন চিত্তবৈকল্য ঘটেই থাকে তো সে নিতান্তই সেই স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটেছে, এবং সেজন্য এই সঙ্কোচও সেই নিয়মেই দেহের ধর্ম প্রতিপালন করছে মাত্র। আপনি যে সে দুইয়েরই উর্ধ্বে, দয়া ক'রে সেইটুকু স্মরণে আনুন। যাঁর সামনে বিরাট কর্তব্যভার—যাকে কর্তব্যযজ্ঞ বলাই উচিত, যার অভাবনীয় আয়োজন তিনিই করেছেন—সামান্য কী এক অতিতুচ্ছ ঘটনায় তাঁর এইভাবে শিশির-দিনের ভেকের মতো জড়ত্বের গহ্বরে আবদ্ধ থাকা শোভা পায় না। সাধারণ মানুষকে রক্ষার ব্রত আপনার। সেই মানুষের থেকে আপনি স্বতন্ত্র, স্বরাট্‌। আপনি শুধু এই দেহ-মাত্র নন, এর যা কিছু শিক্ষা তা আপনার সেবা ক'রে, আপনার চরণপ্রান্তে বসেই লাভ করেছি—সেই সাহসেই বলছি, মানুষের পক্ষে যা লজ্জা কি সঙ্কোচের কারণ—আপনার পক্ষে তা নয়। আপনার লীলাময় রূপের এই ক্ষণিক অনুভূতি যেন আপনার কর্মময় রূপের বাধা হয়ে না দাঁড়ায়—এই আমার প্রার্থনা।'

শ্রীকৃষ্ণ যেন বহুদিনের সুপ্তি থেকে জেগে উঠলেন।

বললেন, 'প্রিয়ে, আমি ধন্য তোমার এই মননশক্তি যদি আমার শিক্ষার ফল হয়—সে শিক্ষাও ধন্য। কিন্তু সে কি আমারই শিক্ষা? জীবনে বার বার তো তোমার কাছ থেকেই আমাকে পাঠগ্রহণ করতে হচ্ছে। বোধ করি এক অসাধারণ শুভগ্রহ প্রভাবেই তোমাকে লাভ করেছিলাম। এক-একসময় মনে হয়, আমিই তোমার যোগ্য নই।'

রুক্মিণী হাসেন। প্রেমবিহ্বল, প্রশ্রয়মধুর হাসি। বলেন, 'এই চাটুবাদেই মনে হচ্ছে আপনি আবার স্ব-স্বরূপে ফিরে এসেছেন।...তাহলে ইন্দ্রপ্রস্থ যাত্রার আয়োজন করি?'

'অবশ্যই। যত দ্রুত হয়। আমি বরং এখনই পিতা বসুদেব ও আর্য বলদেবের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আসি।'

॥ ১৬ ॥

ইন্দ্রপ্রস্থে এসে প্রাথমিক অভ্যর্থনা অনুযোগাদির উচ্ছ্বাস মন্দীভূত হলে—মাত্র কয়েক দণ্ড স্নান-বিশ্রামাদিতে অতিবাহিত করার পর—বাসুদেব পাণ্ডবদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে প্রায়-অলৌকিক স্বপ্নসৌধের মতো অবিশ্বাস্য সুন্দর সভাগৃহটি দেখলেন। বেশ অনেকক্ষণ ধরেই দেখলেন। কারণ স্থাপত্যকৌশল, ভাস্কর্য কি গঠন-নৈপুণ্যের দিক থেকেই নয়—চারুকলার চরমোৎকর্ষ হিসেবেও এই প্রাসাদ অনুপম, অভূতদৃষ্ট। এর উদ্যান, সরোবর, কৃত্রিম সজ্জা—এমন কি প্রাচীরগুলিও বিশেষ লক্ষণীয়। একাধারে নয়নাভিরাম এবং ঘাতসহ—এই ঐশ্বর্যময় সভাভবনের নিরাপত্তা রক্ষার উপযুক্ত ক'রেই নির্মিত। প্রয়োজন ও সৌকুমার্যের এমন অপূর্ব সমন্বয় কদাচিৎ চোখে পড়ে।

অভ্যর্থনার মধ্যে আন্তরিক আনন্দোচ্ছ্বাসেরও যেমন অভাব ছিল না, তেমনি অনুযোগও ছিল প্রচুর।

অনুযোগ এতকাল—বিশেষ এই সভাগৃহ নির্মাণ সমাপ্ত হওয়ার সংবাদ পেয়েও—না আসার জন্য। অর্জুনের চোখে জল, কৃষ্ণার কণ্ঠস্বর আবেগরুদ্ধ। যদিচ তিনি মৃদু অনুযোগ নয়—তিরস্কারই করলেন বলতে গেলে। যুধিষ্ঠিরের উৎকণ্ঠাই বেশী—কোথায় কী অপরাধ হয়ে গেল যে শ্রীকৃষ্ণ এমনভাবে তাঁদের ত্যাগ করলেন। ভীম বললেন, 'নাগরিক রীতিপদ্ধতিতে আমরা অভ্যস্ত নই তা তো জানতেই, তাতেও যদি·আমাদের আচরণে ত্রুটি গ্রহণ কর তাহলে আমাদের এ ঠাটে প্রয়োজন নেই। এ রাজ্য রাজধানী তুমিই নিয়ে নাও, আমরা আবার অরণ্যে চলে যাই।'

বাসুদেব এসব অভিমান অভিযোগ অভ্যস্ত মৃদুমধুর হাস্যের বর্মে প্রতিহত ক'রে যেন অধিকতর মনোযোগী হয়ে পড়লেন সভাগৃহের দিকেই। প্রশংসার উচ্ছ্বাস ও বিস্ময় প্রকাশে এঁদের এতদিনের দুশ্চিন্তা দুঃখ ভুলিয়ে দিতে বেশীক্ষণ সময় লাগল না।

এ সভাভবন না দেখলেও ময় কী করবেন তা বাসুদেব জানতেন। অনেকটাই অনুমান করতে পেরেছিলেন। আর সেই কারণেই এখানে আসার পূর্বে যখন সত্রাজিৎ-নন্দিনী বলেছিলেন, 'শুনেছি এমন সভাভবন তৈরী হয়েছে ত্রিভুবনে যার তুলনা নেই। ইন্দ্রসভা আয়তনে বিশাল হলেও নাকি এত সুন্দর নয়। আপনি এর একটা ভাল দেখে নামকরণ ক'রে দেবেন। মর্তের স্বর্গ—এই রকম অর্থ দাঁড়ায়, সেইভাবে নাম দেবেন।'

বাসুদেব হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, 'নামকরণ আমি সে সভা না দেখেই করতে পারি। তবে তা প্রকাশ্য নয়।'

'কী সে নাম—যা কাউকে বলা চলবে না?' সকৌতুক কৌতূহলে প্রশ্ন করেন সত্যভামা।

'ওদের কাছে বড় জোর বলা চলে ঈর্ষার প্রাসাদ, কিংবা অসূয়াভবন—কিন্তু আসলে ওটা সর্বনাশের প্রাসাদ, সর্ববিনষ্টিভবন। নিয়তি-গৃহ বা পরিণাম-গৃহও বলা চলে।'

'হে ভগবান! এসব কি অশুভ কথা বলছেন? না না, ছি!' শিউরে উঠেছিলেন সত্যভামা অজ্ঞাত অমঙ্গলাশঙ্কায়।

'যা সত্য তাই বলছি। ক্রমশ বুঝবে এর অর্থ।'

তাঁর চিরাভ্যস্ত রহস্যময় হাসিতে যবনিকা টেনে দিয়েছিলেন এ প্রসঙ্গে।

এখানে এসে সভাগৃহ দেখেও সে মত পরিবর্তনের কোন কারণ দেখলেন না। বরং এই অমরাবতী-দুর্লভ প্রাসাদভবন মাৎসর্যের পথে একদা ভারতের সমস্ত ক্ষাত্রশক্তিকে মহাবিনষ্টির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে—এই বিশ্বাসই দৃঢ় হ'ল তাঁর।

মনে হ'ল, কল্পনায় সে মহাপরিণাম প্রত্যক্ষ ক'রে তিনি প্রীতই হলেন।

আহারাদির পর বিশ্রম্ভালাপ প্রসঙ্গে বাসুদেব প্রশ্ন করলেন, 'তারপর? ইতিমধ্যে আর কী কী উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল বলুন, দেবার মতো কী সংবাদ আছে?'

ধর্মরাজ বোধ করি সে সংবাদ দেবার জন্য উন্মুখ হয়ে ছিলেন, বললেন, 'কয়েকদিন আগে মহাতপস্বী সর্বজ্ঞ নারদ অনুগ্রহ ক'রে এখানে পদার্পণ করেছিলেন।'

বাসুদেবের এ সংবাদ অজ্ঞাত ছিল না, হয়ত নারদের এই শুভাগমনের মূলে তাঁরই প্রেরণা—তবু তিনি ঋজু হয়ে বসে বললেন, 'তাই নাকি! এ তো সুসংবাদ। আপনার পুরী পবিত্র, রাজসভা ধন্য হ'ল।...তা কী বললেন তিনি? মুনিবরের কলহপ্রিয়তার একটা কুখ্যাতি প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়েছে—সেরকম কোন অশান্তির বীজ বপন ক'রে যান নি তো?'

'না না, বরং রাজ্য পরিচালনা সম্বন্ধে কয়েকটি মহামূল্যবান নির্দেশ উপদেশ দিয়ে গেছেন।'

'সে তো অতি উত্তম সংবাদ। বাঞ্ছনীয়ও বটে। তিনি ত্রিকালজ্ঞ, ত্রিভুবনের তাবৎ রাজসভাতেই তাঁর অবাধ গতি। এ বিষয়ে তাঁর তুল্য জ্ঞানী

আর কে আছেন। তবে আমি জানি, তিনি এমন কোন আচরণ বা কর্তব্যের নির্দেশ আপনাকে দিতে পারবেন না যা আপনি ইতিমধ্যেই পালন করছেন না।' স্মিত হাস্যের সঙ্গে শেষের কথাগুলি বলেন বাসুদেব।

ধর্মরাজ পরিহাসছলেও মিথ্যা বলেন না, বিনয় প্রকাশের জন্যও বলতে পারলেন না যে, 'না না, তা কেন, আমি আর কতটুকুই বা করতে পেরেছি' ইত্যাদি। তিনি প্রশংসারক্ত নতমুখে শুধু উত্তর দিলেন, 'কী জানি, সব তো মিলিয়ে দেখি নি। হয়তো কোন কোন বিষয়ে অদ্যাপি আমার দৃষ্টি পড়ে নি—এমন হ'তে পারে।'

বাসুদেব তাঁর মনোভাব বুঝে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন, 'তার পর? আর কি বললেন তিনি? অন্য কোন সংবাদ?'

যুধিষ্ঠির ঈষৎ ইতস্তত ক'রে বললেন, 'সেই কথাই বলব বলে এত অধীর আগ্রহে তোমার প্রতীক্ষা করছিলাম। তিনি বললেন, আমাদের বংশের যে সব নৃপতি রাজসূয় যজ্ঞ ক'রে গেছেন তাঁরা নাকি পরলোকেও অতুল সম্মানের অধিকারী হয়েছেন। আমি যদি ঐ যজ্ঞ করতে পারি—আমাদের পিতৃপুরুষ প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ করবেন। রাজা হয়ে রাজসূয় যজ্ঞ সমাপন করার মতো সুকীর্তি নাকি আর নেই। ইহলোকে ও পরলোকে চিরদিন যজ্ঞকর্তার এই মহৎকর্ম প্রশংসিত হয়। দেবতা ও ঋষিগণ ধন্য ধন্য করেন। ঋষিশ্রেষ্ঠ নারদ আমাকে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে বললেন। বললেন, নচেৎ এই সুরপুরীদুর্লভ সভাগৃহের মর্যাদা থাকবে না। ময়ের এটা স্থাপত্য-তপস্যা—এও ব্যর্থ হবে।'

এই পর্যন্ত বলে—বড় বেশী স্পর্ধা বা ধৃষ্টতা কি উচ্চাশা প্রকাশ পেল কিনা—এই আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। সেখানে ভীম ও অর্জুনও উপস্থিত ছিলেন—তাঁরা বহুদিন যাবৎই নিজেদের শিক্ষা ও শক্তির পরীক্ষার জন্য অধীর হয়ে আছেন—তাঁরা এ প্রস্তাবে এমন বিস্ময়ের বা ধৃষ্টতার কিছু দেখলেন না, আশঙ্কা কি উৎকণ্ঠারও না। বড় বেশী দুরাশা কি দুঃসাহস প্রকাশ পেল বলেও মনে করলেন না। বরং কার্যকারণপরম্পরা ধরলে এ গৃহনির্মাণের এই-ই স্বাভাবিক পরিণতি বলে বোধ হ'ল তাঁদের।

বাসুদেব হয়ত এই প্রস্তাবই আশা করছিলেন—হয়ত সবই জানতেন তিনি। তবু একবার অস্ফুট কণ্ঠে 'নিয়তি' এই শব্দটি উচ্চারণ ক'রে মৌন এবং চিন্তাবিষ্ট হলেন।

সে সামান্য তিনটি উচ্চারিত অক্ষর উপস্থিত আর কারও কর্ণগোচর হ'ল

না। তাঁরা সকলেই শান্ত ধীর ভাবে বাসুদেবের সুচিন্তিত মতামতের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

বহুক্ষণ ধ্যানমগ্নের মতো স্থির হয়ে রইলেন শ্রীকৃষ্ণ। যেন চিন্তার কোন্ গভীরে অবগাহন করেছেন বলে বোধ হ'ল। এক সময় পাণ্ডব ভ্রাতাদের এমনও আশঙ্কা হ'তে লাগল যে তিনি বুঝি বা তন্দ্রাচ্ছন্নই হয়ে পড়েছেন। শেষে আর দ্বিধা বা অনিশ্চয়তা সহ্য করতে না পেরে যুধিষ্ঠির মৃদু কণ্ঠে তাঁকে কিছুটা সচেতন করার জন্তেই সম্বোধন করলেন, 'বাসুদেব!'

শ্রীকৃষ্ণ এবার মুখ তুলে স্থিরদৃষ্টিতে তাঁর দিকে চাইলেন। ধীরে ধীরে বললেন, 'এ প্রস্তাব অসঙ্গত কি অন্যায় নয়—অসম্ভব কিনা সেটাই বিচার্য। সত্য কথা বলতে কি, আমারই লোভ হয়েছিল—আপনাদের কাছে এ প্রস্তাব উত্থাপিত করার। শুধু একটি লোকের কথা চিন্তা ক'রেই দ্বিধা বোধ করেছি।'

'একটি লোক! কে সে?' অসহিষ্ণু ভীম প্রশ্ন করেন। তাঁর কণ্ঠে যুগপৎ অবিশ্বাস ও অবজ্ঞা।

তাঁর সে মনোভাবের প্রতি দৃকপাত মাত্র করলেন জনার্দন বলে মনে হ'ল না। তেমনিই ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন, 'মগধ-সম্রাট জরাসন্ধ। ভারতখণ্ডে এমন কোন রাজা বা রাজশক্তির কথা স্মরণ হচ্ছে না যা নাকি পাণ্ডব-ভ্রাতারা পরাজিত বা বশীভূত করতে পারবেন না। কেবল এই জরাসন্ধ সম্বন্ধেই আমার আশঙ্কা ও সংশয় আছে। এই লোকটির ব্যক্তিগত শৌর্য অপরিসীম, বাহিনী বিশাল ও অপরাজেয়। ওঁর সেনাপতিরা রণদুর্মদ ও অভিজ্ঞ, বিশ্বস্তও বটে। তার কারণ কর্মচারীদের প্রতি জরাসন্ধের অবিশ্বাস্য রকমের সদয় ও সস্নেহ ব্যবহার। ইনি কন্যাদের ক্রন্দনে ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে* বহুবার মথুরা অবরোধ করেছেন—কেবলমাত্র যাদবদের একতা ও দৃঢ় সঙ্কল্পেই কোনমতে রক্ষা পেয়েছি। অমানুষিক কষ্ট সহ্য করেছেন তাঁরা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য। আমি নিজে সে আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য দিবারাত্র পরিশ্রম করেছি; সেই জন্যই আমি এঁর শিক্ষা শক্তি বা পরাক্রম অবগত আছি। ইনি নিষ্ঠুর ও ক্রূরকর্মা—ভয়ঙ্করকর্মা। অকারণে ছিয়াশি জন রাজা ও রাজপুত্রকে পরাজিত ক'রে নিদারুণ দুর্দশার মধ্যে অন্ধকার গৃহে বন্দী ক'রে রেখেছেন। জরাসন্ধ পরাজিত ও নিহত হলে এইসব নৃপতিরা সানন্দে আপনাদের বশীভূত ও কৃতজ্ঞ থাকবেন সন্দেহ নেই। কিন্তু এতগুলি রাজা বা রাজন্য যা পারেন নি পাণ্ডবদের পক্ষে তা সহজসাধ্য হবে এমন মনে

* জরাসন্ধের দুই কন্যা কংসের স্ত্রী ছিলেন। কংস বাসুদেবের হাতে নিহত হলে এই দুই বিধবার প্রতিহিংসা-স্পৃহা স্বাভাবিক।

করার কোন কারণ নেই। সর্বশক্তি প্রয়োগেও বার বার ওঁকে প্রতিরোধ করতে পারব না বুঝেই সুদূর সিন্ধুপারে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছি।'

'তবে কি আশা পরিত্যাগই করব? বলদর্পী নিষ্ঠুর জরাসন্ধ এই ভাবেই ক্ষত্রিয় রাজাদের মাথায় পা দিয়ে চলবেন?'

কেমন এক রকম ক্ষোভ ও হতাশামিশ্রিত সুর যুধিষ্ঠিরের কণ্ঠে।

'কথনই না।' অসহিষ্ণু ভীমসেন আস্ফালন ক'রে ওঠেন। অর্জুনেরও দৃষ্টি ভ্রূকুটিবদ্ধ হয়।

ঈষৎ একটু হাসেন বাসুদেব, তাঁর নিজস্ব হাসি। বলেন, 'মহাবল বৃকোদর ও মহারথী অর্জুনের এ অধীরতা প্রশংসার্হ, ক্ষত্রিয়েরই যোগ্য। কিন্তু এক্ষেত্রে অনেকগুলি প্রশ্ন আছে। স্বাধীন, মিত্র ও করদরাজ্য—সর্বত্র থেকেই বশ্যতার নিদর্শন স্বরূপ কর সংগ্রহ ক'রে সেই অর্থে রাজসূয় যজ্ঞ করা বিধি। অশ্বমেধ যজ্ঞে ঘোড়া ছেড়ে দেওয়া হয়। সে যদৃচ্ছ ভ্রমণ করে। কেউ বাধা না দিলেই হ'ল। সেখানে পরাজয় বা বশ্যতা স্বীকারের প্রশ্নটা এত স্পষ্ট নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে তেমন কোন ছদ্ম আবরণ নেই, কর প্রদানেই অধীনতা প্রমাণিত হয়। অর্থের প্রণামী কম কি বেশী তাতে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নেই—হীনতা স্বীকারের অগৌরবটাই দুঃসহ। যাঁরা দেবেন তাঁদের অনেকেই আহত ও অপমানিত বোধ করবেন। মনে মনে সে আঘাতের জ্বালা লালন করবেন। সুতরাং আপৎকালে তাঁরা পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধ করবেন এ আশা ত্যাগ করাই ভাল। আর—ভীম ও অর্জুন যত বড় যোদ্ধাই হোন, সম্মুখসমরে জরাসন্ধের সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষার পরামর্শ আমি তাঁদের দেব না।'

'তা হ'লে এ প্রস্তাব আলোচনায় এত সময় ও বাক্য ব্যয় ক'রে লাভ কি?' ক্ষুব্ধ ভীমসেন সনিঃশ্বাসে বলে উঠলেন।

'দাঁড়ান, আমার কথা শেষ হয় নি।' বাসুদেব বললেন, 'যুদ্ধ দু'রকমে করা যায়। এক অস্ত্রের দ্বারা। আমি সম্মুখযুদ্ধে সরাসরি জরাসন্ধকে আক্রমণ করতে নিরুৎসাহ করছি। তাই বলে সে অপরাজেয় বা অমর এমন কথা বলি নি। বাহুবলে যা সাধিত না হয় তা কৌশলে হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে আমার মনে হয়—কৌশল ও বাহুবল দুই-ই প্রয়োজন হবে।'

'যথা—!' বিস্মিত অর্জুন প্রশ্ন করেন।

'সে যথাসময়েই আলোচনা করব। কৌশলের প্রশ্ন যেখানে সেখানে মন্ত্রগুপ্তির একান্ত প্রয়োজন। তোমাদের তো বলতেই হবে—কারণ এ কর্মের তোমরাই কর্তা। তবে সে সময় এখনও আসে নি। প্রস্তাব তো এখনও

পরিকল্পনাহীন কল্পনায় সীমাবদ্ধ। এই বিরাট যজ্ঞের আয়োজনও বিপুল ও বিবিধ। সঙ্কল্প স্থির হলে কর্মপ্রণালীও একটা স্থির করতে হবে। তারপর প্রাথমিক আয়োজন। দিগ্বিজয় যাত্রা তার পরের কথা। এখন সে প্রসঙ্গ নিয়ে উত্তেজিত হওয়া অর্থহীন নয় কি?'

শেষের কথাগুলি বোধ করি যুধিষ্ঠিরের ভাল মতো হৃদয়ঙ্গমও হয় নি—তিনি সেই পূর্বের একটি শব্দ নিয়েই চিন্তা ও অস্বস্তি ভোগ করছিলেন। এখন বেশ একটু জোর দিয়েই বললেন, 'কৌশল—মানে মিথ্যাচরণ নয় তো? শুভকার্যের সূচনাতে কোন মিথ্যা বা অসদাচরণ থাকে তা আমার ইচ্ছা নয়।'

এ প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠস্বর ঈষৎ যেন কঠিন হয়ে উঠল, 'মহারাজ, মিথ্যাচরণ বা মিথ্যাভাষণ ব্যতিরেকেও কৌশল অবলম্বন করা যায়। কিন্তু, আপনি শাস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রকার সর্বজ্ঞ ঋষিগণের উপদেশ আপনার অজানা নেই। দেহ ধারণ করলে, সংসারধর্ম পালন করতে হলে মিথ্যাভাষণ যে প্রায় অনিবার্য, এ তাঁরা জীবন-অভিজ্ঞতার দ্বারা উপলব্ধি করেছিলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির—এই নাম আর সত্যনিষ্ঠা আপনার এই অল্প বয়সেই অনেকের কাছে—বিশেষ পরিচিতদের মধ্যে প্রায় একার্থক হয়ে গেছে। তবু আমি বলছি, এ দেহ পরিত্যাগ করার পূর্বে আপনাকেও হয়ত মিথ্যা বলতে হবে। শাস্ত্রে আছে, সত্য বলাই ধর্মসঙ্গত, সত্যই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু সর্বথা সত্যানুসারে কর্মের অনুষ্ঠান উচিত কি—না তা স্থির করা একান্ত দুরূহ। যেখানে মিথ্যা বললে হিত হয় এবং সত্য মিথ্যার মতো অনিষ্টকর হয়ে ওঠে সেখানে সত্য বলা অনুচিত, মিথ্যা বলাই কর্তব্য। এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে মিথ্যা বলায় অধর্ম হয় না, সে সম্বন্ধে শাস্ত্রকারদের বিধান অতিশয় সুস্পষ্ট। বিবাহকালে, পরিহাসছলে, রতিসম্প্রয়োগে, প্রাণ-সংশয়ে, সর্বস্ব যেখানে বিনষ্ট হ'তে বসেছে, স্ত্রীলোকের কাছে এবং পরের উপকারের জন্য মিথ্যা বলায় দোষ নেই।* হে ভারত-অগ্রগণ্য, আপনি সেই ষড়শীতিসংখ্যক ক্ষত্রিয় নৃপতিদের কথা চিন্তা করুন দেখি—যারা কেবলমাত্র মগধাধিপতি অপেক্ষা দুর্বল এই অপরাধে কারাগৃহে অসীম দুঃখভোগ করছে, যাদের শেষ পর্যন্ত সঙ্কল্পিত শতসংখ্যা পূর্ণ হলেই বলিদান দেওয়া হবে বলে জরাসন্ধ ঘোষণা করেছেন! বহু সজ্জন ও ব্রাহ্মণ এই মদগর্বীর কাছে অকারণে লাঞ্ছিত হচ্ছে। অবিরত অকারণ যুদ্ধযাত্রায় বহু ব্যক্তি নিহত হচ্ছে—এ শুধু তাঁর যুদ্ধবিলাস চরিতার্থ করতেই নয় কি? জরাসন্ধ বার বার মথুরা আক্রমণ করেছেন, কেবলমাত্র কন্যাদের অনুরোধে—কিন্তু তার ফলে উভয় পক্ষে কত লোক হতাহত হয়েছে তা অনুমান করতে

* মহাভারত কর্ণপর্ব, ১৬শ অধ্যায়: আদিপর্ব, ১২শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

পারেন? এমন লোককে কৌশলে বা মিথ্যাচরণের দ্বারা ধরাপৃষ্ঠ হ'তে অপসারিত করাও শ্রেয়—তাতে যদি কোন পাপ হয় তাহলে পাপ ও পুণ্য এই দুই শব্দের সংজ্ঞাই মিথ্যা!'

॥ ১৭ ॥

জরাসন্ধ নিহত হবার পর বহুদিন পর্যন্ত ফাল্গুনী বিমর্ষ হয়ে রইলেন, কোন কাজ বা আলোচনাতেই যেন আর তাঁর রুচি বা উৎসাহ রইল না। এতগুলি সদ্যমুক্ত নৃপতির সাধুবাদ, উল্লাস ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, চতুর্দিকে উত্থিত ধন্য ধন্য রবও তাঁকে তৃপ্ত করতে বা তাঁর মানসিক গ্লানি দূর করতে পারল না।

স্নাতকের ছদ্মবেশে, এক প্রকার মিথ্যা পরিচয়ে, ভৃত্যাদি বা অন্তরঙ্গ পরিজনদের যাতায়াতের পথে অদ্বার দিয়ে পুরপ্রবেশ ক'রে একেবারে বাসকক্ষে উপনীত হয়ে অতর্কিতে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করা—এ যদি চৌরকার্যের মতো গর্হিত বা কাপুরুষের আচরণ না হয় তো, সে কোন্ আচরণ, কাকে বলে তা তিনি জানেন না। যে কোন প্রকারে, ছলে বা কৌশলে কার্যসিদ্ধিই বীরের কর্ম বা ধর্ম নয়। সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয়ের শস্ত্রশিক্ষার উদ্দেশ্যও তা নয়। অথচ বাসুদেবের পরামর্শে সেই কাজই তো করতে হ'ল তাঁদের। জরাসন্ধকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান ক'রে তিনি এমন ভাবেই বৃকোদরকে এগিয়ে দিলেন যাতে বীর দীর্ঘাঙ্গ জরাসন্ধ তাকেই প্রতিযোদ্ধা নির্বাচন করেন।

এও অর্জুনের ক্ষোভের কারণ। তিনি এতদিনের সযত্ন শিক্ষা প্রয়োগের কোন সুযোগই পেলেন না। জরাসন্ধ তাঁকে বালক জ্ঞানেই পরিহার ক'রে ভীমসেনের সঙ্গে বল পরীক্ষার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। অর্জুন তাঁর সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করে পরাজিত হলে লজ্জিত হতেন—নিজের কাছে এমন অপমানিত হতেন না। নিজেকে এমন ক্ষুদ্র মনে হ'ত না।

আশ্চর্য, বাসুদেবের মতো এমন স্থির বুদ্ধি, বিরাট প্রজ্ঞা ও সূক্ষ্ম বিবেচনা এত কালের মধ্যে আর কারও যে দেখেছেন বলে তো মনে পড়ে না। এমন অত্যুত্তম মানুষও কী ক'রে অনায়াসে এই নীচজনোচিত কার্যে প্রবৃত্ত ও প্রবুদ্ধ করলেন তাঁদের—বিশেষ ভীমসেনকে! সে কথা মনে হ'লে অন্ধকার গৃহেও আরক্ত হয়ে ওঠেন ফাল্গুনী। দর্পণে বা নবনির্মিত প্রাসাদের জলাশয়ে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকাতে লজ্জা বোধ হয়। ক্রমাগত ত্রয়োদশ দিন যুদ্ধ ক'রে

চতুর্দশ দিবসে শ্রান্ত জরাসন্ধ ক্ষণকালের জন্য নিবৃত্ত হয়ে যখন কেবলমাত্র ঈষৎ নিঃশ্বাস-গ্রহণ-অবসরের জন্য আকুলতা প্রকাশ করেছেন, তখন তাঁর সেই দুর্বল ভগ্নোন্মুখ অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করার জন্যই বাসুদেব বললেন, 'ভীম, ক্লান্ত শত্রুকে অধিক পীড়ন করলে তাঁর প্রাণহানি হতে পারে—অতএব এখন তুমি মৃদু মৃদু বাহ্বাঘাত দ্বারা কোনমতে যুদ্ধের অবস্থাটা রক্ষা ক'রে যাও।' ভীম সে ইঙ্গিত বুঝেই সেই ক্লান্ত মহাবলধর জরাসন্ধকে সবলে ঘূর্ণিত, উৎক্ষিপ্ত ও পিষ্ট ক'রে নিহত করলেন। সে সময় অর্জুনের মনে হয়েছিল—এর চেয়ে তাঁর নিজের হত হওয়াও শ্রেয় ছিল! ছি! মধ্যমাগ্রজ এ কী করলেন!

কিন্তু বিরাট-পুরুষ বাসুদেব নির্বিকার। তিনি প্রশংসাই করলেন ভীমসেনকে, অজস্র স্তুতি করলেন। তিনি যে যৎপরোনাস্তি তৃপ্ত ও সিদ্ধকাম হয়েছেন—সে বিষয়েও কোন সংশয় রইল না।

এবং অনুযোগের উত্তরে অর্জুনকে বরং মৃদু তিরস্কারই করলেন। বললেন, 'পূর্ব পূর্ব কালে কোন কোন দানব তপস্যার দ্বারা, শস্ত্রাভ্যাসের দ্বারা, শিক্ষা, মনন ও একাগ্রতার দ্বারা অপরাজেয় হয়েছিলেন কিন্তু পরবর্তি কালে উদ্ধত ও ক্ষমতাগর্বিত সেই সব দানবরাই তপস্যা সদ্‌বুদ্ধি ত্যাগ ক'রে মানবের মহাশত্রুতে পরিণত হয়েছিলেন, স্বয়ং ভগবান বা মহাশক্তিকে বার বার অবতীর্ণ হতে হয়েছে সেই অশুভ নাশের জন্য—সেই মদোদ্ধত অত্যাচারী দানবদের ধ্বংসের জন্য। নৈকষেয় রাবণও মহাতপস্বী ও মহাবীর ছিলেন। সেই রাবণের শক্তিকে চূর্ণ ও ধ্বংস করার জন্য ভগবান রামচন্দ্র রাবণের অনুজকে কবলিত ক'রে যুদ্ধের আগে গৃহসন্ধান নিয়েছিলেন। বিভীষণের সাহায্যে চোরের মতো গোপন পথে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে গিয়ে উপবাসী যজ্ঞসঙ্কল্পিত মেঘনাদকে বধ করেছিলেন রামানুজ লক্ষ্মণ। তারও পূর্বে বলিকে দমন করতে বামন-রূপ ধরে ভগবান রীতিমতো মিথ্যাচরণ, ছলনাই করেছিলেন। সিংহ প্রভৃতি অরণ্যের হিংস্র পশু বধ করতে মানুষ নখদন্ত ব্যবহার করে না, ছলনা ও লৌহাস্ত্রের আশ্রয় নেয়। তারা কি পাপাচরণ করে? তোমরা শিকারে গিয়ে যখন মৃগ শশক প্রভৃতি নিরীহ পশুদের বধ করো, নিজেদের রসনা-তৃপ্তির জন্য, তখন তোমার এসব নীতিজ্ঞান কোথায় থাকে? জরাসন্ধ তাঁর থেকে দুর্বল নৃপতিদের বিনা কারণে পর্যুদস্ত লাঞ্ছিত ক'রে অশেষ কষ্টের মধ্যে কারাগারে বন্দী ক'রে রেখেছিলেন—সেটা দুর্বলতার সুযোগ নয়? ফাল্গুনী, সংসার—বিশেষ রাজকার্যের হিসাব বড় জটিল। বিনা বিচারে বা বিবেচনায় কতকগুলো পুরাতন নীতিবোধ ও মূল্যবোধকে আঁকড়ে ধরে থেকো না, বহুদিন ধরে প্রচলিত আছে বলেই কোন ধারণা বা বিশ্বাস সত্য

হয়ে ওঠে না। তাদের অভ্রান্ত বলে মনে করারও প্রয়োজন নেই। আর মায়া মমতা অত অস্থানে বিতরণ করো না। যদি কোন দিন যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে দেখ আত্মীয়রা আত্মীয়দের অন্যায় যুদ্ধে পরাজিত করছে, প্রবীণ বিখ্যাত যোদ্ধারা কৌশলে সকলে মিলে একটা সামান্য বালককে বধ ক'রে জয়গৌরবে উৎফুল্ল হচ্ছে—বিস্মিত কি দুঃখিত হয়ো না। পৃথিবীর নিয়ম মনে ক'রে সান্ত্বনা লাভ ক'রো।'

কথাগুলো যে সত্য তা অর্জুনও স্বীকার করতে বাধ্য হন। তবু কোথায় যেন অন্যায়বোধের কাঁটাটা মন থেকে যেতে চায় না। মনে হয় শ্রীকৃষ্ণ অকারণেই ভয় পেয়েছিলেন, গাণ্ডীব হাতে থাকতে তাঁকে জরাসন্ধ পরাজিত করতে পারতেন না।

অবশ্য বেশী দিন বিমর্ষ কি অভিমানাহত থাকার অবসরও দিলেন না বাসুদেব।

তাঁরই উপদেশে ও যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে অবিলম্বে এঁদের দিগ্বিজয় যাত্রা করতে হ'ল।

চার ভাই সসৈন্যে চার দিকে যাত্রা করলেন। অর্জুন গেলেন উত্তর দিকে, ভীমসেন পূর্ব দিকে, সহদেব দক্ষিণে ও নকুল পশ্চিমে।

এই দিগ্বিজয় যাত্রাতেই অর্জুনের ক্ষোভ লজ্জায় পরিণত হ'ল, তাঁর বীরত্বের অহমিকাও খর্ব হ'ল কিছু।

কয়েকটি দেশের নৃপতিদের কাছ থেকে সম্রাটের প্রাপ্য সম্মানকর গ্রহণ ক'রে—তাঁদের আনুগত্য স্বীকার করিয়ে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে প্রবীণ অধিপতি ভগদত্ত দুর্ধর্ষ বীর এবং কৌরবদের প্রতি সমধিক প্রীতিসম্পন্ন। তিনি সহজে বশ্যতা স্বীকার করবেন কেন? অর্জুনও তা আশা করেন নি, তেমনি ভগদত্তকে পরাজিত করা কঠিন হবে এমনও কল্পনা করেন নি। কিন্তু অষ্টাহ ব্যাপী ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলার পরও কোন পক্ষই অপরকে পরাজিত করতে পারলেন না।

তখন ভগদত্তই অবশ্য সহাস্য ও সস্নেহ-বচনে বললেন, 'বৎস, আমি তোমার পিতৃবন্ধু, তুমি আমার পুত্রতুল্য। তোমার শৌর্যে আমি প্রীত হয়েছি, আমার সমযোদ্ধা হবারই উপযুক্ত তা স্বীকার করছি। তোমার প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ বা অসূয়া নেই, তোমাকে বধ করার ইচ্ছা তো নেইই। তোমার বল পরীক্ষা করার জন্যেই এইটুকু যুদ্ধ করা। তুমি কি চাও বল, আমি সন্তুষ্টচিত্তেই তা দিচ্ছি।'

দিলেনও তা। রাজচক্রবর্তীর প্রাপ্য হিসেবে নানাবিধ ধনরত্ন বস্ত্র হস্তী আদি প্রসন্ন মনেই দিলেন ধনঞ্জয়কে!

পরাজয় হ'ল না ঠিকই, তবু অর্জুনের মনে হ'ল—অন্তরীক্ষে এবং দূরে থেকেও বাসুদেব ঈষৎ সানুকম্পা বিদ্রূপের হাসি হাসছেন।

ভগদত্ত তাঁকে পরাজিত করতে পারেন নি সত্য কথা, তেমনি নিজেও পরাজিত হন নি। ক্লান্তও হন নি। হয়ত এমন আরও সপ্তাহকাল যুদ্ধ চললে হ'তে পারতেন—সে সম্ভাবনা ধনঞ্জয় সম্বন্ধেও ছিল। ভগদত্তর সঙ্গে যুদ্ধেই এই অবস্থা, জরাসন্ধর সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলে কী হ'ত তা কে জানে। হয়ত বা পরাজিতই হতেন। জরাসন্ধর বধ্য নৃপতিদের শত সংখ্যা পূরণে আরেকটি সংখ্যা যোগ হ'ত।

আরও একটি আঘাত পেলেন অর্জুন, মানস সরোবর পার হয়ে চিরতুষারা-বৃত হরিবর্ষে পৌঁছে। সেখানকার প্রধান প্রবেশপথে প্রহরারত রাজ্যরক্ষীরা ওঁদের আগমনে ভীতও হলেন না, রুষ্টও হলেন না, উগ্রতা কিংবা যুদ্ধেচ্ছাও প্রকাশ করলেন না। বরং যেন, বালকোচিত অবোধ আচরণ দেখলে অভি-ভাবকরা যেমন সস্নেহ প্রশ্রয়ের হাসি হাসেন, তেমনি ভাবেই মৃদু হাস্য করলেন। বললেন, 'ভদ্র, এখানে প্রবেশের বৃথা চেষ্টা করো না। এটা তুষার-মরুর দেশ, এ দেশ সর্বদা নিবিড় দুর্ভেদ্য নিশ্ছিদ্র সর্বাবলোপকারী কুহেলিকায় আচ্ছন্ন থাকে। এখানে প্রবেশ করলে তুমি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী বা প্রতিপক্ষকে দেখতে পাবে না, কিন্তু যারা এদেশবাসী, এই চিরকুহেলিকায় অভ্যস্ত, তারা ইচ্ছা করলে অনায়াসে অতর্কিতে তোমাকে ও তোমার সঙ্গীদের বধ করতে পারবে। এখানে প্রকৃতিও ভয়ঙ্করী, বস্তুত তিনিই তোমাদের প্রতিপক্ষ। কোন সাধারণ মানুষই এখানে প্রবেশ ক'রে আজ পর্যন্ত জীবিত প্রত্যাবৃত্ত হ'তে পারে নি। কোথাও অতলস্পর্শী তুষারকর্দম—পদক্ষেপ মাত্রে সে অতলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, কোথাও বা প্রায় শূন্যাবলম্বী শিথিল বিরাট হিমবাহ, সামান্য পদশব্দেও মহাভয়ঙ্কর শব্দে নেমে এসে শব্দকারীকে সদলে সমাহিত করবে। যে এখানে জন্মগ্রহণ করে নি, সে এখানে মুহূর্তকালও জীবিত থাকতে পারবে না। আর বলপ্রয়োগ বা শক্তি পরীক্ষার প্রয়োজনই বা কি? তোমাদের যদি কোন প্রার্থনা বা অভীপ্সা থাকে তো বল, সাধ্য থাকলে আমরা হৃষ্টচিত্তেই তা পূরণ করব।'

চেয়ে দেখলেনও ধনঞ্জয়। কিন্তু তাতে নেত্র উন্মীলনই সার হ'ল। কিছুই দেখা গেল না। কোথাও কোন পাদপ, শস্য এমন কি শষ্পের শ্যামলিমাও

নয়ন-গোচর হয় না। দৃষ্টি চলেও না বেশীদূর। বোধ হয় এখানে চন্দ্রস্থর্যের আলোক প্রবেশ করে না, তুষারেরই একটা প্রতিফলিত অনৈসর্গিক অপ্রাকৃত আলোক মাত্র ভরসা, তাও কুহেলিকায় আবৃত, ছায়ান্ধকার ক'রে রেখেছে সে নিবিড় স্থচীভেগ্য বাষ্পাভ কুহেলিকা। যেন একটা ভয়াবহ, অজ্ঞেয় অজ্ঞাত রহস্যে ঢাকা এ সমগ্র ভূখণ্ড। যে দেশে কেউ ইন্দ্রিয়গোচর নয়, কেউ ঈর্ষা প্রকাশ করে না, অপরের ঈর্ষা প্রতিহত করার চেষ্টাও করে না—সে দেশে কার সঙ্গে যুদ্ধ করবেন তিনি ?

অগত্যা অর্জুনকে তাঁর বক্তব্য সেখানেই বলতে হ'ল। রক্ষীবাহিনী প্রসন্ন ঔদার্যের সঙ্গেই তাঁর ইচ্ছা পূরণ করলেন। ওদেশের নিজস্ব কিছু কিছু অস্ত্র এবং দীর্ঘলোমাবৃত পশুচর্ম দিলেন সম্রাটের কর স্বরূপ। সেই সঙ্গে কিছু মূল্যবান মণিরত্ন, সম্রাট আভরণ হিসাবে ব্যবহার করবেন—এই ইচ্ছা প্রকাশ ক'রে।

প্রাপ্য পেলেন, অভীষ্ট পূর্ণ হ'ল, কার্য সিদ্ধ—বিনা যুদ্ধে রক্তপাতে এমন কি কোনপ্রকারের তিক্ততা ব্যতিরেকেই—তবু অর্জুন নিজেকে পরাজিত ও অসম্মানিত বোধ করতে লাগলেন। এখানে প্রতিপক্ষকে দেখা মাত্র গেল না, দেখা করলই না কেউ, যেন তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই নীরব ও অদৃশ্য রইল তারা। শুধু প্রাকৃতিক অবস্থান ও পরিবেশের কাছেই পরাভূত হয়ে সে উপেক্ষা নিরুত্তরে সহ্য করতে হ'ল। এই মানুষের শৌর্য ও বীর্যের পরিমাণ ও পরিণাম! এরই অহঙ্কারে তিনি বাস্থদেবের ভীরুতা প্রকাশ ও কৌশল অবলম্বনের প্রস্তাবে ও শত্রুর শারীরিক দুর্বলতার স্থযোগ নেওয়ার নির্দেশে—হীনজনোচিত আচরণ ভেবে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন ? ধিক্!

অবশ্য আর কোথাও কোন অস্থবিধা হয় নি।

সামান্য সামান্য যুদ্ধ যে না করতে হয়েছে তা নয়, কিন্তু সর্বত্রই পাণ্ডবভ্রাতারা অনায়াসে জয়লাভ করেছেন। একমাত্র মাহিষ্মতীতে গিয়ে সহদেব একটু বিপন্ন হয়েছিলেন। মাহিষ্মতী ঠিক নারীশাসিত না হলেও নারীরাই প্রধান সে রাজ্যে। সেখানে পুরনারীরা প্রকাশ্যেই স্বৈরিণীর জীবন যাপন করে কিন্তু সে আচরণকে কেউ দোষার্হ মনে করেন না। বোধ হয় তাদের শাসন করা সাধ্যাতীত বলেই সে চেষ্টা কেউ করে নি। কিন্তু রণক্ষেত্রে দেখা গেল তারা দুর্ধর্ষ, দুর্মর। ফলে, সহদেবকে হয়ত পরাজয় স্বীকার ক'রে রাজধানীতে সাহায্য প্রার্থনা ক'রে পাঠাতে হ'ত, শেষ পর্যন্ত হয়ত বা ফাল্গুনীরই আগমন আবশ্যক হয়ে

পড়ত কিন্তু সে অপমান থেকে কনিষ্ঠ পাণ্ডবকে রক্ষা করলেন রাজ-জামাতা অগ্নি। তাঁরই পরামর্শে ও মধ্যস্থতায় একটা সন্ধি স্থাপিত হ'ল, রাজা নীল নিয়মরক্ষা মতো একটু সামান্য করও দিলেন, যজ্ঞে উপস্থিত থাকবেন সে প্রতিশ্রুতিও পাওয়া গেল। সহদেব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

এটা আকস্মিক, মাহিষ্মতীকে কেউ সংকটকেন্দ্র বলে গণ্য করেন নি। বরং কিছু দুশ্চিন্তার কারণ ছিল পূর্বদিকেই।

চেদীরাজ শিশুপাল জরাসন্ধের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন ছিলেন। যিনি তাঁকে সদ্য নিহত ক'রে এসেছেন সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে শিশুপালের মনোভাব কেমন হবে তা নিয়ে একটু আশঙ্কা সকলেরই ছিল। কিন্তু শিশুপাল সে আশঙ্কাকে অমূলক প্রমাণিত ক'রে বেশ সাদরে ও সসম্মানেই অভ্যর্থনা করলেন ভীমসেনকে। প্রাথমিক আপ্যায়ন ও কুশল প্রশ্ন শেষ হ'তে সহাস্যেই এই শুভাগমনের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করলেন, এবং তা জ্ঞাত হবার পরও তাঁর অমায়িকতা বা আত্মীয়বৎ ব্যবহার খর্ব হ'ল না। যুধিষ্ঠির সর্বথা রাজচক্রবর্তী হওয়ার উপযুক্ত—এ সত্য তিনি সহজেই মেনে নিলেন। প্রচুর কর ও উপঢৌকন দিলেন—তারপরও ভীমসেনকে ছাড়তে চাইলেন না। তিনি ভোজনপ্রিয় এই খ্যাতি সুদূর চেদীতেও এসে পৌচেছিল। শিশুপাল সেজন্য এত প্রচুর ও বহুবিচিত্র ভোজ্যের ব্যবস্থা করলেন যে ভীম প্রায় পক্ষকাল সেখানে থেকে গেলেন—এর পূর্বে সে স্থান ত্যাগ করতে পারলেন না।

চেদীরাজ থেকেও পাণ্ডবদের আশঙ্কা ছিল অঙ্গরাজ কর্ণ সম্বন্ধে। অঙ্গ কৌরবদের আশ্রিতরাজ্য, মিত্ররাজ্যও। তাছাড়াও কারণ ছিল বিরাগ বা বিদ্বেষের। কর্ণ মহেন্দ্রদুর্লভ শৌর্যের অধিকারী ও অলোকসাধারণ উদার চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও সামান্য কুলে জন্মগ্রহণ করার জন্য কোন ক্ষেত্রেই তাঁর যোগ্য মর্যাদা পান নি। কৈশোর বয়সে বহু ক্লেশে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ভার্গবের কাছে অস্ত্র শিক্ষা করেছিলেন। কিন্তু সম্যক ক্ষেত্র পান নি তার পরিচয় দেবার। শেষে ভাগ্যান্বেষণে হস্তিনায় এসে পাণ্ডবদের অস্ত্রশিক্ষা পরীক্ষার রঙ্গক্ষেত্রে গিয়ে সেদিনের শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর অর্জুনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে চেয়েছিলেন কিন্তু ভাস্করের মতো তেজস্বী এই তরুণের আকস্মিক আবির্ভাব ও স্পর্ধাপ্রকাশে পরীক্ষার প্রধান উদ্যোক্তা আচার্য কৃপ একটু ভীতই হয়ে পড়েছিলেন, পাছে তাঁর আশ্রয়দাতাদের সন্তান ও এক সময়ের ছাত্র অর্জুন শেষ পর্যন্ত হতমান হন—এই আশঙ্কায়, কর্ণ সূত বা সারথি-পুত্র, রাজপুত্রদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অযোগ্য—এই অছিলায় তাঁকে সে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিলেন।

এ-ই ক্ষোভের আরম্ভ, শেষ নয়।

ওঁর তেজঃপুঞ্জ আকৃতি ও উদার প্রশস্ত ললাট দেখে অনেকেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন, পাণ্ডবযশঈর্ষী দুর্যোধনও তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি সেই মুহূর্তেই তাঁকে করদরাজ্য অঙ্গের অধিপতি রূপে ঘোষণা করলেন ও তদ্দণ্ডেই যথারীতি শাস্ত্রানুযায়ী অভিষেকের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু সে পর্ব শেষ হ'লে কর্ণ আবার যখন ধনুকে হাত দিয়েছেন—'রাজমাতা কুন্তী মূর্ছিতা হয়ে পড়েছেন' এই রব তুলে আচার্য কৃপ পরীক্ষার সমাপ্তি ঘোষণা ক'রে দিলেন।

ভাগ্য! জন্মলগ্নে প্রতিকূল নক্ষত্রাবস্থানের জন্য দেবঅংশে জন্মগ্রহণ ক'রেও তিনি পিতৃপরিচয়ে বঞ্চিত। কুন্তীরই পুত্র তিনি, কলঙ্কিত-পরিচয় কানীন পুত্র, কিন্তু সে-পরিচয় তখনও পর্যন্ত কেউ জানত না, কর্ণ নিজেও না। এক মৃৎপাত্রে সদ্যোজাত শিশু ভেসে যাচ্ছে, ঐ বয়সেই সে তেজঃপুঞ্জ কান্তি, সহজাত কবচ ও কুণ্ডলধারী—দেখে সারথি অধিরথ দয়ার্দ্র হয়ে তুলে গৃহে এনেছিলেন, এবং পুত্রবৎ লালন করেছিলেন। সেই সূত্রেই তাঁকে সকলে সূতপুত্র বলে জানে।

অবশ্য এ পরিচয় জানলেও যিনি জন্মক্ষণে মাতৃত্যক্ত শিশুর জীবন ও প্রাণ-রক্ষা করেছেন, তাঁর পরিচয় কর্ণ ত্যাগ করতেন কিনা সন্দেহ। সে প্রকৃতির অকৃতজ্ঞ সুযোগসন্ধানী ছিলেন না কর্ণ।

অথচ এই পরিচয়ের জন্যই পাঞ্চাল স্বয়ম্বর সভায় দ্রৌপদী তাঁকে মর্মান্তিক অপমান করেছেন। সর্বপ্রকার যোগ্যতা সত্ত্বেও স্বয়ম্বরের পণ পরীক্ষা করার ন্যায্য সুযোগ দেওয়া হয় নি তাঁকে। ধৃষ্টদ্যুম্ন পণ ঘোষণা করার সময় কোন বৃত্তিগত বা জাতিগত বাধা উল্লেখ করেন নি। তৎসত্ত্বেও দ্রৌপদী বলেছিলেন, 'সূতপুত্রের কণ্ঠে বরমাল্য দানের পূর্বে আমি আত্মহত্যা করব, সেও শ্রেয়।' কর্ণ তখন অনায়াসে পূর্বের ঘোষণা স্মরণ করিয়ে নিজের দাবী প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন কিন্তু সে প্রবৃত্তি তাঁর হয় নি। তিনি করুণমধুর হেসে অভয় ও আশ্বাস দিয়েছিলেন, 'কল্যাণী তুমি সুখী হও, সুখে থাকো। আমার জন্য তোমায় অকালে জীবন নষ্ট করতে হবে না!'

কে জানে অত্যন্ত রূঢ় ও অন্যায় আচরণের, অকারণ অপমানের এই মার্জিত ভদ্র প্রতিশোধ সেদিন দ্রৌপদী উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন কি না!

সে যাই হোক, পাণ্ডবদের সম্বন্ধে তাঁর ঈর্ষা ও বিদ্বেষ স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে তিনি বিনাযুদ্ধে কর দেবেন তা কেউ আশা করেন নি। ভীমও যুদ্ধের জন্যই প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু কর্ণ সে দিক দিয়েই গেলেন না, বরং সপার্ষদ প্রত্যুদ্গমন ক'রে এসে আন্তরিক প্রীতিনিষেকের সঙ্গেই ভীমকে অভ্যর্থনা করলেন,

সবিনয়েই আপ্যায়ন ও আতিথ্যগ্রহণের আমন্ত্রণ জানালেন।

তবু ভীম একটু সন্দিহান ছিলেন। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বললেন, 'কিন্তু আমি শুদ্ধমাত্র বন্ধুত্ব স্থাপন বা প্রীতিবিনিময়ের জন্যেই আসি নি। মহারাজচক্রবর্তী পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের অভিলাষ করেছেন, ভারতখণ্ডের তাবৎ রাজন্য কর দিয়ে বশ্যতা স্বীকার না করলে সে যজ্ঞ সম্ভব নয়। আমি সেই কর সংগ্রহের জন্যই এসেছি। এ তথ্য জেনেও আমাকে অভ্যর্থনা করবেন কিনা ভেবে দেখুন। কর পাওয়া যাবে—এ প্রতিশ্রুতি না পেলে আপনার আতিথ্য-গ্রহণ করতে পারব না—কারণ কারও আতিথ্যগ্রহণ করার পর তার সঙ্গে যে যুদ্ধ করে সে কাপুরুষ ও কুলাঙ্গার।'

কর্ণ প্রায় বলপ্রয়োগে তাঁকে বক্ষলগ্ন ও আলিঙ্গনাবদ্ধ ক'রে বললেন, 'প্রিয়বর, কর্ণের কাছে প্রার্থী হয়ে এসে কেউ ফিরে যায় না—এরকম একটা জনশ্রুতি আছে। তুমি কি তা শোন নি?'

'কী বিপদ! সে তো ভিক্ষা, যাচ্ঞা। আমি এসেছি সম্রাটের প্রাপ্য কর চাইতে।' ভীম যেন একটু বিমূঢ়ই হয়ে পড়েন।

'সেও তো প্রার্থনা। কর প্রার্থনাই করতে এসেছ, বশ্যতাও—তুমি চাইছ। ভিক্ষা শব্দে আমার আপত্তি আছে। প্রার্থীর প্রার্থনা, অভিলাষীর অভিলাষ পূর্ণ করা মানুষের পক্ষে একটা মহান সুযোগ, যে তা পারে সেই কৃতজ্ঞ, কৃতার্থ হয়। আমি তোমার কাছে সেই পুণ্য সুযোগই প্রার্থনা করছি ভাই ভীম!'

ভীম লজ্জায় অধোবদন হয়ে স্বীয় রূঢ়তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন।

এই অভ্যর্থনাতেই ভীমসেনের বিস্ময়ের অবধি ছিল না, পরবর্তী কয়দিনে সে বিস্ময় ক্রমশঃ তাঁকে বিহ্বল ক'রে দিল।

আদর আপ্যায়ন আতিথ্য এই কয়মাসে প্রচুর পেলেন বৈকি, চেদীরাজ তো আতিথ্যের চূড়ান্ত করেছেন—কিন্তু কর্ণের আচরণ, সস্নেহ সপ্রীতি ব্যবহার যেন ভিন্ন রকম, এর কি বর্ণনা দেবেন ভেবে পান না ভীমসেন। এ আন্তরিকতা অনুভব করা যায়—এর কোন অভিধা দেওয়া যায় না। আত্মীয়বৎ? না, আত্মীয়ের থেকে অনেক বেশী। জ্যেষ্ঠ সহোদর বহুকাল-পরে-প্রত্যাগত অতিপ্রিয় অনুজকে যেমন আদর করেন—কর্ণের আচরণও কতকটা সেই রকম।

বোঝেন না কর্ণ নিজেও। নিজের আচরণ, এই মানসজটিলতা নিজের কাছেই দুর্বোধ্য মনে হয়। এ কী অদ্ভুত অকারণ প্রীতিরস তাঁর চিত্ত হ'তেস্বতঃই উৎসারিত হয় এই ভীমকান্তি রূঢ়ভাষী, অতিখাদ্যলোলুপ ভীমসেনকে দেখে!

বাৎসল্য ? অনেকটা সেই রকমই। মনে হয় বুঝি কোন্ এক অদৃশ্য বন্ধন তাঁকে অমোঘ আকর্ষণে টানছে এই তরুণটির দিকে, কোন্ এক রহস্য উদ্বেল উত্তাল হয়ে উঠেছে রক্তে। একে সমাদর ক'রে সাধ মেটে না। একে তৃপ্ত ক'রে তৃপ্তি হয় না।

তবু একসময় বিদায় দিতে হয়।

ভীমও, যেন অনিচ্ছাতেই একদা সচেতন হয়ে ওঠেন। যত আলস্য বিলাসের আয়োজন থাক—কাজেই এসেছেন, ফিরতে হবে, অযথা কালবিলম্ব করা উচিত নয়—এ তথ্যটাও কিছুতে ভুলতে পারেন না। কর্ণ করস্বরূপ যথেষ্ট অর্থ ও অন্যান্য বস্তু দিয়েছেন। উপহার উপঢৌকনও তার সঙ্গে। প্রার্থীর আকাঙ্ক্ষার অতীত দেওয়াই তাঁর স্বভাব, এক্ষেত্রে অন্তরের তাগিদ যেন আরও বেশী। সুতরাং কালহরণের আর কোন প্রয়োজনও নেই ; নিজের বিবেককে বোঝানো যায়—এমন কোন যুক্তিও নেই।

বিদায়কালে সৌজন্য বিনিময় আলিঙ্গন ইত্যাদির সময় কর্ণ আরও এক পাদ অগ্রসর হলেন যেন। আত্মজ বা সহোদর অনুজকে বিদায় দেওয়ার সময় যেমন মস্তক আঘ্রাণ করার রীতি আছে তেমনিই করলেন।

ভীম বোধ করি ঠিক এতটার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি একটু বিহ্বলই হয়ে পড়লেন এই আন্তরিকতায়। এক্ষেত্রে পাদস্পর্শ করাই স্বাভাবিক, রীতিও। সমস্ত সত্তা সেই দিকেই অগ্রসর হ'তে চাইছে। নিতান্ত এ ব্যক্তি নীচজাতীয়, তাঁর প্রণামের যোগ্য নয়—এই কথা স্মরণ ক'রেই সম্বরণ করলেন নিজেকে।

প্রণাম করতে না পারলেও ভীমসেন কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁর কৃতজ্ঞতা নিবেদন ক'রে বললেন, 'মহারাজচক্রবর্তী যুধিষ্ঠিরের পক্ষ থেকে আমি আপনাকে সসম্মান ও সাদর আমন্ত্রণ পূর্বেই জানিয়েছি, এবার আমার পক্ষ থেকে জানাচ্ছি। আমরা আপনার শুভাগমন প্রত্যাশায় প্রহর গণনা করব। আপনি যে আদর-আপ্যায়ন করেছেন তার শতাংশও করতে পারব না হয়ত—আর তা করতে চাইও না। কারও কারও কাছে ঋণী থাকাই সুখের, আপনি সেই লোক। তবে আশা করছি আদর আপ্যায়ন আতিথেয়তার ত্রুটিবিচ্যুতি আন্তরিকতায় পুরিয়ে যাবে। আপনার বন্ধুত্ব ও প্রীতি লাভ করলে আমার সব ভ্রাতারাই সুখী ও কৃতার্থ বোধ করবেন। আপনি আমাদের পঞ্চভ্রাতার অগ্রজস্থানীয় বন্ধু হয়ে থাকবেন, এ-ই আমার আশা ও প্রার্থনা।'

কর্ণ হাসলেন। করুণমধুর হাসি—ঔদার্যে ঈর্ষায় মেশা। বললেন, 'তোমাদের

সব কজন ভ্রাতার সঙ্গেই সৌহার্দ্য স্থাপন সম্ভব—কিন্তু অর্জুন? না, সে ইহজন্মে আর হয়ে উঠবে না!'

'কেন?' বিস্মিত হন ভীমসেন, 'তার সঙ্গে তো কোন শত্রুতার কারণ ঘটে নি আপনার। কখনও কোন প্রকাশ্য আহবে আপনারা পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছেন বলেও তো শুনি নি—?'

'না, তেমন ঘটনা ঘটে নি, এবং সেইটেই বিদ্বেষের কারণ হয়ে উঠেছে।'

'তার অর্থ?' ভীমসেন আরও বিমূঢ় বোধ করেন নিজেকে।

'শত্রুতা নয়—প্রতিদ্বন্দ্বিতাও নয়—প্রতিযোগিতাই করতে চেয়েছিলাম। প্রতিযোগিতায় পরাজিত হতাম অথবা জয়লাভ করতাম। তাতে বৈরিতা বা বিদ্বেষের কোন প্রশ্ন থাকত না। কিন্তু সে সুযোগ বা অবসর আমাকে দেওয়া হয় নি। দু-দুবার সে চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হয়েছি। তুচ্ছ কারণে আমার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে—ভিক্ষার্থী ভিক্ষা পায়, আমি তাও পাই নি। একবার তোমাদের পরীক্ষা-রঙ্গশালায় আর একবার দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে।'

'কিন্তু তার মধ্যে তো অর্জুনের কোন হাত ছিল না!'

'সেও যেমন সত্য তেমনি আমার এই ব্যর্থতার জ্বালা, অবিচারের এই চিত্ত-ক্ষোভও সত্য। একবার প্রতিযোগিতার ন্যায্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছি ক্রূরমনা এক ব্রাহ্মণের কৌশলে আর একবার বঞ্চিত হয়েছি এক স্ত্রীলোকের অর্থহীন জাতি-অভিমানে। রাজকীয় ঘোষণাও মিথ্যা ক'রে দিয়েছেন তিনি। যেটা সাময়িক প্রতিযোগিতায় শেষ হয়ে স্থায়ী বন্ধুত্বের সম্পর্কে পরিণত হতে পারত, সেটাই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার আকার ধারণ করেছে আমার মনে, ক্রমশঃ বৈরিতায় পরিণত হয়েছে।...না, এখন আর সখ্য সম্ভব নয়। এখন অর্জুনের সঙ্গে কোন সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ না হতে পারা পর্যন্ত আমার শান্তি বা স্বস্তি নেই, শস্ত্র-চালনায় কে অধিকতর পারদর্শী সেটা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত।...আর, সে যুদ্ধের ফলাফলও জানি—হয় অর্জুন নয় কর্ণ বিদায় নেবে এ ধরাপৃষ্ঠ থেকে। সুতরাং এ জন্মে তার সঙ্গে মিত্রতা সম্ভব হবে না ভাই বৃকোদর। মৃত্যুতে আমার দুঃখ নেই, তার জন্য বিন্দুমাত্রও চিন্তিত নই, শুধু তার আগে পূর্বে আমি এই সত্যই প্রতিষ্ঠিত করতে চাই যে যোদ্ধা হিসেবে শস্ত্রশাস্ত্রজ্ঞ হিসেবে অর্জুনের থেকে কোন অংশেই আমি হীন বা নিকৃষ্ট নই। এই-ই এখন আমার ধ্যানজ্ঞান, স্বপ্ন।'

পাণ্ডবরা সসম্মানে ও সবিনয়েই চতুর্দিকে নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছিলেন। শত সহস্র ব্রাহ্মণ সে কার্যে নিযুক্ত হয়েছিল ; স্বয়ং সহদেবকে এই সুকঠিন কার্যের ভার দেওয়া হয়েছিল, নিমন্ত্রিতের তালিকা প্রস্তুত করার। কারণ তিনি ধীর স্থির হিসাবী। আর কোনও কার্যে তিনি লিপ্ত হয়ে না পড়েন বা তাঁর উপর কেউ অন্য কোন কার্যের ভার না দেন—সে বিষয়ে মহারাজচক্রবর্তীর পরিষ্কার নির্দেশ ছিল।

বস্তুত তিনি নিজেও এ বিষয়ে বিশেষ চিন্তান্বিত ছিলেন।

যাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে কর সংগ্রহ করতে হয়েছে—তাঁদেরও মনে পরাজয়ের আত্মগ্লানি বা অসহায় অবস্থার জন্য বেদনাবোধের তীব্রতা ও তিক্ততা না থাকে ; বিজয়ীপক্ষের বাক্যে-কার্যে-ব্যবহারে কোন ঔদ্ধত্য, অবহেলা বা অহংকার প্রকাশ না পায়—পাণ্ডবভ্রাতাদের সেজন্য যত্নের কোন ত্রুটি ছিল না, অবধি ছিল না উদ্বেগের। যুধিষ্ঠির দিগ্বিজয় যাত্রার প্রাক্কালে বার বার এ বিষয়ে অনুজদের সতর্ক ক'রে দিয়েও যেন নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি—কিছুদিন পরে পরেই দূতের হাতে পত্র দিয়ে সে বিষয়ে পুনঃসচেতন ক'রে দিয়েছেন।

ভ্রাতাদের জন্য তত দুশ্চিন্তা ছিল না, যতটা ছিল তাঁদের অনুগামী সেনা ও সেনানায়কদের সম্বন্ধে। বিজিতদের সম্পদ লুণ্ঠন করা বিজয়ী সেনাদের পক্ষে অপরাধ নয়—এ বিশ্বাস তাদের মজ্জাগত। এই পরস্বলোলুপদের প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখা—তাদের সংযত রাখার কথাই বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কি ভাবে তাদের উন্মত্ত লোভকে বল্‌গাবদ্ধ রাখতে হবে, কী পরিমাণ কঠোর হস্তে তাদের সহজ দর্প ও অপরের প্রতি তাচ্ছিল্য ঔদাসীন্যকে চূর্ণ করতে হবে—এ যুদ্ধ যে কিছুই নয়, এ জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন কোন চূড়ান্ত পর্যায়ের নয়, বরং এটা এক শ্রেণীর শক্তি পরীক্ষার ক্রীড়া মাত্র ; সেই জন্যই বিজিতের প্রতি সৌজন্য ও বিনয়ের ভাবকে প্রেম-প্রীতির পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে—সে সম্বন্ধে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নির্দেশ থাকত ঐ সব পত্রে।

যদিচ তিনি বার বারই স্বীকার করতেন যে এ সব উপদেশ ও তার গূঢ়ার্থ—বহুদূর-ভবিষ্যৎ-প্রসারী ফলাফল সম্বন্ধে সচেতনতা—বাসুদেবেরই দূরদৃষ্টি ও প্রশাসনিক প্রজ্ঞার ফল, শ্রীকৃষ্ণই এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন—তবু এর মধ্যে যে তাঁর স্বভাবসুলভ ভদ্রতাবোধও কম কাজ করে নি, সে বিষয়ে কারও দ্বিমত ছিল না। বাসুদেব অন্তত এই পরিমাণ আতিশয্য

প্রকাশ করবেন না। শেষের দিকে তো নিম্ন পর্যায়ের কর্মচারীরা এই সতর্কতার বাহুল্যকে কিছুটা অনুকম্পামিশ্রিত প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতেই দেখতে শুরু করেছিল—সম্ভবত নাতিপ্রচ্ছন্ন উপহাসের দৃষ্টিতেও। ধর্মরাজ যেন অকালবৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন—এই অকারণ অতিব্যস্ততা বার্ধক্যেরই অঙ্গ।

সেই অমায়িকতার কারণেই হোক বা অত্যধিক কৌতূহলবশতই হোক—পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য ও শক্তির খ্যাতি বোধ করি তাঁদের রণবাহিনীরও পূর্বে পেঁাছে গেছে, নবনির্মিত ঐন্দ্রজালিক সভাগৃহ সম্বন্ধে কৌতূহল তো অদম্য—বিজিত নৃপতিরাও অপমান বা লজ্জায় বিমুখ থাকেন নি বা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি। ভারতের সর্ব প্রান্ত এমন কি প্রত্যন্ত প্রদেশ থেকেও স্বাধীন নৃপতি, আশ্রিত ও করদরাজগণ, শাসকবর্গ—দলে দলে এই রাজসূয় যজ্ঞ দর্শন করতে বা যজ্ঞের অঙ্গীভূত হতে এলেন। 'অঙ্গীভূত হতে' বলছি এই জন্য যে নিয়মমতো নিদর্শনস্বরূপ প্রদেয় কর যা দেবার তা তো ইতিপূর্বেই দিয়েছেন, এখানে এসেও সকলে রাশি রাশি অর্থ যজ্ঞ-ভাণ্ডারে গচ্ছিত করতে লাগলেন। এ যেন একটা প্রতিযোগিতা পড়ে গেল। যিনি সর্বাপেক্ষা নিম্নবিত্ত তিনিও সহস্র মুদ্রার কম দিলেন না। ধনী ও প্রতাপশালী রাজন্যবর্গ যজ্ঞের উদ্যোক্তা ও কর্মকর্তাদের কাছে বার বার স্পর্ধা প্রকাশ করতে লাগলেন, এই বৃহৎ কর্মের যাবতীয় ব্যয়ভার তাঁরাই বহন করবেন, মহারাজচক্রবর্তী যুধিষ্ঠির যেন সে বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা না করেন বা ব্যস্ত না হন।

এ আশ্বাসের বুঝি প্রয়োজনও ছিল।

শস্য, অর্থ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির কী পরিমাণ সঞ্চয় আছে দেখে, শুভানুধ্যায়ী আত্মীয়, মন্ত্রী ও অমাত্যগণের সঙ্গে পরামর্শ ক'রেই যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন যুধিষ্ঠির—তবু আমন্ত্রিত অভ্যাগতদের সংখ্যা যে এত বিপুল অঙ্ক ধারণ করবে তা তিনি কল্পনাও করেন নি। প্রায়-সদ্যদগ্ধ খাণ্ডব বনের বিস্তৃত ভূখণ্ড এবং ইন্দ্রপ্রস্থের চতুষ্পার্শ্বস্থ উপকণ্ঠে সীমাহীন প্রান্তর ও অরণ্যানী-ব্যাপী যেন কয়েকটি মহানগরীর পত্তন হয়ে গেল। স্কন্ধাবার ও কাষ্ঠপত্রাদি নির্মিত গৃহই অধিকাংশ, কিছু কিছু অবশ্য ভবিষ্যতের প্রয়োজন চিন্তা ক'রে প্রস্তরনির্মিত হর্ম্যও প্রস্তুত হয়েছিল, তবে সে সামান্যই—এই সাময়িক আবাস-গৃহগুলিই আয়তনে ও গণনায় সুদূরতম অনুমানকে অতিক্রম ক'রে গেল।

প্রতিটি নৃপতিই তাঁদের প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি ও সাধ্যানুযায়ী দেহরক্ষী, সারথি, অশ্বরক্ষক, ভৃত্য ও তৈজসপত্র-বাহকের বিপুল দল সঙ্গে এনেছেন। পথের নিরাপত্তার জন্য—কোন্ রাজ্য কখন অপর কোন্ রাজ্যের প্রতি বিমুখ বা

বৈরীভাবাপন্ন হয়ে পড়ে তার তো কোন স্থিরতা নেই – কিছু কিছু সৈন্যও সঙ্গে আনতে হয়েছে। যাঁদের পথ তেমন বিপজ্জনক নয় – তাঁরা মর্যাদার অঙ্গ হিসাবে অকারণেই এনেছেন।

সমাগত রাজন্যবৃন্দ অবশ্য প্রায় সকলেই প্রস্তাব করেছিলেন – অনুনয় অনুরোধই করেছিলেন বলা উচিত, যে এই অনুগামী অনুচর বা সেবকদের ব্যবস্থা তাঁরা নিজেরাই করবেন – কিন্তু পাণ্ডবদের পক্ষে তা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়, তাতে সম্রাটের সম্মান থাকে না – তাই তাঁরা সে কথায় কর্ণপাতও করেন নি, করজোড়ে প্রস্তাবকারীদের নিরস্ত করেছেন। বলেছেন, এরা সকলেই তাঁদের অতিথি, সে দায়িত্ব বুঝেই তো নিমন্ত্রণ করেছেন। তাছাড়া শুধু রাজা বা শাসকদেরই তো আর আমন্ত্রণ করেন নি, ভারত খণ্ডের সর্বত্র ব্রাহ্মণ দূত প্রেরণ ক'রে ব্রাহ্মণ শূদ্র নির্বিশেষে সমস্ত বিশিষ্ট ও গণ্য ব্যক্তিদেরই নিমন্ত্রণ করেছিলেন। আয়োজনও সেই অনুপাতেই করা হয়েছিল। কিছু বেশী ধরা হবে তাও স্বাভাবিক। সুতরাং বাস্তব কল্পনাপেক্ষা বিশালতর রূপ পরিগ্রহণ করলেও লজ্জিত বা অপমানিত হবার কোন কারণ ঘটল না। পূর্বাহ্নেই উপযুক্ত গৃহশিল্পী নিয়োগ ক'রে অতিথিদের মর্যাদা ও প্রয়োজনানুসারে আবাস সকল নির্মাণ করা হয়েছিল। উদ্বেলিত সমুদ্রতরঙ্গের মতো জনসমাগম দেখে এখন সে কর্মের পরিধি বিস্তৃততর ও দ্রুততর ক'রে দিলেন মাত্র।

গৃহনির্মাণ-কার্য যেমন যেমন অগ্রসর হতে লাগল, আবাসযোগ্য বোধ হতেই কর্মচারীরা বস্ত্র, শয্যা, পানাহারের পাত্র, অন্যান্য তৈজস-পত্রাদি হিসাব ক'রে রেখে যেতে লাগলেন। ইতিমধ্যেই সহস্র সহস্র দুগ্ধবতী গাভী, সূপকার-পাচক-সেবক, সুদর্শন দাসদাসী সংগৃহীত হয়েছিল, প্রয়োজনমতো সংখ্যা হিসাব ক'রে সরবরাহ করা হ'ল। এছাড়া অতিথিদের চিত্তবিনোদনের জন্য গায়ক, নর্তক, রমণী, নটনটী, সরস ও কৌতূহলোদ্দীপক আখ্যায়িকা বলে মনোরঞ্জন করতে পারেন এমন সুবক্তার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। কোন দিক দিয়েই আতিথেয়তার কোন ত্রুটি আবিষ্কার করতে না পেরেই বরং কেউ কেউ যেন ক্লান্তি ও বিরক্তি বোধ করতে লাগলেন।

পাণ্ডবভ্রাতারা এই কার্যেও মানবসাধ্যাতীত শক্তির পরিচয় দিলেন। আগমনের সময় নিজেদের সাধ্য ও অভ্যাগতদের মর্যাদানুযায়ী সকলকে ব্যক্তিগতভাবে মাল্য চন্দন উত্তরীয় মধু ও কাঞ্চনসহ অভ্যর্থনা জানাতে লাগলেন। অতিথিদের মনোভাব যাই হোক – সকলেই বলতে বাধ্য হলেন যে পাণ্ডবভ্রাতারা যে আয়োজন, যে সুব্যবস্থা এবং ব্যক্তিগতভাবে যে পরিশ্রম করলেন – প্রতিটি

ব্যক্তির স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য যে দূরদৃষ্টি ও বিবেচনার পরিচয় দিলেন, যার ফলে বিপুল এক সুনিয়ন্ত্রিত কর্মচক্র যেন আপন নিয়মে আবর্তিত হ'ল মাসাধিক কাল—তা অপর কারও পক্ষে সম্ভব হ'ত না, এতাবৎ হয়ও নি।

ব্যাসদেব লিখছেন—

"ধর্মরাজের আদেশে তাঁহাদিগকে বহুল-ভক্ষ্য-ভোজ্য সমন্বিত, দীর্ঘিকা ও বৃক্ষসমূহে সুশোভিত বাসগৃহ সমস্ত প্রদত্ত হইল। ধর্মনন্দন স্বয়ং সেই মহাত্মা নরপতিগণের পূজা করিলেন। পরে তাঁহারা সংকৃত হইয়া যথানির্দিষ্ট বাসস্থানে গমন করিলেন। ঐ সকল বাসগৃহের কোন কোনটি কৈলাসশিখরসদৃশ মনোহর, নানা দ্রব্য বিভূষিত, সুনির্মিত, শুভ্রবর্ণ, অত্যুন্নত প্রাকারনিকরে সর্বদিকে সমাবৃত, সুবর্ণজাল পরিকীর্ণ, মণিকুট্টিম শোভিত, সুখারোহণীয় সোপানপঙ্‌ক্তি সমন্বিত, মহামূল্য আসন- ও পরিচ্ছদ-বিশিষ্ট, মাল্যদান সমাকীর্ণ, উত্তম অগুরুগন্ধ সুবাসিত, হংস ও সুধাংশু সদৃশ শুভ্রবর্ণ হওয়ায় এক যোজন দূর হইতেও উত্তম দর্শনীয়; অসংকীর্ণ, সমানদ্বারযুক্ত, নানাপ্রকার উপকরণ সমন্বিত এবং অবয়বনিবহে বহুতর ধাতুবদ্ধ হওয়ায় হিমাচল শিখররাজির ন্যায় সুদৃশ্য ছিল। সমাগত ভূপালগণ তথায় বিশ্রাম করিয়া পরিশেষে প্রচুর দক্ষিণাপ্রদ, বহুল সদস্য সমুদায়ে পরিবৃত ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সন্দর্শন করিলেন। সমুদয় পার্থিব বর্গ ও মহর্ষি ব্রাহ্মণগণে সমাকীর্ণ সেই সভামণ্ডপ তৎকালে অমরনিকরে পরিবৃত স্বর্গপৃষ্ঠের ন্যায় অতিমাত্র দীপ্তি পাইতে লাগিল।"

প্রধানত সহদেবের ব্যবস্থাপনায় ব্রাহ্মণদূতগণ নিমন্ত্রণ করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু কোথাও কোথাও ওঁদের নিজেদেরও যেতে হয়েছিল। কৌরবদের কি যাদবদের দূত পাঠিয়ে নিমন্ত্রণ করা শোভন নয়; তেমনি পাঞ্চাল বা মদ্রদেশেও।

এই কারণেই স্বয়ং নকুল হস্তিনায় গিয়েছিলেন—পুরোহিত ধৌম্য সমভিব্যাহারে কৌরবদের সসম্মান নিমন্ত্রণ জানাতে।

জনশ্রুতি সত্যকে শতগুণে বর্ধিত করে, বিকৃতও করে। কিন্তু এখানে সে সম্ভাবনা কম, কারণ হস্তিনা থেকে ইন্দ্রপ্রস্থ এমন বেশীদূরের পথ নয়, দূত পাঠিয়ে সঠিক তথ্য আহরণ করা যায়, আর দুর্যোধন তাতে অবহেলা কি বিলম্বও করেন নি। যেটুকু বর্ণানুলেপ—তা ঘটেছে দূতের কল্পনাশক্তি অনুসারেই। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যেখানে লাভ হয় নি—সময়-সুযোগাভাবে—সেখানে সে শূন্যতাটুকু তাদের কল্পনা দিয়ে ভরানো ছাড়া উপায় কি? তবু যথেষ্ট সত্য সংবাদই পেয়েছিলেন। ফলে কৌতূহলে অধীর চঞ্চল হয়ে উঠছিলেন বহুকাল ধরেই—

সভাগৃহ নির্মাণের পর থেকেই। এখন নকুল যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে আমন্ত্রণ জানাতে—ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ ধৃতরাষ্ট্র তো বটেই, জ্যেষ্ঠ বোধে দুর্যোধনেরও চরণ-বন্দনা ক'রে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন নকুল, ভিক্ষা প্রার্থনার মতো ক'রে—কোন কুণ্ঠা কি অভিমানের বাধা রইল না।

কৌরবরা সদলবলে ও সপরিবারে—অর্থাৎ ভার্যাগণ পরিবৃত হয়েই ইন্দ্রপ্রস্থে এলেন। অপর নৃপতিদের সঙ্গে অতিথির সম্পর্কে—কৌরব-যাদব-পাঞ্চালরা আত্মীয়কুটুম্ব, তাঁদের অন্তঃপুরিকারাও নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এদের সনির্বন্ধ অনুরোধে কৌরবরা তাঁদের আত্মীয়কুটুম্ব-কুটুম্বিনীদেরও আনতে দ্বিধা করেন নি।

এঁরা এসে পড়লেন বিরাট কর্মাবর্তের মধ্যেই বলতে গেলে। সভাভবন ভাল ক'রে দেখা কি পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য ও প্রতাপের সম্যক পরিমাপ করা তখনই কিছু সম্ভব নয়। তবুও, যেটুকু দেখলেন ও বুঝলেন, তাতেই ওঁদের মুখকান্তি অসিতবর্ণ ধারণ করল, আহারে নিদ্রায়, এমন কি বেশভূষাতেও রুচি চলে গেল। কৌরবপুরললনারা প্রকাশ্যেই স্বামীদের অকর্মণ্যতা ও অক্ষমতায়, সর্বপ্রকার ন্যূনতায় বিরক্তি প্রকাশ করতে লাগলেন। কেউ কেউ ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়ে সেই যে প্রথম দিন নির্দিষ্ট আবাস-গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন—আর কিছুতেই তা ত্যাগ ক'রে উৎসব-অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সম্মত হলেন না।

যাদব-প্রধানদের আসতে কিছু বিলম্ব হলেও জনার্দন শ্রীকৃষ্ণ বহু পূর্বেই ইন্দ্রপ্রস্থে পৌঁছে গিয়েছিলেন। কিন্তু যজ্ঞের কর্মকাণ্ড শুরু থেকেই তাঁর আচরণ ও মুখভাব হয়ে গিয়েছিল নিরাসক্ত, নিস্পৃহ। কোন অনাত্মীয় দর্শকের মতোই যেন দূর থেকে দেখে যাচ্ছেন সব, এই সুবৃহৎ যজ্ঞ বা তার কর্মব্যবস্থা—উদ্যোগ-আয়োজনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক মাত্রও নেই। অথচ এতদিনে পাণ্ডব অন্তরঙ্গগণ সকলেই জেনে গেছেন যে এই অভূতপূর্ব, কল্পনাতীত বিরাট যজ্ঞায়োজনের পরিকল্পনা থেকেই পাণ্ডবরা ওঁর উপদেশ নির্দেশ পরামর্শ নিয়ে সেই মতো কাজ করছেন।

ওঁর এই অদ্ভুত আচরণে—যাকে অনায়াসে বীতস্পৃহা, এঁদের সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধাও বলে ধরা যায়—সকলেই বিস্ময় বোধ করতে লাগলেন। এমন কি পাণ্ডবরাও অস্বস্তি অনুভব না ক'রে পারলেন না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে এঁদের সকলেরই একটা ঈষৎ সভয় সম্ভ্রমবোধ ছিল, সাহস ক'রে এঁরা সব সময় তাঁর আচরণ কি মনোভাব সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে পারতেন না।

তবু একদিন সহদেব থাকতে না পেরে কনিষ্ঠর প্রাপ্য প্রশ্রয়ের দাবিতে প্রশ্নটা করেই বসলেন, 'আর্য, আপনি এমন দূরে দূরে থাকছেন কেন, আর এত

কীই বা দিবারাত্র লক্ষ্য করেন? কোন্ বিশেষ ঘটনায় এত মনোযোগ আপনার?'

শ্রীকৃষ্ণ সামান্য হেসে উত্তর দিলেন, 'ঘটনা নয়, চিত্তবৃত্তি। এক বিশেষ চিত্তবৃত্তিও বলতে পারো।'

'সেটা কি? যা এই সমবেত রাজন্যবর্গের মধ্যে সমগ্রভাবে লক্ষণীয়—জানতে ইচ্ছা করে।'

একটা প্রশ্ন ক'রেই সহদেবের সাহস যেন ফুরিয়ে গেছে, তাই তিনি ইচ্ছাটা মাত্র প্রকাশ ক'রেই স্তব্ধ হয়ে গেলেন, অপেক্ষা করতে লাগলেন শ্রীকৃষ্ণ যদি অনুগ্রহ ক'রে উত্তর দেন।

শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু তৎক্ষণাৎই উত্তর দিলেন, 'মাৎসর্য। অসূয়ায় মানুষের মুখের কত রকম বর্ণান্তর ঘটে—সেইটেই দেখছি।...শিক্ষালাভ করছিও বলতে পারো।'

'আপনি শিক্ষালাভ করছেন!' অবিশ্বাস্যের সুরে বিস্ময়োক্তি করেন সহদেব।

'নিশ্চয়। শিক্ষার কি শেষ আছে! যতক্ষণ জীবন ততক্ষণই শিক্ষার সুযোগ থাকে, এমন কি শেষ নিঃশ্বাসেও। তাছাড়া এর মধ্যে কৌতুকের কারণও তো কম নেই। সুতরাং অরুচিকর কি বিরক্তিকর নয় আদৌ। ঈর্ষা যে এত প্রকারের হয়—এখন মনে হচ্ছে হওয়াই স্বাভাবিক—কিন্তু আগে জানতাম না, অত ভেবে দেখি নি। আত্মীয় বন্ধুরাও ঈর্ষিত, তবে তাঁরা তা প্রাণপণে গোপন করার চেষ্টা করছেন; মুখে আনন্দের ভাব ফুটিয়ে তুলতে হচ্ছে—ফলে তাঁদের কষ্টের সীমা নেই। সাধারণ রাজন্যবর্গও ঈর্ষিত, সেই সঙ্গে কিছুটা লুব্ধও। নিজেদের অক্ষমতাকে মন্দভাগ্য বলে ক্ষোভ অনুভব করছেন। এ সুযোগ তোমাদের হাতে তাঁরাই তুলে দিয়েছেন মনে ক'রে নীরবে নিজেদের ধিক্কার দিচ্ছেন। কেউ কেউ কেমন অকারণে ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হয়ে উঠছে দেখছ না!...আবার দেখছি তোমাদের জ্ঞাতি, নিকটাত্মীয় ধার্তরাষ্ট্রদের। তাদের সুগৌর মুখকান্তি ক্ষণে অসিতবর্ণ ক্ষণে অঙ্গারবর্ণ ধারণ করছে—কখনও বা রক্তহীন বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। শুধু এর একমাত্র ব্যতিক্রম মহাবীর অঙ্গাধিপতি। তিনিও ঈর্ষিত তবে সে অন্য কারণে।...তোমাদের ঐশ্বর্য বা প্রতিপত্তির কারণে—সৌভাগ্যের এই প্রজ্বলন্ত দীপ্তিতে নয়।'

'অন্য কারণ? আর কি কারণ থাকতে পারে?'

'সেটা—? না-ই বা শুনলে। হয়ত নিজেই বুঝবে একদিন।'

সহদেব আর অধিক কৌতূহল প্রকাশ করতে ভরসা পেলেন না।

॥ ১৯ ॥

ঈর্ষার লক্ষণটা—মুখশ্রীর এই বিবর্ণতা বা দীপ্তিহীনতা—যে কেউ লক্ষ্য করেছে বা করছে, অঙ্গাধিপতির এমন আশঙ্কা বিন্দুমাত্রও ছিল না। ওঁর মনে হয়েছে এ গোপন ক্ষত, ব্যথাতুর এই ঈর্ষা ও ক্ষোভ একান্তভাবে ওঁরই নিজস্ব।

এ জ্বালা যন্ত্রণাদায়ক—তবু উনি তা সযত্নে লালন করছিলেন। আসলে এই অন্তরবেদনাটুকুই যে যন্ত্রণাদাত্রীর সঙ্গে ওঁর একমাত্র যোগসূত্র, এই যন্ত্রণাই অনুক্ষণ তাঁকে ঘিরে আছে, তাঁকে স্পর্শ করতে পারছে—দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে। এই একটি মাত্র উপায়ে ওঁর হৃদয়ের আরতি পৌঁছচ্ছে সেইখানে—যেখানে ওঁর পৌঁছানোর কোন উপায় নেই।

দ্রৌপদী। কৃষ্ণা। পাণ্ডব-মহিষী—ইন্দ্রপ্রস্থের পট্টমহাদেবী!

এ জীবনে বহু নারী কামনা করেছে ওঁকে, মহাবীর, ভাস্করদ্যুতি, অনলকান্তি কর্ণকে। যারা স্বেচ্ছায় এসে আত্মদান করেছে, তার মধ্যে অলোকসামান্যা সুন্দরীরও অভাব ছিল না। ওঁর প্রধানা মহিষীর প্রেমেও উনি তৃপ্ত, উনি পূর্ণ—তাতেও সন্দেহ নেই। তবু সেদিনের সেই পাঞ্চাল-স্বয়ম্বর-সভায় কৃষ্ণার রূঢ় প্রত্যাখ্যানের ক্ষতটা আজও নিরাময় হয় নি, সে অপমান অনির্বাণ অগ্নিদাহরূপে তাঁকে প্রতিনিয়ত দগ্ধ করছে।

সেই একবার মাত্র। তারপর আর দেখেন নি তিনি দ্রৌপদীকে।

পাণ্ডবদের নব রাজ্যাভিষেকের সময় তুচ্ছ বাধাকে নিমন্ত্রণ-রক্ষার প্রবল অন্তরায় ক'রে তুলে এড়িয়ে গেছেন।

তবু সেই একদিন মাত্র দেখার স্মৃতিই যথেষ্ট। মনে হয়েছে জীবনে আর যাকেই পান—ঐ নারীটিকে না' পেয়ে তাঁর এই বীর্য শৌর্য খ্যাতি সব মিথ্যা হয়ে গেছে, এ জীবনেরই আর কোন অর্থ নেই।

সে দীপ্তিময়ীর মুখ অবয়বের সমস্ত তথ্য বিস্মৃত হয়েছেন—শুধু একটা ঈপ্সাতুর কল্পনায় গড়া অস্পষ্ট চিত্রমূর্তিকেই মনে মনে পূজা করেছেন, কামনা করেছেন।...

তার পর, দীর্ঘকাল পরে, আবার দেখছেন।

কিন্তু এ কী দেখলেন!

অগ্নিসম্ভবা—সাক্ষাৎ অগ্নিরূপিণী শিখাময়ী এ কন্যা, বিদ্যুতাগ্নি-শিখার মতোই যেন নিমেষকাল মধ্যে দৃষ্টি দগ্ধ ক'রে দিয়ে চলে গেল। সে জ্যোতিতে যেমন

ত্রিভুবন দীপিত হয়েছিল তার অভাবে যেন তেমনিই গাঢ় তমিস্রায় ঢেকে গেল সব। না, এ বহ্নির দাহিকা শক্তি আছে, পাবকতা নেই। দগ্ধ ক'রে শুধু জ্বালার সৃষ্টি করে, ক্ষত-বিক্ষত করে। এ মৃত্যুরূপিণী, মুক্তিরূপিণী নয়।

কিন্তু শুধুই কি রূপ!

না, এ নারীকে যত দেখছেন ততই বিস্মিত অভিভূত হচ্ছেন কর্ণ।

ঈর্ষিত হচ্ছেন পাণ্ডবদের অকারণ অপ্রত্যাশিত অযাচিত এই সৌভাগ্যে। হ্যাঁ, অকারণই। ওরা এর যোগ্য নয় কেউ। ওরা সম্ভবত এর মূল্যও বুঝছে না।

এই বিপুল, সংখ্যাগণনার আয়ত্তাতীত বিশাল যজ্ঞকাণ্ডের কৃষ্ণাই যেন নিয়ন্ত্রী, কেন্দ্রবিন্দু। সর্বত্রই তাঁর কর্তৃত্ব, সর্ব কার্যের উপরই তাঁর প্রখর দৃষ্টি—তাঁর আদেশের পতাকা শোভমান। এ কর্মোদ্যোগের সঙ্গে যদি অশ্বের তুলনা দেওয়া যায় তো বলতে হবে—এই লক্ষ কোটি বা তারও অধিক রথাশ্বের রশ্মি এই একটি মাত্র নারীর হাতে। বলা উচিত পাণ্ডবরা কার্য, দ্রৌপদীই কারণ। তাঁরা বাহু, দ্রৌপদী মস্তিষ্ক। একটি মাত্র সুকুমার তনু যেন সহস্র অবয়বে বিভক্ত হয়ে লক্ষ কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করছে।

এমন কখনও দেখেন নি কর্ণ, কখনও ভাবতে পারেন নি। এমন যে হয় তাও কখনও শোনেন নি। সমস্ত অনুমান, এতদিনের অগণিত বর্ণরঞ্জিত সুদূর কল্পনাকে অতিক্রম ক'রে গেছে এ বাস্তব। সমস্ত বিস্ময় ক্ষুদ্র তুচ্ছ হয়ে গেছে যেন।

তবু, এই চিন্তাভাবনা একমাত্র তাঁরই গোপন অন্তর-সম্পদ, এই যন্ত্রণা এই দহন তাঁরই নিভৃত নিজস্ব—ভেবে নিশ্চিন্ত ছিলেন কর্ণ।

তার কারণ, তিনি জানতেন সমব্যথী না হলে কারও পক্ষে এ সত্য অনুমান করা সম্ভব নয়।

আর তাঁর সমব্যথী, তাঁর চিন্তার অংশীদার এখানে কে থাকবে? কে অনুমান করতে পারবে তাঁর মনের এই ঝঞ্ঝা?

শ্রীকৃষ্ণের হিসাব তো ধরেনই নি। যতই বুদ্ধিমান হোন, তিনিই বা ওঁর মনের তল পাবেন কেন? তাঁর তো এ মনোভাবের কোন কারণ নেই। তিনি সর্বভাবে পূর্ণ, তৃপ্ত।

তাই, যখন এক অপরাহ্ণবেলায় সভাগৃহ-সংলগ্ন উদ্যানে, ময়দানব—বুঝি ময়দানব বলাই উচিত—রচিত ময়কাননে উদাস-ভাবে-বিচরণকারী দিগন্তে-

স্থাপিত-দৃষ্টি কর্ণকে বাহুপাশে আবদ্ধ ক'রে শ্রীকৃষ্ণ এই প্রশ্ন করলেন—তখন তিনি যে চকিত চমকিত হয়ে উঠেছিলেন, নিমেষে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল তাঁর ললাট-কপোল, দেবনিন্দিত কণ্ঠেও নিমেষকাল মধ্যে স্বেদ-বিন্দু দেখা দিয়েছিল—তার মধ্যে শুধু বিস্ময় নয় এক অজ্ঞাত আশঙ্কার ভাবও ছিল। এ লোকটিকে অনেকেই মায়াধর ঐন্দ্রজালিক বলে—তাই কি সত্য? এ তাঁর মনের গোপনতম কক্ষের কুঞ্চিকা আবিষ্কার করল কী ক'রে?

শ্রীকৃষ্ণ প্রশ্ন করলেন, 'অঙ্গাধিপতি, এখানে এসে পর্যন্ত মাৎসর্যের বহুবিধ রূপ ও বর্ণ দেখলাম, তার মধ্যে একমাত্র আপনার মুখভাবই স্বতন্ত্র ও অনন্য। আপনি তো কই এদের এই প্রায়-অলৌকিক সম্পদ ও প্রতিপত্তিতে বিন্দুমাত্র ঈর্ষা বোধ করছেন না? ভারতের সমস্ত রাজন্য যুধিষ্ঠিরকে রাজচক্রবর্তী বলে নতি জানাচ্ছেন, তাতেও আপনার অন্তর্দাহ নেই—আশ্চর্য!'

আত্মসম্বরণ ক'রে নিতে একটু বিলম্ব হ'ল বৈকি।

বেশ একটুক্ষণ নিঃশব্দে থেকে ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন কর্ণ, 'না। শক্তি থাকলে, সে শক্তি অর্জনের জন্য সাধনা থাকলে—এবং তার সদ্ব্যবহার করার সুযোগ থাকলে এ কিছু অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নয়। সুতরাং আমি দুঃখ বা ঈর্ষা বোধ করব কেন? ঈর্ষা করে দুর্বল ও অকর্মণ্যরা, বিধাতা আমাকে পৌরুষ দিয়েছেন, শৌর্য আমার আয়ত্ত, অস্ত্রশিক্ষার জন্য জীবন পণ শুধু নয়, ভবিষ্যৎ পর্যন্ত পণ রেখে সাধনা করেছি, তপস্যা করেছি—বলতে গেলে। আমার ক্ষোভ সেইখানে—সে শৌর্য সে শিক্ষা প্রয়োগ করার সুযোগ বা ক্ষেত্র পেলাম না। জন্মটাই আমার প্রবল শত্রু, প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াল। মিথ্যা পাণ্ডবদের ঈর্ষা ক'রে কী করব? যারা করছে তারা কেউই পাণ্ডবদের সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী নয়—এ সত্য আমি স্বীকার করতে বাধ্য।'

শ্রীকৃষ্ণ ভাবোচ্ছ্বাসগাঢ় কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'ধন্য ধন্য, কর্ণ, আপনি ধন্য। লোকে যে আপনাকে মহান, দেবচরিত্র মানুষ বলে তা সত্য নয়—আপনি দেবদুর্লভ চরিত্র।'

কিন্তু তার পর, যেন কিঞ্চিৎ আত্মসম্বরণ ক'রে নিয়ে অতি শান্ত কণ্ঠে পুনশ্চ প্রশ্ন করেন, 'কিন্তু অঙ্গাধিপতি, এই কি একমাত্র কারণ? এতটা ক্ষোভ কি শুধু এই জন্য? ঈর্ষা করার কি আর কোনও হেতু নেই? আপনি নিজের মানস-লোকের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন তো?'

আবারও যেন একটা প্রবল আঘাত পেলেন কর্ণ।

তেমনিই শঙ্কা-সম্ভ্রমে মেশা বিস্ময়ের আঘাত।

মুহূর্তের জন্য আবারও অরুণাভ হয়ে উঠল তাঁর মুখ।

কিন্তু এবার তিনি অকস্মাৎ পাদচারণা বন্ধ করলেন, বাসুদেবের মুখোমুখি ফিরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। তীক্ষ্ণ নিষ্পলক দৃষ্টিতে ওঁর মুখের দিকে কিয়ৎকাল তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি এ প্রশ্ন করলেন কেন? অন্য কোন হেতু থাকতে পারে এমন আপনি ভাবলেনই বা কি ক'রে? অনুমান? কিন্তু সমব্যথী না হলে অন্তরের নিভৃততম কক্ষের এই অন্তর্লীন রহস্য অনুমান করার তো কথা নয়। অথচ—অথচ আপনারই বা এমন, এ ধরনের ক্ষোভ থাকবে কেন? আশ্চর্য! আমার ধারণা ইহলোকে যা কিছু কাম্য থাকতে পারে পুরুষের—তা আপনি সবই পেয়ে গেছেন।...এক সম্রাট রূপে প্রতিষ্ঠা পান নি, তবে আপনার লোকোত্তর প্রতিভা ও অবিশ্বাস্য তীক্ষ্ণধার বুদ্ধির যে পরিচয় পেয়েছি বা পাচ্ছি—লোকমুখে শুনেই অবশ্য বেশির ভাগ, তবু তা যতই অতিরঞ্জিত হোক, তার মধ্যে কিছু সত্য নিশ্চয়ই আছে—আপনি ইচ্ছা করলে সে প্রতিষ্ঠাও আপনার পক্ষে খুব আয়াসসাধ্য হ'ত না। এই প্রাসাদ এই ঐশ্বর্য তো আপনারই দান।...তাই ভেবেছিলাম আপনি পরিপূর্ণ, তৃপ্তকাম।'

শ্রীকৃষ্ণ হাসলেন। তাঁর সেই বিশেষ রহস্যঘন হাসি। তা যেমন গভীর, তেমনি দুর্বোধ্য!

বললেন, 'অঙ্গাধিপতি, পুরুষ কেন সমগ্র ভাবে মানুষের কথাই চিন্তা করুন। এ পৃথিবীতে যে-ই দেহ ধারণ করুক—তার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা কখনই চরিতার্থ হয় না, হওয়া সম্ভব নয়। কিছু না কিছু কাম্য অপ্রাপ্য থেকেই যায়—কিছু না কিছু অতৃপ্তি। এ-ই পার্থিব নিয়ম। একটা কামনা পূর্ণ হতে না হতে আর একটার কথা ভাবে মানুষ। তার সম্ভোগেরও সমাপ্তি নেই, কামনা-বাসনারও না। এমন কি মৃত্যুকালেও অক্ষয় স্বর্গবাসের বা আরও সুখদ পুনর্জন্মলাভের কামনা নিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। আকাঙ্ক্ষার কামনার সম্বরণে পিপাসার সমাপ্তি ঘটে না—সংহরণ আবশ্যক। সম্পূর্ণ নিবৃত্তি মানেই নির্বাণ—মহানির্বাণ। তার জন্যই ঋষিরা তপস্যা করেন কিন্তু তাও কি পান কেউ? সহস্র বৎসর শত জন্ম কঠোর তপস্যার পরও দেখি মুহূর্ত-মধ্যে সে কৃচ্ছ্রসাধন ব্যর্থ হয়ে যায়, সামান্য সম্ভোগের জন্য লালায়িত হয়ে ওঠেন—অথবা প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি-সম্মানের জন্য। হয়ত—কোটিতে গোটিক মানুষের সেই দিব্য পূর্ণতা, সেই দুর্লভ বস্তু—মহা পরিনির্বাণ লাভ হয়—অকামনার সিদ্ধিলাভ হয়।'

বাসুদেবের মুখের উপর স্থির-নিবদ্ধ-দৃষ্টি কর্ণ ওঁর কথাগুলি মনোযোগ দিয়েই শুনছিলেন—কিন্তু পূর্ণ মন সেখানে যুক্ত করা সম্ভব হয় নি। অর্ধেক মন তাঁর সম্মুখস্থ ঐ অবর্ণনীয় সুন্দর—নীলকান্ত মণির মতোই নীলাভ আয়ত নয়নের মধ্য থেকে বক্তার মনোরাজ্যের অন্তর্গূঢ় রহস্য-যবনিকা উন্মোচনের চেষ্টা করছিল। এখন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ ক'রে বললেন, 'তাহলে কি আপনিও—? আপনার এ ক্ষোভ কি আমার হতাশারই সমধর্মী?'

শ্রীকৃষ্ণ পুনশ্চ তাঁকে গভীর আলিঙ্গনে বদ্ধ ক'রে প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, 'সব প্রশ্নের উত্তর সর্বদা দেওয়া সম্ভব নয় বন্ধু, আর···সব কৌতূহল প্রকাশ করতেও নেই।'

সেই দিনই সায়াহ্নবেলায় যুধিষ্ঠির বিশিষ্ট আত্মীয়, জ্ঞাতিবর্গ ও অন্তরঙ্গ বান্ধবজনকে এক উদ্যোগ-মন্ত্রণা-সভায় আহ্বান করেছিলেন।

যজ্ঞের পুরোহিত ঋত্বিক প্রভৃতি পূর্বেই স্থিরীকৃত হয়েছিল। স্বয়ং মহর্ষি ব্যাসদেবই সে ভার গ্রহণ করেছিলেন। সুদামা, যাজ্ঞবল্ক্য—এঁদের পুরোহিত ধৌম্য, পৈল প্রভৃতি সুপণ্ডিত ও তপস্বীগণকে অন্যান্য কার্যের ভার দিয়ে ব্যাসদেব স্বয়ং ব্রহ্মা বা প্রধান ঋত্বিক রূপে যজ্ঞের যেটা দেবকার্য সেটা সমাধা করবেন। কিন্তু যজ্ঞ বলতে শুধু সেটুকুই নয়, অন্তত এ রাজসূয় যজ্ঞ নয়। সুতরাং কাজ এবং দায়িত্ব দুইই বহুবিধ ও বহুবিচিত্র। তা পালন বা সুসম্পন্ন করাও দুঃসাধ্য। সেই জন্যই এই মন্ত্রণা বা পরামর্শ সভার আয়োজন।

সমাগত সম্মানিত ব্যক্তিদের মধ্যে ব্যাসদেব, ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, ধৃতরাষ্ট্র পাদবন্দনা ক'রে, বিদুরকে নমস্কার জানিয়ে—জ্ঞাতি-ভ্রাতাদের সস্নেহ আলিঙ্গন ও কনিষ্ঠদের সাদর শিরশ্চুম্বন ক'রে যুধিষ্ঠির সকলকেই হাত ধরে এনে যথাযোগ্য আসনে বসালেন, তারপর নিজে গুরুজনদের থেকে কিছু নিম্নে আসন গ্রহণ ক'রে—এতাবৎ যা যা আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে—তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, 'এখন এই বিরাট কর্মকাণ্ডে অনুগ্রহ ক'রে কে কী ভার নেবেন তা যদি জানান, আমার বিপুল দুশ্চিন্তা কিঞ্চিৎ লাঘব হয়।'

বক্তব্য নিবেদন শেষ ক'রে কিছুটা উৎসুক এবং কিছু উৎকণ্ঠিত মুখে তিনি পিতামহ ভীষ্মের দিকে তাকালেন।

ভীষ্ম জন্মাধিকারসূত্রে এঁদের পিতামহ। তাঁরই সিংহাসন পাবার কথা। তাঁর পিতা কুরুরাজ শান্তনু এক রূপবতী মৎস্যজীবী-কন্যাকে দেখে প্রায় জ্ঞান

হারিয়েছিলেন, উন্মত্তবৎ তার পিতার কাছে গিয়ে বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু সে ধীবর এই শ্রেণীর নৃপতিদের চরিত্র জানত, দুদিনের সম্ভোগেচ্ছা মিটে গেলে দাসীর মতো একদিকে ঠেলে দেবে, এর গর্ভজাত সন্তানকে জারজ সন্তানের মতো দেখবে। সে শর্ত করল, 'এর গর্ভে পুত্র হলে সে-ই সিংহাসনে বসবে, এই প্রতিজ্ঞা করলে তবেই আমি কন্যা দান করব।'

শান্তনু বিপন্ন বোধ করলেন, পুত্র দেবব্রত রূপে গুণে বিদ্যায় বুদ্ধিতে বিবেচনায় শৌর্যে—গর্ব করার মতোই সন্তান, পৃথিবীতে তার সমান বীর কেউ নেই, একবিংশতিবার যিনি স্বীয় ভুজবলে পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন, সেই স্বয়ং মহর্ষি ভার্গবও তার কাছে পরাজিত হয়েছেন—সে পুত্রকে সিংহাসনে বঞ্চিত করেন কী ক'রে? তাতে শুধু যে বিরাট একটা অবিচারের কারণ হবে তাই নয়, কুরুসিংহাসনও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তিনি সে শর্তে রাজী হ'তে পারলেন না। ম্লান মুখে বাড়ি ফিরলেন কিন্তু অতিরিক্ত কামনা অতৃপ্ত থাকায় আহার-নিদ্রা নষ্ট হয়ে গেল, দিন দিন শীর্ণ হয়ে যেতে লাগলেন। দেবব্রত পিতার এই ভাবান্তর লক্ষ্য ক'রে সেবকদের কাছে কারণ অনুসন্ধান করলেন, এবং পিতাকে না জানিয়েই ধীবররাজের কাছে গেলেন, বললেন, 'আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমার এই জননীর পুত্রই—যদি পুত্র হয়—সিংহাসন লাভ করবে।'

ধীবররাজ বললে, 'কিন্তু বাপু, এর পর তোমার ছেলেরা যদি সে সিংহাসন দাবি করে? আমার দৌহিত্ররা কি তাদের সঙ্গে পেরে উঠবে? এই বিপদ অবশ্যম্ভাবী জেনেও আমি কন্যাকে প্রৌঢ় পাত্রে দিতে প্রস্তুত নই।'

দেবব্রত বললেন, 'বেশ, আমি প্রতিজ্ঞা করছি আমি কখনই দার-পরিগ্রহ করব না, তাহলে তো আর কোন কলহ-বিবাদের সম্ভাবনা থাকবে না?'

ধীবররাজ নিশ্চিন্ত হয়ে কন্যাকে কুরুরাজ-অন্তঃপুরে পাঠালেন।

এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা করার জন্যই সেই থেকে দেবব্রত ভীষ্ম বলে পরিজ্ঞাত হয়েছেন। সেই থেকে তিনি তপস্বীর জীবনযাপন করেছেন এবং অভিভাবক উপদেষ্টা রূপে এদের লালনপালন ও রক্ষা করেছেন। ভাই বিচিত্রবীর্যের অকালমৃত্যু হলে তিনিই অন্ধ ভ্রাতুষ্পুত্র ধৃতরাষ্ট্র, রুগ্‌ণ পাণ্ডু ও দাসী-গর্ভজাত তাদের ভাই বিদুরকে লালন করেছেন; সেই জন্যই তিনি সর্বজনশ্রদ্ধেয়; এ বংশের তিনিই অগ্রগণ্য।

ভীষ্ম কিছুক্ষণ মৌন থেকে বললেন, 'এখানে আমার ভ্রাতৃতুল্য মহাজ্ঞানী মহাতপস্বী কৃষ্ণদ্বৈপায়ন* আছেন, তিনি আমাপেক্ষা অনেক প্রাজ্ঞ, সুতরাং

* মহর্ষি পরাশরের ঔরসে প্রাগুক্ত ধীবর-কন্যার গর্ভজাত পুত্রই ব্যাসদেব। বর্ণ তমসাভ বলে কৃষ্ণ, দ্বীপে জন্ম বলে দ্বৈপায়ন।

সর্বাগ্রে তাঁর মতামত জ্ঞাত হওয়াই বাঞ্ছনীয়, কর্তব্যও। তবে বৎস, তোমাকেও সত্যনিষ্ঠ, স্থিতধী ও বুদ্ধিমান বলে জানি—তুমি কোন অর্বাচীনতা প্রকাশ করবে না এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তুমি কি কিছু স্থির করেছ এ বিষয়ে? তোমার ধারণা কি যদি বলো তো আমরা সেটা অনুমোদন, পরিবর্তন, বা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করব কিনা— সেটা বিবেচনা করতে পারি।'

ব্যাসদেব সম্মতিসূচক শিরসঞ্চালন ক'রে বললেন, 'শ্রীমান যুধিষ্ঠির বয়সে নবীন হলেও এ পর্যন্ত অর্বাচীনবৎ কোন কর্ম করেন নি, কোন হঠকারিতা বোধ করি তাঁর সাধ্যাতীত। বরং তাঁর বিবেচনাদি ও কর্ম-নির্দেশনা দেখে আমি বিস্মিতই হয়েছি। আমার মনে হয় তিনি যা ধারণা ও স্থির করেছেন তা পরিবর্তনের অপেক্ষা রাখে না।'

ওঁদের এই উৎসাহদানে যুধিষ্ঠির যেন কিছু মানসিক বল লাভ করলেন। তবু আগের মতোই কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, 'অনুমোদন করার অপেক্ষা আপনাদের স্থিরীকৃত তালিকাই সর্বাংশে শ্রেয় হ'ত। কোন পরিচিত নাম পেলে আর নূতন নামের কথা চিন্তা করেন না কেউ। তত্রাচ আপনারা যখন আদেশ করেছেন তখন আমার প্রস্তাব আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করছি। আমার মনে হয়ঃ কোন্ কর্ম সঙ্গত বা অসমীচীন, করা আবশ্যক বা নিষ্প্রয়োজন —স্থির করার ভার কুরুপিতামহ, আমাদের একান্ত শুভার্থী মহাত্মা ভীষ্ম ও আমাদের শস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য যদি অনুগ্রহ ক'রে গ্রহণ করেন তো সকল দিক দিয়েই তা উপযুক্ত হয়। তেমনি আমার মনে হয়েছে ভোজনরসিক ধীমান দুঃশাসন যদি খাদ্যভাণ্ডার নিত্য পরিপূরণ ও সুষ্ঠু বণ্টনের ভার নেন; গুরুপুত্র অশ্বত্থামা ব্রাহ্মণদের আতিথেয়তা ও সম্মানরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন; মহামতি সঞ্জয় রাজন্যবর্গের সেবায় নিযুক্ত থাকেন; সকলপ্রকার ঐশ্বর্যে বীতস্পৃহ গুরু কৃপাচার্য যদি কোষাগার ও রত্নভাণ্ডার রক্ষার গুরুভার বহনে সম্মত হন এবং সেই সঙ্গে দক্ষিণাদি দানের ব্যবস্থাও, তো, এই সব সুকঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ কার্য সুসম্পন্ন হ'তে পারে।…ধর্মজ্ঞ বিদুর ব্যতীত আয়ব্যয়ের হিসাব রক্ষা করতে পারেন ও প্রয়োজন বুঝে সুসঙ্গত ভাবে ব্যয় করতে পারেন—এমন কোন লোক আমার স্মরণে আসে নি। বাহ্লীক, সোমদত্ত, পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্র ও আমাদের স্নেহাস্পদ ভগ্নীপতি জয়দ্রথ* সমস্ত কার্য পর্যবেক্ষণ, পরিদর্শন ও সামগ্রিক ভাবে কর্তৃত্ব করলেই শোভন ও যথোপযুক্ত হয়। আর একটি যা গুরুতর কার্য অবশিষ্ট থাকে তা হ'ল উপহার উপঢৌকনাদি গ্রহণ ও আমন্ত্রিত

* ধৃতরাষ্ট্রের জামাতা, দুঃশলার স্বামী।

অতিথিবর্গের অভ্যর্থনা। মহামানী আত্মসম্মানসচেতন স্নেহাস্পদ ভ্রাতা সুযোধনকেই* আমি এ কার্যের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত কর্তা বলে বোধ করি।'

যুধিষ্ঠির তাঁর বক্তব্য শেষ ক'রে নীরব হলে চতুর্দিকে 'সাধু' 'সাধু' রব উঠল। ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, ব্যাসদেব প্রভৃতি জ্ঞানীপ্রধানগণ শুধু যে এ তালিকা সর্বাংশে অনুমোদন করলেন তাই নয়—এর ভূয়সী প্রশংসা ক'রে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করলেন যে, এর অপেক্ষা সদ্বিবেচনা তাঁদের দ্বারা সম্ভব হ'ত না।

প্রশংসা ও হর্ষধ্বনি কিঞ্চিৎ স্তিমিত হ'তে অপেক্ষাকৃত নীরবতা নেমে এল সেই মন্ত্রণাগৃহে। হৃষ্ট সকলেই। এমন কি এই কার্যভার প্রদানেই যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে মনে ক'রে চিরঈর্ষী দুর্যোধনকেও বেশ সন্তুষ্ট মনে হ'ল।

আরও কিছু সাধারণ দায়িত্বভার বণ্টন অবশিষ্ট ছিল, যুধিষ্ঠির দ্রুত তার তালিকা নিবেদন করলেন। পরবর্তীকালে কোন বিভ্রান্তি বা অসঙ্গতি না দেখা দেয় সেই কারণে নকুল সেগুলি স্বতন্ত্র ভূর্জপত্রে লিপিবদ্ধ করতে লাগলেন।

সে কাজও একসময় সমাপ্ত হ'ল। এবার সভাভঙ্গেরই চিন্তা সকলের মনে —ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, বাহ্লীক এবং দুর্যোধন ও তাঁর মাতুল সৌবল শকুনি যেন বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে মৃদুগুঞ্জনে অ ল করলেন।

বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু এ পর্যন্ত কোন বাঙ্‌নিষ্পত্তি করেন নি।

সভাগৃহের একেবারে সর্বশেষ প্রান্তের এক কোণে স্থির হয়ে বসে ছিলেন। দৃষ্টি তাঁর এপাশের মুক্ত বাতায়নপথে দূর বলভিতে নিবদ্ধ; সেখানে দুটি কপোতকপোতী পরস্পরের সঙ্গে কৃত্রিম কলহে লিপ্ত—একদৃষ্টে মনোযোগের সঙ্গে যেন তা-ই লক্ষ্য করছেন। মনে হচ্ছে এখানে থেকেও তিনি এই আলোচনা বা মানুষগুলির সঙ্গে যুক্ত নন, কোনো বহু দূরে কোথাও চলে গিয়েছেন, এতক্ষণের এ আলোচনার এক বর্ণও তাঁর শ্রুতিগোচর হয় নি, যেন এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক মাত্র নেই।

কিন্তু ঠিক যখন মন্ত্রণা বা আয়োজন-পূর্ব ব্যবস্থা সুসম্পন্ন হওয়ায় তৃপ্ত যুধিষ্ঠির সভাসমাপ্তি ঘোষণার মৌন অনুমতি প্রার্থনা ক'রে চতুর্দিকে তাকিয়েছেন—তখন অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর এতক্ষণের নীরবতা ভঙ্গ করলেন, স্বভাবসিদ্ধ সকৌতুক হাস্যের সঙ্গে বলে উঠলেন, 'মহারাজ-চক্রবর্তী যুধিষ্ঠির যে আমাকে একেবারেই অকর্মণ্য মনে করেন তা জানতাম না। আমার ধারণা ছিল—

* দুর্যোধন; স্নেহার্থে দুঃ স্থানে সু যোগ করা হ'ত।

অহঙ্কারও বলতে পারেন যে—অন্তত কোন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কর্মভার, নিতান্ত অগুরুতর কিছু—একটা পাব।'

এ গৃহের সকলেই সে কণ্ঠস্বরে ও বক্তব্যে চমকিত হয়ে উঠলেন। বাসুদেব যে এতক্ষণ কোন কথা বলেন নি—সে তথ্য সম্বন্ধেও এই প্রথম সকলে সচেতন হলেন। পাণ্ডবরা উদ্বিগ্ন ও অপ্রতিভ, ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি বিস্মিত—কুরুভ্রাতাগণ এঁদের-মধ্যে-আসন্ন-মনোমালিন্যের-মতো-বাঞ্ছিত-সৌভাগ্য আশা না করলেও একটা কৌতুককর পরিস্থিতির প্রত্যাশায় উৎফুল্ল ও উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন।

শুধু বিশেষ বিচলিত হলেন না স্বয়ং যুধিষ্ঠিরই, তাঁর প্রশান্ত মুখেই বিশেষ কোন বৈলক্ষণ্য দেখা দিল না। বরং তিনি স্নিগ্ধ কণ্ঠে শান্তভাবে উত্তর দিলেন, 'বাসুদেব, আমার ধারণা ছিল, এবং এখনও আছে, বস্তুত আমি যা কিছু করেছি, করছি বা করব—তা তোমারই প্রতিনিধিরূপে। আমি তোমারই ইচ্ছা প্রকাশ করেছি মাত্র। এ বৃহৎ কর্মচক্রের তো তুমিই চক্রী, তুমি এর স্রষ্টা ও দ্রষ্টা। এর ধ্যানমূর্তি। এ কর্মের কল্পনা থেকে সূচনা ও বর্তমান বাস্তব আকার গ্রহণ—এ কি সবই তোমার ইচ্ছায় সংঘটিত হয় নি? আমি জানি আমাদের সকলকে সুপরিচালনা করবার কঠিন দায়িত্ব তুমি একা বহন করছ, তাই এ বিপুল যন্ত্রের কোন খণ্ডাংশরূপে তোমাকে দেখতে চাই নি। কোন সামান্য কার্যে তোমাকে জড়িত করার কথা চিন্তাই করি নি। এখন যদি তুমি ইচ্ছা করো—বল কোন্ কার্যভারে তোমার অভিলাষ, কোন্ কর্তব্যকে তুমি সুষ্ঠুতর রূপে সার্থক করতে চাও—তুমি অনায়াসে তা গ্রহণ করো। তুমি পূর্ণ, এখন যদি আবার নিজেকে খণ্ডাংশরূপে প্রকাশিত করার অভিপ্রায় হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের আর কি বলার আছে? আমরা তাতে সুখী ও নিশ্চিন্তই হব।'

জনার্দন শ্রীকৃষ্ণর কবি-কল্পনাতীত অবর্ণনীয় মোহন মুখমণ্ডল মধুরতর হাস্যে রঞ্জিত হয়ে উঠল। বললেন, 'মহারাজ যুধিষ্ঠির—যিনি ধর্মরাজ নামেই বেশী পরিচিত—তিনি সত্যবাদী, প্রয়োজন হলেও অনৃতবাক্য বলেন না, এ-ই জানতাম। তিনি যে বিনয়বচনেও এমন সুপটু তা জানা ছিল না।'

অকস্মাৎ কুরুজামাতা জয়দ্রথ এক ধরণের রূঢ় ব্যঙ্গ-হাস্যের সঙ্গে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, ঠিক। মহারাজচক্রবর্তী বড় বিপজ্জনক পথে অগ্রসর হচ্ছেন। বিনয়-বাক্যের পরের পংক্তিই হ'ল চাটুবাদ—আর, কে না জানে চাটুবাদের অর্ধাংশ স্বার্থ বাকি অর্ধাংশ মিথ্যায় গঠিত!'

অনেকেরই ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল এই ধৃষ্টতায়। ভীষ্মর মুখ বিরক্তিতে কঠিন হয়ে উঠল, তবু তিনি সে মনোভাব গোপন ক'রেই বললেন, 'আমার বিশ্বাস

কল্যাণীয় যুধিষ্ঠির তাঁর আন্তরিক বিশ্বাসই প্রকাশ করেছেন, অকারণ বিনয় করেন নি। আমিও—যতটুকু যা এখানে এসে শুনেছি, প্রত্যক্ষ করেছি ও শ্রীমান পাণ্ডবদের সঙ্গে আলোচনায় আহরণ করেছি, তাতে—তাঁর সঙ্গে আমি একমত। তাঁর প্রস্তাবও সমর্থন করি। এখন বাসুদেব তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করলেই আমরা দায়িত্ব-বণ্টনের তালিকা সমাপ্ত করতে পারি।'

শ্রীকৃষ্ণ এবার উঠে দাঁড়ালেন। দুই কর অর্ধযুক্ত ক'রে অনুগ্রহ প্রার্থনার ভঙ্গীতে বললেন, 'যা শুনলাম প্রধান প্রধান প্রায় সব কর্মসম্পাদনের ভারই বণ্টিত এবং তা নিশ্চিত যোগ্য স্কন্ধে অর্পিত হয়েছে। শুধু একটি কর্তব্যের কথা সম্রাট যুধিষ্ঠির এমন কি পিতামহ ভীষ্মেরও দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। আমি সেই আপাত-প্রধান কর্ম সম্পাদনেরই অনুমতি প্রার্থনা করছি। অভ্যাগতদের পাদপ্রক্ষালনের ভারটি অনুগ্রহ ক'রে আমাকে দেওয়া হোক।'

সে সভায় আকস্মিক বজ্রপাত হলেও বোধ করি সকলে এত হতচেতন, বিমূঢ় বোধ করতেন না নিজেদের। কিছুক্ষণের জন্য যেন জনহীন প্রাণীহীন চির-তুষারাবৃত সুমেরু শিখরের মতো একটা অপার্থিব নিস্তব্ধতা নেমে এল সে সভাগৃহে। সূচীপতনশব্দহীন নীরবতা।

অবিশ্বাস্য। অবিশ্বাস্য।

সকলেরই এই কথাটা প্রথম মনে হ'ল—তাঁরা কি ঠিক শুনছেন? বাসুদেবের কথার কি সম্যক অর্থ গ্রহণ করতে পেরেছেন?

তার পর কারও বা মনে হ'ল, এটা ব্যঙ্গ ক'রে বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর নাম বাদ দেওয়ার অভিমানে এঁদের সমুচিত শিক্ষা দিতেই এই অদ্ভুত প্রস্তাব করেছেন।

অনেক—অনেকক্ষণ পরে ব্যাকুল যুধিষ্ঠির বলে উঠলেন, 'না না—এ কী বলছ! তুমি রহস্য করছ নিশ্চয়? অথবা আমাদের ওপর বিরক্ত কি রুষ্ট হয়েছ! এ কাজটার কথা মনে পড়ে নি ঠিকই—তুমি হয়ত সেই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই—'

শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ একই সঙ্গে গম্ভীর শান্ত অথচ শাণিত হয়ে উঠল। তিনি যুধিষ্ঠিরের বাক্যে বাধা দিয়ে বললেন, 'না মহারাজ। আপনাদের মনে পড়লেও আমি এই কাজটিই চেয়ে নিতাম আপনাদের কাছ থেকে। আপনারা অপরকে এ ভার দিলে আমি তাঁর কাছ থেকে ভিক্ষা চাইতাম। আমার কাছে এ-ই দেবকার্য, ভগবৎসেবা। যেখানে বহু মানুষের অধিষ্ঠান, যেখানে জনতা, যেখানে পঞ্চজন—সেখানেই যথার্থ ঈশ্বরের অস্তিত্ব, তাঁর উপস্থিতি— এ আমি মনেপ্রাণে

বিশ্বাস করি। অধিকাংশের মতামতই সত্য, গ্রাহ্য। বহু লোকের মিলিত ইচ্ছাই নিঃসন্দেহে দৈব ইচ্ছা। হে মহারাজচক্রবর্তী, আপনার এই সুবৃহৎ যজ্ঞ, এই কর্ম-সমারোহ—যা পূর্বেও আর সংঘটিত হয় নি, পরেও হবে না সম্ভবত, ইতিহাস যুগ যুগ ধরে যার সাক্ষ্য ও কাহিনী বহন করবে, যা সহস্র বর্ষ পরে প্রবাদে পরিণত হয়ে থাকবে—সেই যজ্ঞের এই সুফলটি আমি ভিক্ষা করছি। এই সুদুর্লভ সুযোগে জনদেবতা—জনতারূপ ঈশ্বরের সেবা ও পূজা করার অকল্পনীয় সৌভাগ্যই আমার কাম্য ও প্রার্থনা। যজ্ঞের যাবতীয় ফল আপনারই থাক—এইটুকু পুণ্যসঞ্চয়ের অধিকার মাত্র আমাকে দিন!'

আবারও সভাগৃহ তেমনি নীরব হয়ে রইল কিছুকাল। মনে হতে লাগল শ্রীকৃষ্ণের সেই গম্ভীর বজ্রনির্ঘোষবৎ কণ্ঠধ্বনির স্মৃতি সেই কক্ষের স্তম্ভে স্তম্ভে প্রতিহত হয়ে সে সভাগৃহের বায়ুমণ্ডলে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল, সকলেই কেমন উদাস ও চিন্তাকুল হয়ে উঠলেন। অনেকেরই বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে পলক পড়ল না বহুক্ষণ।

শুধু তার মধ্যে বাষ্পার্দ্রনেত্র বিদুর উঠে দাঁড়িয়ে আবেগগাঢ় কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'ধন্য, ধন্য। শ্রীকৃষ্ণ তুমিই পুরুষোত্তম। তোমার কথিত জনদেবতার বাণীমূর্তি তুমি, তার শক্তি তোমাতেই সংহত রূপ ধারণ করেছে। আমি তোমাকে প্রণাম করি।'

॥ ২০ ॥

সঙ্কল্পিত যজ্ঞের পূত বেদীতে প্রারম্ভাগ্নি প্রজ্বলিত হওয়ার পূর্বেই সেই বিশাল সভার অন্তর্গৃহে অন্য এক অগ্নি প্রধূমিত হয়ে উঠল।

প্রথম স্ফুলিঙ্গাকারে। কিন্তু কে না জানে উপযুক্ত উপাদান পেলে একটি মাত্র ক্ষুদ্র অগ্নিকণা বিপুল বহ্নিলীলায় পরিণত হতে বিলম্ব হয় না।

না, সে স্ফুলিঙ্গ যজ্ঞবিদ্‌দের অরণি-মন্থদণ্ডের সংঘর্ষে দেখা দেয় নি, সে অগ্নি যজ্ঞমূর্তিকে হবিনিষেকের কাজেও লাগে নি।

তার উপাদান হ'ল ঈর্ষা, যজ্ঞবাহন হলেন চেদীরাজ শিশুপাল। অনেকের আহত অভিমানের বাণীরূপ।

যজ্ঞের প্রাক্কালে যজ্ঞপতি যুধিষ্ঠিরের অভিষেক প্রয়োজন। তার পূর্বেও কিছু কৃত্য আছে। কোন কোন দেবতাকে স্মরণ করতে হয়; তারপর ব্রহ্মা-ঋত্বিক-

অধ্বর্যু-উদ্গাতা প্রভৃতির বরণ ; অর্ঘ্য নিবেদন করতে হয় পুরোহিত, সমাগত ঋষি ও প্রধান প্রধান বিপ্রদের ; সেই সঙ্গে মাল্যবন্দনাদির অর্ঘ্য নিবেদন করতে হয় বিশিষ্ট অতিথিদের। এক্ষেত্রে রাজন্যবর্গই সেই শ্রেণীতে পড়েন।

বিশাল যজ্ঞসভা দারুণ হলহলা শব্দে পূর্ণ। তন্মধ্যে যাজক ও ব্রাহ্মণদের তর্কবিতর্ক, স্বীয় জ্ঞান-প্রদর্শনের আস্ফালনই অধিক। নৃপতিদের সাহঙ্কার স্পর্ধা প্রকাশের প্রতিযোগিতা তো আছেই—পারিষদদেরও কম নয়, বরং তাঁদের অহঙ্কার প্রকাশের কারণতালিকা যেন সমধিক।

কিন্তু ঋত্বিক পুরোহিত বরণ শেষ হলে, যখন বিধি অনুযায়ী অর্ঘ্য দেবার কাল উপস্থিত হ'ল—তখন অকস্মাৎ সেই বৃহদংশের সমস্ত কোলাহল স্তব্ধ হয়ে গেল। আর সহসা এই নিস্তব্ধতায় ব্রাহ্মণগণও তাঁদের অন্তহীন তর্কবিতর্ক স্থগিত রেখে নির্নিমেষ কৌতূহলে এদিকে চেয়ে রইলেন। অর্থাৎ বিশিষ্ট অতিথি নৃপতিদের দিকে।

এ আকস্মিক নীরবতার কারণ আছে।

ভারতের সর্বপ্রান্তের ছোট বড়—স্বাধীন সামন্ত করদরাজা সকলেই সমাগত হয়েছেন। এঁদের প্রত্যেককেই কিছু অর্ঘ্যদান সম্ভব নয়। অবশ্যই নির্বাচিত কয়েকজনকে দেওয়া হবে। সে সৌভাগ্য কাদের ভাগ্যে? পাণ্ডবরা কাকে অগ্রাহ্য ক'রে কাকে সম্মান প্রদর্শন করবেন—কৌতূহল ও অধীর প্রতীক্ষা সেইজন্যই। রাজন্যবর্গের অলস কৌতূহল মাত্র নয়—তাঁদের কাছে এ সম্মান বা অবহেলার মূল্য অনেকখানি। যেটা প্রাপ্য বলে মনে করছেন সেটা না পেলে অসম্মানিত শুধু নয়—অপমানিত বোধ করবেন। সকলেরই কিছু না কিছু দাবি আছে। যাঁর ক্ষুদ্র রাজ্য সামান্য ক্ষমতা, তিনিও মনে মনে বংশ-মর্যাদার অভিমান দিয়ে বিশালতর দাবি রচনা করছেন।

রাজবংশীয় বা ক্ষত্রিয় সমাজে বোধ করি ভীষ্মই প্রাচীনতম ব্যক্তি, তিনি রাজাদের এ মনোভাবের কথা বিলক্ষণ অবগত আছেন। যুধিষ্ঠির যে অর্ঘ্যদানের পূর্বে সে কর্তব্যবিধির কথা তাঁকেই প্রশ্ন করবেন, কিংকর্তব্য তাঁর কাছেই জানতে চাইবেন—তাও জানেন। তাই অনেক চিন্তা ক'রে সে সমস্যার সমাধানও ভেবে রেখেছেন।

যুধিষ্ঠিরও সত্যসত্যই—যথাসময়ে তাঁর সামনে এসেই—সে প্রশ্ন উত্থাপন করলেন।

ভীষ্ম মনে মনে উত্তরটা ভেবে রাখলেও ক্ষণকাল মৌন থেকে উপস্থিত রাজন্যবর্গের দিকে একবার চেয়ে নিলেন, যেন ওঁদের মনোভাবের মৌখিক

প্রতিচ্ছবির সঙ্গে নিজের বিচারটা মিলিয়ে নিলেন আর একবার। তারপর তাঁর অভ্যাসমতো ধীরে ধীরে বললেন, 'গুরু, পুরোহিত, স্নাতক, সম্বন্ধী, সুহৃৎ ও রাজগণ—এঁরা সকলেই শুভ-কর্মারম্ভে অর্ঘ্যলাভের বা সম্মানিত হবার যোগ্য। এঁরা বহুদিন পরে অনুগ্রহ ক'রে আমাদের কাছে এসেছেন, এজন্য এঁদের অর্ঘ্য দিয়ে সম্মান না প্রদর্শন কর্তব্য। তবে এই শ্রেণীর অভ্যাগতদের সংখ্যা যেরূপ বিপুল, সকলকে অর্ঘ্য দিতে গেলে আজদের দিন তো বটেই—পক্ষকাল লেগে যাওয়াও বিচিত্র নয়। তাই, আমার মতে, এঁদের প্রতিভূ হিসেবে কিছু কিছু প্রধান ব্যক্তিকে অর্ঘ্য দাও, কিন্তু তারও পূর্বে এ সভার যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ অভ্যাগত —তাঁকে সর্বপ্রথম ও শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য প্রদান ক'রে তোমার কার্য আরম্ভ কর। আমার মনে হয় এ ব্যবস্থায় কেউ তোমার ত্রুটি ধরে ক্ষুণ্ণ হবেন না।'

এই সংখ্যাতীত অতিথিদের অর্ঘ্যদানের কথা চিন্তা করতে গিয়ে বিপুল কালব্যয়ের কথাটাই উৎকণ্ঠিত করেছিল যুধিষ্ঠিরকে। তিনি এখন যেন অনেকখানি নিশ্চিন্ত হয়ে করজোড়ে পুনঃপ্রশ্ন করলেন, 'পিতামহ, সেক্ষেত্রে আপনিই সেই সর্বাগ্রগণ্য ব্যক্তিকে চিহ্নিত করুন, যিনি এই সকল অতিথির মধ্যে প্রথম ও শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য পাবার যোগ্য।'

ভীষ্ম বললেন, 'যিনি অবনত মস্তকে সকলের পাদস্পর্শ ক'রে সর্বজন-শ্রদ্ধেয় হয়েছেন, যার আগমনে এই সভা আলোকিত, এখানের বাতাস আমোদিত ও আহ্লাদিত হয়েছে—সেই শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত এ প্রসঙ্গে তো আর কারও কথা মনে আসছে না। তুমি তাঁকেই ঐ অর্ঘ্য দান করো।'

ভীষ্মের এ প্রস্তাব যাঁদের কর্ণগোচর হ'ল—হওয়ার খুব বাধাও ছিল না, কয়েকজন উচ্চকণ্ঠ দৌবারিক নিযুক্তই ছিল, যারা সকল প্রয়োজনীয় প্রশ্নোত্তর সভার প্রান্তে প্রান্তে পুনঃউচ্চারিত ক'রে দূরতম স্থানে পর্যন্ত তার বার্তা পৌছে দেবে —তাঁদের অধিকাংশই হর্ষধ্বনি ক'রে ভীষ্মকে সমর্থন করলেন। কিন্তু আর এক অংশ, যে সকল নৃপতি পাণ্ডবদের প্রতি ঈর্ষিত ও বৃষ্ণি বা যদুকুল সম্বন্ধে বিদ্বিষ্ট—তাঁদের মুখ ক্রোধে অঙ্গারবর্ণ ধারণ করল, তাঁরা ঘন ঘন নিঃশ্বাস ত্যাগ ও করমুষ্টি বদ্ধ করতে লাগলেন, কিন্তু অধিকাংশেরই অনুমোদন ও সহদেব কর্তৃক সেই শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যদানকার্য প্রত্যক্ষ করলেও—তখনই কোন প্রতিবাদ করতে সাহস করলেন না।

একমাত্র চেদীরাজ শিশুপাল ছাড়া।

সম্রাট জরাসন্ধর পাপ-সহচর এই শিশুপালের শৈশবে এক বিচিত্র ইতিহাস ছিল।

শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবের নিকট-আত্মীয়, এঁদের পিতৃষসা-সম্পর্কে ভ্রাতা। কিন্তু লোকটি যেমন পাষণ্ড তেমনি ক্রূর। বিবেকবর্জিতও।

কিম্বদন্তী, এঁর জন্মের সময় চারটি হাত ও তিনটি চক্ষু ছিল। শুধু তাই নয়, ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গর্দভের ন্যায় উচ্চ শব্দ ক'রে উঠেছিলেন। অশুভ আশঙ্কা ক'রে ওঁর জননী ও জনক তখনই ওঁকে ত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। কিন্তু দৈবজ্ঞ ভবিষ্যদ্বক্তারা এসে গণনা ক'রে বললেন, 'আপনারা অযথা ভয় পাবেন না। এই শিশু কালে স্বাভাবিক মানুষের আকার ধারণ করবে। এবং যৌবন-প্রাপ্তে মহাবলপরাক্রান্ত যুদ্ধজীবী হবে। কোন ভগবদংশজাত মহাপুরুষ—এরই আত্মীয়—একে ক্রোড়ে করলেই এর অতিরিক্ত বাহু শুষ্ক হয়ে মিলিয়ে যাবে, তৃতীয় চক্ষুটিও নিশ্চিহ্ন হবে। সাধারণ মানুষের মতোই অবয়বপ্রাপ্ত হবে। তবে যার স্পর্শে এই অলৌকিক ঘটনা ঘটবে, পরমায়ু পূর্ণ হলে তার আয়ুধেই এ নিহত হবে। এ-ই এর ভাগ্যলিপি, কোন কারণেই তার অন্যথা হবে না।'

দৈবজ্ঞদের বাক্যে কিছুটা নিরুদ্বিগ্ন হয়ে চেদীরাজ-মহিষী নবজাতককে ক্রোড়ে তুলে নিয়ে স্তন্যদান করলেন এবং লালন করতে লাগলেন কিন্তু সম্পূর্ণ আশ্বাস লাভ করতে পারলেন না। ভবিষ্যৎদ্রষ্টাদের নিষ্ঠুর গণনা তাঁর দিন-রাত্রিকে বিভীষিকাগ্রস্ত ক'রে রাখল।

সেই কারণেই তিনি শিশুকে সমাগত অতিথি আত্মজন ঋষি ব্রাহ্মণ সকলের ক্রোড়েই দিতে লাগলেন কিন্তু কারও স্পর্শেই কোন পরিবর্তন ঘটল না। কিছুকাল পরে একদা অন্যদেশ-যাত্রাপথে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণও কয়েক প্রহরের জন্য অতিথি হলেন এবং তাঁর পিতৃষসা—কোন কিছু আশা না রেখে কতকটা অভ্যাসবশতই, কারণ বাসুদেব তখন তরুণবয়স্ক ভাগ্যান্বেষী মাত্র—শিশুকে তাঁর অঙ্কে স্থাপন করলেন। কিন্তু এইবারই, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, আশ্চর্য ফল দেখা দিল। কণ্ঠস্বর তো স্বাভাবিক শিশুর মতো হয়ে গেলই—অতিরিক্ত বাহু দুটিও সেই দণ্ড থেকে শুষ্ক ও বিবর্ণ হতে লাগল। কিছুদিনের মধ্যে বিচ্ছিন্ন-মূল শাখার মতো শুষ্ক সে দুটি বাহু একদা আপনিই খসে পড়ে গেল এবং তৃতীয় নেত্রবিবরও এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হ'ল যে সেটি কোন্ স্থানে ছিল তা স্মরণ করা জননীর পক্ষেও কঠিন হয়ে উঠল।

তবে—এক দুশ্চিন্তা গত হলেই আর এক দুশ্চিন্তা দেখা দেয়।

চেদীরাজ-মহিষী যেন অধিকতর উৎকণ্ঠিত হয়ে বাসুদেবকে আহ্বান ক'রে পাঠালেন। এবং শ্রীকৃষ্ণ এলে ওঁর দুটি কর ধরে অনুনয় জানালেন, 'তুমি প্রতিজ্ঞা করো আমার পুত্রকে কোনদিন বধ করবে না!'

সেই বয়সেই—কংস-বধের পর যদুবংশকে তখনও সুপ্রতিষ্ঠিত বা স্বতন্ত্র শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি শ্রীকৃষ্ণ, তৎসত্ত্বেও—তাঁর রহস্যময় হাসি লোকের আলোচনার বস্তু হয়ে উঠেছিল। এদিনও তিনি তেমনি দুর্জ্ঞেয় হাসি হেসে উত্তর দিলেন, 'এ জগতে দেহধারণ করলেই সে দেহের নাশ অনিবার্য; জন্মগ্রহণ করলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আপনার পুত্র অমর হতে পারে না।—এটা আপনিও নিশ্চয় স্বীকার করবেন। আমার দ্বারাই ওর বিনাশ যদি এই জাতকের ভাগ্যলিপি হয়—গণকরা যদি ভুল না ক'রে থাকেন তো তা হবেই। তবে আমি অকারণে কাউকে—বিশেষ আত্মীয়কে—বধ করব, এমন আশঙ্কা করছেন কেন? যদি এই জাতক পরবর্তীকালে আমার কোন বিশেষ অনিষ্ট না করে বা আমার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হয় তো ওকে বধ করবার তো কোন কারণ দেখি না। তবু, আপনার মনস্তুটির জন্য আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমার সম্পর্কে ওর একশত অপরাধ ক্ষমা করব। তার পরও যদি কোন কারণে আমার অনিষ্টসাধন কি অবমাননা করে, তাহলে আর আমি দায়ী থাকব না।'

তখন এই আশ্বাসই যথেষ্ট বোধ হয়েছিল।

মাতারও, পুত্রেরও। কতকটা যেন সেই বলে বলীয়ান হয়েই শিশুপাল কৈশোরকাল থেকে দুর্বৃত্ততা ক'রে বেড়াচ্ছিলেন। দুর্জনের দুর্জন বন্ধু বা পৃষ্ঠ-পোষকের অভাব ঘটে না। এমনিই কয়েকটি নাতিবৃহৎ রাষ্ট্রের স্বয়ংবৃত সেনাপতি হয়েছিলেন শিশুপাল।

স্বাভাবিক ভাবেই সব চেয়ে আক্রোশ বাসুদেবের ওপর। নানা প্রকারে তাই বিগত কয়েক বৎসর অকারণেই তাঁর যথেচ্ছ অবমাননা ও ক্ষতি ক'রে বেড়িয়েছেন শিশুপাল, নানা প্রকারে তাঁকে বিব্রত ও বিপর্যস্ত করার চেষ্টা করেছেন।

সুযোগও পেয়েছেন বৈকি। শ্রীকৃষ্ণের ক্রমবর্ধমান বীর্য-খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অনেকেরই ঈর্ষার কারণ হয়ে উঠেছিল। বিশেষ জরাসন্ধের সঙ্গে বৈরিতা তো সর্বজনজ্ঞাত হয়ে পড়েছিল। স্বর্ণলতা রসালকে অবলম্বন করে, বিষলতা কণ্টক-তরুর আলিঙ্গন খোঁজে। পাপও পাপের সাহচর্যের জন্য লালায়িত হয়। বিকৃত-রুচি দুষ্ট ব্যক্তিই মন্দবুদ্ধির আশ্রয়দাতা হয়। শিশুপাল সেই কারণেই জরাসন্ধের পৃষ্ঠপোষকতা প্রার্থনা ও লাভ করেছিলেন। জরাসন্ধের নামে আরও অনেক নৃপতি—কিছুটা ভয়ে কিছুটা নিজেদের নিরাপত্তার আশায় তাঁকে সাহায্য করতেন।

জরাসন্ধের মৃত্যুতে যাদবদের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধের সাহস দূরীভূত হলেও, তস্করের

মতো গোপন উপায়ে ও কৌশলে শ্রীকৃষ্ণকে বিব্রত বা ক্ষতিগ্রস্ত করার পন্থা ত্যাগ করেন নি শিশুপাল। এবং শ্রীকৃষ্ণর প্রতিজ্ঞাকে উপায়হীনতা ভেবে যথেষ্ট আত্মশ্লাঘাও বোধ করতেন।

আজ সেই শিশুপালই জনার্দনের পূজার তীব্র প্রতিবাদ করবেন এতে আর আশ্চর্য কি? এবং সে প্রতিবাদ যে ইতর ও কদর্য গালিগালাজের রূপ ধারণ করবে সেও তো এক প্রকার সুনিশ্চিত।

কিন্তু সে গালিগালাজ শ্রীকৃষ্ণতেই কেন্দ্রীভূত রইল না।

তাঁকে উপলক্ষ ক'রে প্রধানত—এই নির্দেশ দিয়েছেন বলে—ভীষ্ম,ও সে নির্দেশ মান্য করেছেন বলে পাণ্ডবদের উপরেও বর্ষিত হতে লাগল।

ভীষ্ম বিবাহ করেন নি পিতৃভক্তিবশত কিন্তু শিশুপাল তাঁকে ক্লীব নপুংসক বলার সুযোগ ছাড়বেন কেন? শ্রীকৃষ্ণ এই অর্ঘ্য গ্রহণ করেছেন বলে তাঁকে আবর্জনাস্তূপে-নিক্ষিপ্ত-খাদ্যলোলুপ পথকুক্কুর বলতে দ্বিধা করলেন না। কিছু কিছু যুক্তিও দিলেন স্বপক্ষে। শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতার্থে নৃপতি নন, তাঁর মাতামহ উগ্রসেন এখন এই কুলের অভিষিক্ত নরপতি। বয়োবৃদ্ধ ধরলে কৃষ্ণর থেকে বয়স্ক লোক অসংখ্য আছেন, ভীষ্মই তো রয়েছেন। তিনি পাণ্ডব-কৌরবদের কুলপতিও বটে। ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্ম, শস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য, শাস্ত্রগুরু কৃপ, বহুশাস্ত্রজ্ঞ অশ্বত্থামা, মহামানী রাজা দুর্যোধন, মাতুল শল্য, আত্মীয় দ্রুপদ, ভীষ্মক প্রভৃতি উপস্থিত থাকতে শ্রীকৃষ্ণ কোনক্রমেই এ অর্ঘ্য পেতে পারেন না। বিশেষ অতুলপ্রতাপ বিশ্বত্রাস জরাসন্ধ অন্যায়ভাবে নিহত হয়েছেন—সে কেবল এই বিবেকহীন বীরধর্মপরাঙ্মুখ শ্রীকৃষ্ণের চক্রান্তে ও পরামর্শে। এ দুর্মতি ভদ্রসমাজে স্থান পাওয়ারই যোগ্য নয়।

সহদেব ছেলেমানুষ, অর্ঘ্য তিনিই হাতে ক'রে দিয়েছেন। তাঁর আর সহ্য হ'ল না, বলে উঠলেন, 'শ্রীকৃষ্ণের পূজা যে সহ্য করতে পারে না, আমি তার মস্তকে পদাঘাত করি।'

এতটা বলা উচিত হয় নি, বিশেষ তিনি হোতা-পক্ষের একজন। সভামধ্যে প্রতিবাদের একটা মৃদু গুঞ্জন উঠল। যুধিষ্ঠিরও 'ছিঃ!' বলে সহদেবকে অস্ফুট একটা ধিক্কার দিয়ে উঠে এসে বিনয়-বচনে মিষ্টবাক্যে শিশুপালকে নিরস্ত ও শান্ত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সে সান্ত্বনাবাক্য যেন অগ্নিতে ঘৃত নিক্ষেপেরই কাজ করল। শিশুপাল অধিকতর ক্রুদ্ধ ও প্রগল্‌ভ হয়ে উঠলেন। রাসভ-কর্কশ কণ্ঠে আরও গালিগালাজ ও স্পর্ধা প্রকাশ করতে লাগলেন। তাঁর দুঃসাহসে

ভরসা সঞ্চয় ক'রে বেশ কয়েকজন অন্য রাজা বা প্রধানগণও স্ব-স্ব আসন ত্যাগ ক'রে তাঁর সঙ্গে সভাগৃহের বাইরে আসার চেষ্টা করলেন।

এতক্ষণে ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে ভীষ্মরও।

তিনি বললেন, 'শ্রীকৃষ্ণ কেবল আমাদেরই পূজ্য নন, সমস্ত বিশ্বেরই পূজনীয়। জন্মাবধি তিনি যে সব আশ্চর্য আশ্চর্য কর্ম করেছেন তেমন আর কবে কোথায় শোনা গেছে? পূতনাবধ তো একান্ত শৈশবের কথা। বাল্যে আরও কত দানবসদৃশ ভয়ঙ্কর দস্যু পামর চক্রীকে নিহত করেছেন, গোবর্ধন পূজার সময় যাদবদের নেতৃত্ব ক'রে ইন্দ্রের দর্পচূর্ণ করেছেন—সে বৃত্তান্ত ওঁর যৌবনকালেই কিম্বদন্তীতে পরিণত হয়েছে। যখন কেবলমাত্র কিশোরবয়স্ক তখনই ইনি মহাবলপরাক্রান্ত দস্যুরাজ কংসকে একক যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত ক'রে মাতামহ উগ্রসেন, নিজ পিতামাতা এবং অন্যান্য বহু সজ্জন ক্ষত্রবীরকে ভয়াবহ কষ্টদায়ক কারাবাস থেকে মুক্ত করেছেন। জরাসন্ধ বধের জন্য যদি ইনি বাহুবল অপেক্ষা কৌশলের উপরেই অধিক নির্ভর ক'রে থাকেন, তা এমন কিছু দোষার্হ হয় নি। শত্রুবিশেষে বিভিন্ন যুদ্ধপদ্ধতি অবলম্বন করা নূতনও নয়, অশাস্ত্রীয়ও নয়। মানুষ শার্দূলকে নখদন্তে বিনষ্ট করবে তা সম্ভব নয়।...আর বৃদ্ধ? কেবলমাত্র বয়সে বৃদ্ধ হলেই সে প্রবীণ বা পূজ্য বলে গণ্য হয় না। জ্ঞানবৃদ্ধ, বলবৃদ্ধ, ধন বা সঙ্গতি-বৃদ্ধ—এ রাও বৃদ্ধ বলে গণ্য হন, এগুলিও বার্ধক্যের মান। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, মানব-মানসাভিজ্ঞ, সাতিশয় বলশালী যোদ্ধা, এতকালে প্রভূত ঐশ্বর্যও সঞ্চয় করেছেন—সুতরাং সকল দিক দিয়েই তিনি এ সভার বৃদ্ধতম ব্যক্তি। শাস্ত্রে উল্লিখিত ষড়-প্রকার যোগ্যতার মধ্যে অধিকাংশ যোগ্যতা এঁর মধ্যে বিদ্যমান। গুরু, ঋত্বিক, স্নাতক, সম্বন্ধী, সুহৃৎ, নৃপতি—এর মধ্যে কমপক্ষে চারটি যোগ্যতায় এই অর্ঘ্য উনি দাবি করতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের যোগ্যতায় যে সন্দিহান হয়—সে ঘোরতর অজ্ঞ ও নির্বোধ। তিনি এই সভাতেই উপস্থিত আছেন, যাদের মৃত্যু আসন্ন তারা ওঁর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রেই দেখুক না, শ্রীকৃষ্ণের পরাক্রম কতদূর!'

আরও বহুক্ষণ এইভাবে উক্তি, প্রত্যুক্তি—কদর্য বাক্‌যুদ্ধ চলল।

এই সমস্ত সময় শ্রীকৃষ্ণ নিজ আসনে স্থির ভাবে বসে ছিলেন। মুখে সেই স্বভাবসিদ্ধ রহস্যময় প্রসন্ন হাসি, দৃষ্টিতে ঔদাসীন্য বা নির্লিপ্ততা। ক্রমশ কদর্যতা চরমে পৌঁছে যজ্ঞের আয়োজন পণ্ড হবার আশঙ্কা দেখা দিতেই তিনি সহসা উঠে দাঁড়ালেন। এতক্ষণে তাঁকে দাঁড়াতে দেখে সব কোলাহল ও বিবদমান দুই পক্ষের বাগ্‌বিতণ্ডা সঙ্গে সঙ্গেই স্তব্ধ হয়ে গেল।

শ্রীকৃষ্ণ গম্ভীর উচ্চনাদী কণ্ঠে বললেন, 'সভাস্থ ঋষি ব্রাহ্মণবৃন্দ, আত্মীয়, সুহৃদ ও সমাগত সজ্জনবৃন্দ, আপনারা সকলে দয়া ক'রে শ্রবণ করুন। এই ব্যক্তি আমার আত্মীয়মধ্যে গণ্য। এর মাতার কাতরোক্তিতে আমি এর একশত অপরাধ ক্ষমা করব বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম—সে কাহিনী কিছু পূর্বে ভীষ্মমুখে আপনারা শুনেছেন। মাতৃঅঞ্চলাবৃত নিরাপত্তার ভরসায় শিশু যেমন স্পর্ধা প্রকাশ করে—এর অবস্থাও প্রায় তদ্রূপ। কিন্তু সে ধৃষ্টতা যদি কেবলমাত্র মৌখিক কটূক্তিতেই সীমাবদ্ধ থাকত আমি অবহেলা করতাম—একশতের অপরাধের সীমা অতিক্রম করা সত্বেও। কিন্তু এই মূর্খের স্পর্ধা চরমে পৌঁচেছে। এর দুর্বৃত্ততার পূর্ণ তালিকা দিতে গেলে এক প্রহরকাল অতিক্রান্ত হবে, তদপেক্ষা সময়ের অপব্যবহার আর কি হতে পারে? আমি সাম্প্রতিক দু-একটি পাশবিক আচরণের কথা উল্লেখ করব, তা থেকেই এর চরিত্র কেমন আপনারা বুঝতে পারবেন। আমি ও আর্য বলদেব আমন্ত্রিত হয়ে যখন ভারতের অন্তপ্রান্ত প্রাগ-জ্যোতিষপুরে যাই তখন যদুবংশের দৌহিত্র হয়েও এই দুরাচার দ্বারকা উৎসাদিত ও দগ্ধকরে, লুণ্ঠন ও নারীদের অমর্যাদা তো বটেই। ভোজরাজ আমাদের অতিথি হয়ে রৈবতকে এসে কয়েক মাস ছিলেন, আমার ও বলদেবের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে সসৈন্যে অতর্কিতে এসে তাঁর সহচরদের কাউকে হত্যা কাউকে বা বন্দী ক'রে নিয়ে যায়। এই পাপাত্মা নিজ মাতুল—আমার পিতা বসুদেবের যজ্ঞাশ্ব হরণ করেছিল। তপস্বী অক্রূরের ভার্যা দ্বারকা থেকে সৌবীর রাষ্ট্রে গমন করছিলেন—এই পাষণ্ড তাঁকে অনভিলাষিণী জেনেও হরণ ও ধর্ষণ করেছিল। এই কুলপাংশুল ছদ্মবেশে স্বীয় মাতুলকন্যা ভদ্রাকে হরণ করতেও দ্বিধাবোধ করে নি। এমন কি এই মূঢ় আমার বিবাহে বাধা দেবার উদ্দেশ্যেই রুক্মিণীকে প্রার্থনা করেছিল কিন্তু উদ্বাহু বামনের চন্দ্রাভিলাষের মতোই ব্যর্থ হয়েছিল, তাতে কিছুমাত্র অপ্রতিভ বোধ করে নি।···আমি এই সব অনাচার ও বিরুদ্ধাচরণ সহ্য করেছি পিতৃষ্বসার অনুনয় স্মরণ করেই। তবে এর—পশুর থেকেও নিকৃষ্ট প্রাণী—বোধ করি ক্রিমিকীটের মতো, আচরণ ও দুর্ব্যবহার তাঁর কাছে প্রতিশ্রুত শত সংখ্যা অতিক্রম করেছে, এইবার এই পাপিষ্ঠকে আমি বধ করব।'

অনেক সময় বালকরা তাদের নবলব্ধ শক্তির পরিসীমা জ্ঞাত না থাকায় যেমন অনায়াসে প্রজ্বলিত অগ্নিকে করায়ত্ত করার চেষ্টা করে—মোহগ্রস্ত ব্যক্তি যেমন নিজেই বিষধর সর্পের নিকটবর্তী হয়—শিশুপালও যেন মৃত্যু আসন্ন দেখেও অধিকতর কটূক্তি ও ব্যঙ্গোক্তি করতে গেলেন, বিশেষ রুক্মিণীকে নিয়ে।

কিন্তু ততক্ষণে—স্বীয় বক্তব্য শেষ হওয়ার পূর্বেই—কেশিনিসূদন কেশব

শ্রীকৃষ্ণর ভ্রূকুটি ভয়ঙ্কর ও দৃষ্টি করাল হয়ে উঠেছে, সে দৃষ্টিতে যেন চরাচর দগ্ধ হবে এমন ধারণা হচ্ছে দর্শকদের মনে। যাঁরা চিরদিন তাঁর প্রসন্ন মধুর শান্ত মুখশ্রী দেখে এসেছেন, তাঁরা সেদিকে চেয়ে বিস্ময়ে ও আতঙ্কে মূর্ছাহত হয়ে পড়লেন; কেউ কেউ সে দৃষ্টির প্রাখর্য সহ্য করতে না পেরে সত্যিই মূর্ছিত হলেন। সে । অনলবর্ষী আয়ত চক্ষুর দিকে যেন কেউ তাকাতেও পারছেন না, চোখ ফিরিয়ে নিতেও পারছেন না

সে দৃষ্টির দুঃসহতার সম্মুখে শিশুপালও যেন কেমন জড়বৎ হয়ে গেলেন, আর কিছু করা কি বলা, আত্মরক্ষার চেষ্টামাত্র করারও সামর্থ্য রইল না। সে অবসরও অবশ্য পেলেন না বিশেষ। শ্রীকৃষ্ণ নিমেষকালমধ্যে তাঁর বিখ্যাত চক্রাস্ত্রে, সেই অগণিত ক্ষত্রবীর-মধ্যে, শিশুপালের অনুচর ও অনুষঙ্গীদের সামনেই ওঁকে দ্বিখণ্ডিত ও নিহত করলেন।

তারপরও বহুক্ষণ পর্যন্ত সেই বিপুল যজ্ঞসভা প্রাণহীন সুষুপ্তবৎ স্তব্ধ হয়ে রইল। কারও কিছু চিন্তা করার, প্রতিবাদ করার, এমন কি বাসুদেবের জয়ধ্বনি করারও সামর্থ্য রইল না। যেসব নৃপতিরা শিশুপালকে সমর্থন ও অনুসরণ করছিলেন এতক্ষণ, তাঁদের কেউ কেউ অবশ্য নীরবে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ কিংবা ওষ্ঠ দংশন করতে লাগলেন কিন্তু বাঙ্‌নিষ্পত্তি করার সাহস হ'ল না কারও। এক কথায়—প্রায় দণ্ডকাল সময় লাগল সেই অভূতপূর্ব, অকল্পনীয়, অবর্ণনীয় ঘটনার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে। এই সমস্ত সময়টা সেই বিশাল জনসমুদ্রে যেন মৃত্যুরই নীরবতা বিরাজ করতে লাগল।

॥ ২১ ॥

সেই প্রথম দিনের একান্ত অনভিপ্রেত ঘটনার পর যজ্ঞে আর কোন বাধা কি বিপত্তি দেখা দেয় নি। প্রবীণ শাস্ত্রজ্ঞদের বিধান অনুযায়ী শিশুপালের শবদেহ সৎকারের জন্য প্রেরণ ক'রে সে স্থান সুপরিষ্কৃত ও তাঁর পুত্রকে চেদীরাজ বলে ঘোষণা ক'রে যুধিষ্ঠির যথাবিহিত সংকল্পান্তে যজ্ঞ আরম্ভ করলেন।

ক্ষোভ যে একেবারে দূরীভূত হ'ল তা নয়। এ সংসারে এক শ্রেণীর মানুষ চিরদিনই থাকে—অন্যায় দমনকে যারা অত্যাচার বলে মনে করে এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও দুষ্কৃতিকারী সম্বন্ধে মমতা পোষণ করে। পাপের সাহায্যে শক্তি-সম্পদ আহরণ-প্রয়াসী ব্যক্তির সংখ্যাও বড় অল্প নয়। নৃপতিদের মধ্যেও এই ধরনের মনোভাব যথেষ্ট। তাঁরা ক্ষুব্ধ, কেউ কেউ ক্রুদ্ধ হয়েই রইলেন।

কিন্তু শিশুপালের মতো দুর্ধর্ষ ব্যক্তির পরিণাম, শ্রীকৃষ্ণের সেই ভয়ঙ্কর রুদ্রমূর্তি, এবং পাণ্ডবসমর্থনকারীদের সংখ্যা ও শক্তি প্রত্যক্ষ ক'রে কেউই কোন প্রকাশ্য প্রতিবাদ করতে সাহস করলেন না। তবে তাঁদের অনেকেই বহুক্ষণ পর্যন্ত অবনত মস্তকে অপমানিত অসহায়ের সম্বল ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন ও দন্তে দন্তে ঘর্ষণ বা ওষ্ঠ দংশন ক'রে মনোবেদনা দমনের চেষ্টা করতে লাগলেন। ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে এর প্রতিশোধ নেবেন এই কামনায় সান্ত্বনালাভের চেষ্টাও করলেন কেউ কেউ।

কিন্তু সেদিকে আর কারও মনোযোগ ছিল না। অত ভ্রূক্ষেপও করলেন না কেউ। মধ্যের এই ছেদটুকুর পরেই আবার উৎসব সমারোহের সুর লেগেছে সবার মনে, কর্মকাণ্ডের বিশালতার বিস্ময় ও মোহ আচ্ছন্ন করেছে অধিকাংশের চিন্তাশক্তি। দু-চারজন এদিকে লক্ষ্য রেখেছিলেন অবশ্য—ভীষ্ম বিদুর প্রভৃতি—তাঁরা যতটা সম্ভব অতিরিক্ত সম্মান ও সমাদর প্রদর্শন ক'রে এঁদের কিঞ্চিৎ তুষ্ট করার চেষ্টা করলেন—কিন্তু তাতেও তাঁদের চিত্তানল যে নির্বাপিত বা প্রশমিত হ'ল না—তাও বুঝতে পারলেন। তবে এসব তুচ্ছ তথ্যাদি—যজ্ঞকর্ম ও দীয়তাং ভুজ্যতাং-এর বিপুলতার সমারোহে—চাপা পড়ে গেল। আমন্ত্রিত, রবাহুত ও অনাহুত জনসাধারণ এবং বিপ্রাদিরা তো বটেই, রাজন্যবর্গও এতাদৃশ অভূতপূর্ব আপ্যায়ন ও সুখাদ্য এবং বিলাসদ্রব্যের বাহুল্যে অভিভূত হয়ে পড়লেন। তাঁদের অধিকাংশই এ ধরনের ভোগবিলাস ও আহারাদিতে অভ্যস্ত নন, অনেকের কাছে কল্পনাতীত—রূপকথার বর্ণনায় শ্রুত মাত্র। সাধারণ ব্যক্তিরা যথেষ্ট তুষ্ট হলেন, তাঁরা পাণ্ডবদের জয়-জয়কার করতে লাগলেন। বিশিষ্ট অতিথিরাও প্রায় সকলেই গোপনে হৃদয়োত্থিত দীর্ঘশ্বাস মোচন ও সহজ ঈপ্সাতুর ঈর্ষা অন্তরেই দমন ক'রে মুখে এঁদের জয়ধ্বনি করতে করতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও প্রতিনিমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিলেন। যাওয়ার সময় পাণ্ডবরা যেসব উপহারদ্রব্যাদি সঙ্গে দিলেন, তার পার্থক্য বা বৈষম্য, ও কল্পিত পক্ষপাত বিচার রইল দীর্ঘ যাত্রাপথের আলোচনার বস্তু।

গেলেন না কেবল ধার্তরাষ্ট্র ভ্রাতৃবর্গ ও তাঁদের পরভৃৎ মাতুল, গান্ধাররাজ তনয়, সুবল-পুত্র শকুনি ; জ্যেষ্ঠ ভাগিনেয়র অহরহ চাটুগান ও কুমন্ত্রণাদানই যার জীবিকা-নির্বাহের প্রধান উপায় বলা যেতে পারে।

পাণ্ডবরাই—কতকটা কর্তব্যবোধে, সৌজন্য প্রকাশের রীতি অনুযায়ী, কতকটা শ্রীকৃষ্ণের উপদেশেও, জ্ঞাতি-ভ্রাতাদের অনুরোধ করেছিলেন আর কয়েক-দিন থেকে যেতে। বলেছিলেন, এই লক্ষ লক্ষ লোকের ভিড়ে ও কর্মব্যস্ততায়

ভ্রাতাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপ ও প্রীতিবিনিময়ের অবসর পাওয়া যায় নি। ওঁরা যদি আর কটা দিন এখানে বিশ্রাম ক'রে যান তো সেই একান্ত অভিপ্রেত সুযোগ পাওয়া যেতে পারে।

আমন্ত্রণটুকু জানিয়েছিলেন ঠিকই—কিন্তু কৌরবরা যে সত্য সত্যই রাজী হয়ে যাবেন তা আশঙ্কা করেন নি।—হ্যাঁ আশঙ্কাই। কৌরবরা কখনই ওঁদের শুভাকাঙ্ক্ষী নন। জন্মান্ধ বলে ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ হওয়া সত্বেও সিংহাসনে বঞ্চিত হয়েছিলেন। সে দুঃখ কিছুটা দূর হতে পারত যদি ওঁর সন্তান অন্তত বংশের জ্যেষ্ঠ হ'ত। সেদিক দিয়েও ভাগ্য বঞ্চিত করলেন ওঁকে। কনিষ্ঠ পাণ্ডুর সন্তান যুধিষ্ঠিরই প্রথম জন্মগ্রহণ করলেন। ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্র হ'ল—কিন্তু সিংহাসন দাবি করার কোন দিকেই কোন অধিকার রইল না।

পাণ্ডুর অকালমৃত্যুর পর তাঁর নাবালক সন্তান পাঁচটি এবং এই রাজ্যের দায়িত্ব ভীষ্মই বহন করছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল এরা উপযুক্ত হয়ে উঠলে ভাগ্যের অবিচার-এর কিছুটা ক্ষতিপূরণ ক'রে দেবেন উনি, অর্থাৎ কুরুরাজ্য বংশের এই দুই ধারার মধ্যে বণ্টন ক'রে দেবেন। কিন্তু-ধৃতরাষ্ট্র তনয়দের সে অপেক্ষা সইল না। অদৃষ্টের প্রবঞ্চনা নিজেদের বুদ্ধিবলে পরাভূত করতে চেষ্টা করলেন। অন্যায় শুধু নয়—চরম পাপের পথে প্রতিবিধান করতে গেলেন, এবং সেটা শুরু হয়ে গেল প্রায় বাল্য থেকেই। হত্যার দ্বারা জ্ঞাতিকণ্টক দূর করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

দুর্যোধন ছিলেন ভীমের প্রায় সমবয়সী। দুজনেই মহাবলী, দুজনেই মল্লক্রীড়া ও গদাযুদ্ধে সুদক্ষ। স্বভাবতই এক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার প্রশ্ন ওঠে। কিন্তু সেখানেও দেখা গেল বিধাতা পক্ষপাত করেছেন কিছু। দৈহিক পরাক্রম ও আকৃতিতে ভীমেরই অধিকতর যোগ্যতা প্রমাণিত হ'ল একাধিক বার। সেজন্য ভীমের প্রতি তাঁর আক্রোশ সর্বাধিক। তিনি সেই অনতিক্রান্ত-বাল্যেই কয়েকজন ভ্রাতার সঙ্গে চক্রান্ত ক'রে ভীমকে হত্যা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু দৈবানুগ্রহে—দুর্যোধনের মতে দৈববিড়ম্বনায়—ভীম প্রায় অলৌকিক ভাবে বেঁচে গেলেন।

তারপর কৈশোরে পদার্পণ ক'রে পাণ্ডুপুত্রগণ যখন সকল দিক থেকেই সাফল্য ও যশ অর্জন করতে লাগলেন—তখন ঈর্ষা ক্ষোভ ও নিষ্ফল আক্রোশ ক্রমশ বিদ্বেষ ও ক্রোধের আকার ধারণ করবে এও স্বাভাবিক। অথচ—ভীষ্ম কোন একদেশদর্শিতা করেন নি, একই শিক্ষক একই শস্ত্রগুরু সকলের শিক্ষার তত্ত্বাবধান করতেন। কিন্তু না ভীম না অর্জুন কারুরই সমকক্ষ হতে পারলেন না।

কৌরবরা। প্রায় জ্ঞানশূন্য হয়ে দুর্যোধন এক অজ্ঞাতকুলশীল তরুণ যোদ্ধা কর্ণকে দিয়ে প্রদর্শনী-পরীক্ষা মণ্ডপে অর্জুনকে পরাভূত করার চেষ্টা করলেন—অপর কেউ ওদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এটা প্রমাণিত হলেও বুঝি ক্ষোভ কিছুটা অপনোদিত হয়—কিন্তু অকস্মাৎ মাতা কুন্তী অসুস্থ হয়ে পড়ায় ক্রীড়ামঞ্চ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হতে পারল না। আক্রোশ ও ঈর্ষা—প্রকাশের পথ না পেয়ে—বর্ধিততর হতে থাকল।

শেষ পর্যন্ত ক্রূরমনা দুর্যোধন – সম্ভবত ধৃতরাষ্ট্রের অনুমোদন ও অর্থানুকূল্যেই - ছল করে দূরান্তের এক গ্রামে পাণ্ডবদের পাঠিয়ে তাঁদের অগ্নিদগ্ধ ক'রে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করলেন। দাহ্য পদার্থে প্রস্তুত জতুগঠিত প্রাসাদ নির্মিত হ'ল। কৌরবদের বেতনভুক্ত পুরস্কারলুব্ধ সৈনিকরা পাণ্ডুতনয়দের দেহরক্ষীর ছদ্মবেশে ঘিরে রইলেন—পুরোচন নামে অতি নিষ্ঠুর ও পাপকর্মা এক ব্যক্তি গেলেন এই বীভৎস হত্যাকাণ্ড তত্ত্বাবধান করতে।

বাঁচার কথা নয়, কিন্তু দাসীগর্ভজাত এঁদের পিতৃব্য ধর্মনিষ্ঠ বিদ্বান ও বুদ্ধিমান বিদুর শুধু যে পাণ্ডবদের পূর্বেই সতর্ক ক'রে দিলেন তাই নয়, এই ঈর্ষাগ্নিবলয় থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় সম্বন্ধেও ইঙ্গিত দিয়ে দিলেন। সেই উপায়েই এঁরা কোনমতে প্রাণে রক্ষা পেলেন সে-যাত্রা।

তবু, পরিত্রাণ পেয়েও—নিঃসম্বল ও নিঃসহায় পাণ্ডবরা আর রাজধানীতে ফিরে যেতে সাহস করেন নি। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের বেশে স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। কোনমতে জীবনধারণ করছিলেন মাত্র। এভাবে বাঁচাও সম্ভব হ'ত কিনা সন্দেহ—ভীম এক অনার্য কন্যাকে বিবাহ ক'রে তার আনুকূল্যে ও সাহায্য পেয়ে অনেকটা সুবিধা ক'রে নিতে পেরেছিলেন, তাই রক্ষা!

তারপর—একেবারে পাঞ্চালদের জামাতা রূপে যখন এঁরা আত্মপ্রকাশ করলেন, যাদব ও বৃষ্ণিকরা যখন আত্মীয় বলে স্বীকার করলেন—ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য প্রভৃতি প্রধান বীর ও যোদ্ধারা যখন প্রবল ধিক্কারধ্বনি তুললেন, তখন কতকটা দিশাহারা হয়েই ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের তিরস্কার ক'রে এই সামান্য রাজ্যাংশ অর্ধেক বলে পাণ্ডবদের বুঝিয়ে দিয়ে নিজের পদবী ও বয়সের সম্মান রক্ষা করলেন। ঐটুকু সম্বল ক'রেই স্বীয় শৌর্য, বুদ্ধি ও সাহসবলে অল্প কিছুকাল মধ্যে পাণ্ডবরাজ ভারতখণ্ডের সম্রাট রূপে স্বীকৃতি পেলেন, এই স্বপ্ন-কল্পনাতীত সমৃদ্ধিরও অধিকারী হলেন—এ দেখে কৌরবরা স্নেহে বিগলিত হবেন ও এঁদের অধিকতর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করবেন—এমন আশা করার কোন কারণ নেই—পাণ্ডবরাও তা করেন না।

কৌরবরাও প্রীতিবশত থাকেন নি। আসলে তাঁদেরও এই ঐন্দ্রজালিক

প্রাসাদ ও এঁদের অর্জিত অবিশ্বাস্য বিত্তরাশি সম্বন্ধে কৌরবদের কৌতূহলের অবধি ছিল না। এই এক মাস কাল মধ্যে তার একটা অস্বচ্ছ ধারণা মাত্র হয়েছে, সম্পূর্ণ উপলব্ধির সুযোগ বা অবসর লাভ হয় নি।

এমনিতেই এই ধরনের প্রায়-দৈবপ্রাপ্ত সৌভাগ্যে জ্ঞাতিদের মনে জ্বালা ধরা স্বাভাবিক। সে জ্বালার তীব্রতা ও দাহিকাশক্তি সম্বন্ধেও কৌরবরা যে অনবহিত ছিলেন তা নয়। কিন্তু কোন কোন যন্ত্রণা—বেদনাদায়ক হওয়া সত্ত্বেও—বিকৃত মানসিকতা ও বিপরীত মনোধর্ম অনুযায়ী মানুষ উপভোগও করে। বিষধর সর্পের দৃষ্টির দিকে চেয়ে একই সঙ্গে সে আতঙ্ক ও মোহ-গ্রস্ত হয়। কৌরবরাও অপেক্ষাকৃত নির্জনতা ও কর্মহীনতার অবসর-মুহূর্তে ইন্দ্রপ্রস্থ নগরী, পাণ্ডবদের ভোগবিলাস সমারোহ ও এই নবনির্মিত প্রাসাদসৌধ দর্শনের বিষামৃত পান করতে লাগলেন।

লাঞ্ছনারও অবধি রইল না। বিশেষ, ভাগ্যক্রমে যেন দুর্যোধনের দুর্দশাই সমধিক। গৃহপ্রান্তের স্ফটিক প্রাচীরকে মুক্ত দ্বারপথ কল্পনা ক'রে বহিষ্ক্রান্ত হ'তে গিয়ে মুখে মস্তকে আঘাত পেলেন। জলভ্রমে কৃত্রিম সরোবরে অবগাহন করতে গিয়ে হাস্যাস্পদ হলেন। আবার যথার্থ দীর্ঘিকাকে স্ফটিকনির্মিত কৃত্রিম জলাশয় ভেবে তার ওপর পদচারণা করতে গিয়ে মহার্ঘ্য বস্ত্রাদিসহ জলমগ্ন হলেন। পাণ্ডবরা যে সব সময় উপস্থিত থাকছিলেন তা নয়—কিন্তু আরও বহুলোক চারিদিকে থাকে। এবং স্বতোৎসারিত কৌতুক দমনের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও তাদের অধরকোণে সে কৌতুক উপভোগের হাস্যরেখা ফুটে ওঠে।

ফলে এখানের অত্যুত্তম আহার্যে কষায় স্বাদ পান দুর্যোধন। বিলাসশয্যা কণ্টকশয্যায় পরিণত হয়। এদের ঐশ্বর্য-সম্পদেরও যেন কোন সীমা সংখ্যা পরিমাণ পান না তিনি। সেও এক মহা যন্ত্রণা। নিষ্ফল আক্রোশে চেয়ে চেয়ে দেখেন সহস্র সহস্র স্নাতক গৃহস্থ ও তাঁদের প্রত্যেকের অগণিত দাসদাসী পালন করছেন পাণ্ডবরা। তাঁদের প্রাসাদে প্রত্যহ দশ সহস্র লোক স্বর্ণপাত্রে উত্তম খাদ্য আহার করে। সমাগত বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ যে সকল উপহার এনেছিলেন—তা দুর্যোধনই গ্রহণ করেছেন। এত সম্পদ, এত বিচিত্র বস্তু যে আছে, এত রকম দেশ ও জাতি আছে—যারা যুধিষ্ঠিরের প্রাধান্য স্বীকার করছে—তা দুর্যোধনের জ্ঞান নয়, কল্পনারও বাইরে। যে সব উৎকৃষ্ট রত্নখচিত স্বর্ণ কলস ও অন্যান্য দ্রব্যাদি একমাত্র যাদবদের কাছ থেকেই উপহার পেয়েছেন যুধিষ্ঠির তার মূল্যের সমান সম্পদ বোধ করি জরাসন্ধের ভাণ্ডারেও ছিল না। তিনি রাজন্যবর্গের বিদায়কালে যে সব প্রত্যুপহার দান করেছেন তাও অপরিমিত,

অগণিত। যজ্ঞকালে শেষ পর্যন্ত যে সব ধনরত্ন করস্বরূপ বা উপহারস্বরূপ এসেছিল, স্থানাভাবেই তা গ্রহণ করতে পারেন নি যুধিষ্ঠির। নগরপ্রাকারের বাইরে স্তূপাকারে পড়ে ছিল। মনে হয় বর্তমানকালে যুধিষ্ঠিরের যা সম্পদ তা বরুণ ইন্দ্র বা কুবেরের ভাণ্ডারেও নেই।

পাণ্ডবদের এই সৌভাগ্য নিয়ে যতই চিন্তা বা হিসাব করেন ততই অন্তরে মাৎসর্যাগ্নি প্রজ্বলিত হয়। তাতে ইন্ধন যোগাবারও লোকের অভাব নেই। মাতুল সৌবল ও অন্যান্য পার্শ্বচররা এটাকে পাণ্ডবদের সুপরিকল্পিত অবমাননার আয়োজন বলে মনে করেন—মনে করিয়ে দেন। ফলে এই সভাগৃহ নির্মাণটার একমাত্র কারণ তাঁদেরই হেয় করা—এই বোধ জন্মাল কৌরবদের মনে। এইভাবে কোনমতে পক্ষকাল অতিবাহিত ক'রে যখন তাঁরা হস্তিনার উদ্দেশে যাত্রা করলেন তখন বোধ করি মৌখিক সৌজন্যসম্মত আনন্দ ও তৃপ্তি প্রকাশের শক্তিও আর তাঁদের অবশিষ্ট রইল না। এই সুখবাস যে তাঁদের কাছে নরকযন্ত্রণাতুল্য হয়েছে তার স্পষ্ট পরিচয়ই কথাবার্তা ও মুখভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়তে লাগল।

তবু—মুখভাব ও আচরণকে ওখানে যতটুকু সংযমের বাঁধ দিয়ে রাখা গিয়েছিল, স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হয়ে আর সেটুকুও রাখা যায় না। দুর্যোধন একেবারেই ভেঙে পড়েন। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কারও সঙ্গে রহস্যালাপ বা বিশ্রম্ভালাপ তো দূরের কথা—বাক্যালাপ পর্যন্ত করেন না। আহার-নিদ্রা একেবারে ত্যাগ না করলেও যেটুকু অবশিষ্ট থাকে তা কোন সুস্থ মানুষের জীবন ধারণের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। ফলে দিন দিন কৃশ ও বিশুষ্ক হতে থাকেন দুর্যোধন। অন্যান্য রাজকুমারদের এতটা না হলেও ওখানের অপ্রমাণিত কল্পিত অপমানের লজ্জায় তাঁরা যেন এখানের প্রজা-পরিজন, এমন কি সেবকদের কাছেও মাথা তুলতে পারেন না। নিজেদের যা শক্তিসম্পদ আছে তাও যেন হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন মনে হয়। সেজন্য মৃগয়া ক্রীড়াদি সকল প্রকার ব্যসন ত্যাগ ক'রে অশৌচ পালনের মতো অধিকাংশ সময় গৃহকোণেই অতিবাহিত করেন।

ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ হলেও—অথবা অন্ধ বলেই—রাজা ও রাজপুরী, বিশেষ পুত্র-কন্যাদের সংবাদ সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। সংবাদ সংগ্রহের জন্য এবং ক্ষণে ক্ষণে তাঁকে সে সংবাদ শোনানোর জন্য বহুসংখ্যক কর্মচারী নিযুক্ত ছিল। এর মধ্যে আবার পুত্রদের সম্বন্ধে স্নেহ ও সজাগ সচেতনতা—দুর্বলতা বলাই উচিত—সর্বজনবিদিত। দুর্যোধনের এই ভাবান্তর ও স্বাস্থ্যভঙ্গের সংবাদ সহজ নিয়মেই ক্রমশঃ ওঁর কাছে পৌঁছয়। পুত্ররা সকলেই প্রিয় কিন্তু দুর্যোধন

প্রিয়তম। তার এই দুর্দশার সংবাদে উনি নিরতিশয় উদ্বিগ্ন ও অস্থির হয়ে ওঠেন।

দুর্যোধনকে ডেকে পাঠিয়েও যখন কোন সুফল লাভ হয় না—তখন তিনি নিজেই শিবিকাবাহিত হয়ে পুত্রের বাসভবনে উপস্থিত হন। এবং ব্যাকুল কণ্ঠে ওঁর এই বিষাদ ও জীবন—বিশেষ আনন্দ উপকরণে এতাদৃশ অনীহা ও অরুচির কারণ সম্বন্ধে বার বার প্রশ্ন করতে থাকেন।

'বৎস দুর্যোধন, শুনলাম তুমি দিন দিন বিশুষ্ক শীর্ণ মলিন ও পাণ্ডুবর্ণ হয়ে যাচ্ছ। আহারাদি আমোদ-আহ্লাদে স্পৃহা নেই, স্বজন বা বয়স্যদের সঙ্গেও দেখা-সাক্ষাৎ বা রসালাপ কর না, রমণীদের সেবা নাও না। এত কাতর হয়ে পড়লে কেন? যদি দৈহিক অস্বাস্থ্যই এর কারণ হয়, হস্তিনাপুরে তো প্রাজ্ঞ অভিজ্ঞ বৈদ্যের অভাব নেই। আমি তো অনেক চিন্তা ক'রেও তোমার এই অমর্ষতার কারণ দেখতে পাচ্ছি না। এ রাজপুরীর বিপুল ঐশ্বর্য সবই তো তোমার যথেচ্ছ উপভোগ্য এবং তোমাতে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তোমার ভ্রাতৃগণ বা সুহৃদগণ তোমার অপ্রিয়াচরণ করার কথা চিন্তামাত্র করেন না। তোমার পেটিকায় উত্তম উত্তম মহার্ঘ্য বস্ত্রাদি রয়েছে। প্রত্যহ সমাংস অন্ন আহার করছ। উৎকৃষ্ট অশ্ব ও সুনির্মিত রথের অভাব নেই। ক্রীড়াদি বা মৃগয়ার সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত। মহামূল্যবান আরামদায়ক শয্যা, মনোরমা ভার্যা ও চিত্ত-হারিণী সুন্দরী রমণীগণ, সুসজ্জিত গৃহনিবহ—তোমার ইচ্ছাধীন ও আজ্ঞাবহের মতো প্রতীক্ষা করছে। এ ছাড়াও যদি তোমার কোন ভোগাভিলাষ থাকে তো ব্যক্ত করো, আমি এখনই তার ব্যবস্থা করছি!'

দুর্যোধন এবারে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন যেন। বললেন, 'আপনি এইসব ভোগ্য বস্তুর গর্ব করেন? আরও দেবেন? কী দেবেন আপনি, কী দিতে পারেন? ঐশ্বর্য সম্বন্ধে আপনার কোন ধারণাই নেই। ভাগ্যদোষে—অথবা দোষেই বলছি কেন, ভাগ্য-অনুগ্রহই বলব, এই সব দেখে আমার মতো তীক্ষ্ণ বিষের জ্বালা ভোগ করতে হচ্ছে না—আপনি অন্ধ। পাণ্ডবদের সভায় উপস্থিত ছিলেন কিন্তু তাদের বিত্ত বা প্রভাব-প্রতিপত্তির পরিমাণ সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন নি। আপনার সংবাদ-সরবরাহকারকদের পক্ষেও সম্ভব হয় নি সেই জনবহুলতার মধ্যে যথার্থ বিবরণ দেওয়ার। পাণ্ডবদের অমরাপুরী-দুর্লভ শ্রী ও অসুরদুর্লভ শক্তিই আমার দুঃখের কারণ। জ্ঞাতিদের এই ধরনের বিপুল অভ্যুত্থান ও ক্রমবর্ধমান অপরিমেয় সমৃদ্ধি দেখার পরও যারা নিশ্চল নিষ্ক্রিয় উদাসীনবৎ বসে থাকে, তারা হয় মৃত নয় নপুংসক।'

বলতে বলতে অতৃপ্ত রোষ ও আত্মধিক্কারে দুর্যোধনের চোখে জল এসে গিয়েছিল।

ক্ষণকাল নীরব থেকে সে ক্ষোভাশ্রু করপৃষ্ঠতলে মোচন ক'রে বললেন, 'আপনি জানেন যুধিষ্ঠির বহু সহস্র গৃহমেধী স্নাতককে ভরণপোষণ করেন, তাদের প্রত্যেকের সেবার জন্য ত্রিশটি ক'রে সুন্দরী দাসী নিয়োগ করেছেন? দশ সহস্র ব্রাহ্মণ প্রত্যহ তাঁর গৃহে স্বর্ণপাত্রে ভোজন করেন? আপনার সমস্ত সৈনিক ও সেবকের সংখ্যা যোগ করলে যা হয় তার থেকে অনেক বেশী সংখ্যক শুধু অশ্বযোষিৎ উষ্ট্রযোষিৎই আছে পাণ্ডবদের। এই যজ্ঞে আমার উপরই উপহার গ্রহণের ভার ছিল। যে সব দ্রব্যাদি এসেছে তার অনেকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় মাত্র নেই, কোন গ্রন্থেও সে সব অমূল্য দ্রব্যাদির বিবরণ পাই নি। উপহারের মহার্ঘ্যতা ও বিপুলতা আপনার কল্পনার অতীত। হিসাব রক্ষা আমার পক্ষেও অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত আমিও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। রাজভাণ্ডার কেন, রাজধানীর মধ্যেও সেগুলি রক্ষা করার মতো কোন স্থান অবশিষ্ট ছিল না। আমাদের রাজ্যখণ্ডের মতো বেশ কয়েকটি দেশের তাবৎ সম্পত্তির যা মূল্য তার থেকে অনেক বেশী মূল্যের আশ্চর্য আশ্চর্য উপহার-দ্রব্য নগরপ্রাকারের বাইরে প্রান্তরে স্তূপাকার হয়ে পড়ে থেকে নষ্ট হয়ে গেল। সেখানে এমন কেউ দরিদ্র ব্যক্তি নেই যে তার কোনটি গ্রহণ করে।···মহারাজ, এই কল্পকথাসুলভ শ্রীবৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করার পর আমার আর জীবনধারণে বিন্দুমাত্র স্পৃহা নেই। কোন সত্ত্ববান পুরুষ শত্রুর এতাদৃশী শক্তিসম্পদ দেখেও স্থির থাকতে পারে! আমার মনে হচ্ছে আমি না স্ত্রী, না অস্ত্রী, না ক্লীব—কিছুই নই। পুরুষ হলে কেউ শত্রুর এই অপরিমাণ সৌভাগ্যসন্দর্শনে অবিচল থাকতে পারে না। স্ত্রীলোক সপত্নীর ঋদ্ধি-প্রতিপত্তি সহ্য ক'রে না। এখন মনে হচ্ছে আমার মৃত্যুই শ্রেয়, হয় অগ্নিতে বা জলে প্রবেশ ক'রে—নয়তো বিষ ভক্ষণ ক'রে আমি মৃত্যুবরণ করব—এ আপনি নিশ্চিত জানবেন।'

ধৃতরাষ্ট্র পুত্রস্নেহে বিহ্বল ও বর্তমানে তার মনক্লেশের বিবরণ শুনে দুঃখিত হলেও একেবারে বিবেকশূন্য ছিলেন না। তিনি অপ্রসন্ন কণ্ঠে বললেন, 'এ তোমার কেমন কথা। তারা নিজেদের ভুজবলে ঐশ্বর্য আহরণ করেছে, তোমার ক্ষমতা থাকে তুমিও কর। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। পৃথিবীর বিত্ত তো শেষ হয় নি, সমস্ত দেশ ধ্বংস বা সকল প্রজাও বিনষ্ট হয় নি। অপরের শ্রীতে ঈর্ষিত হয়ে মৃত্যুবরণ করার মতো কাপুরুষতা আর কী হতে পারে!'

দুর্যোধনও তিক্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'আপনি বিলক্ষণ জানেন যে আমার

একার পক্ষে এ ধরনের অভিযান সম্ভব নয়। আমা সে সহায় সম্বল কোথায়? অধিকাংশ ক্ষত্রিয় রাজাই এখন ওদের বশীভূত, আজ্ঞাবহ। ওরা পাঁচ ভাইই রণকুশলী, সুদক্ষ সেনানায়ক। আমাদের পক্ষে তো সেনাপতি বলতে ঐ জরদ্গব দুই বৃদ্ধ—ভীষ্ম ও দ্রোণ। তারাও পাণ্ডবদের কল্যাণের জন্যই বেশী ব্যস্ত। তাদের ভরসায় দিগ্বিজয় যাত্রা সম্ভব নয়। না, আমার কেউ কোথাও নেই তা বেশ বুঝেছি। পিতাই যার দুঃখ বোঝেন না তার চেয়ে হতভাগ্য আর কে আছে!'

প্রিয়তম পুত্রের অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠ তীক্ষ্ণ-অস্ত্রের মতোই ধৃতরাষ্ট্রের বুকে বিঁধল, তিনি বিষম বিচলিত হয়ে উঠলেন, তবু একটা ক্ষীণ সৎ প্রচেষ্টা হিসেবে কতকটা দুর্বল ভাবেই বললেন, 'বৎস, যুধিষ্ঠির তোমার সম্বন্ধে দ্বেষ পোষণ করেন না। তার অর্থবল মিত্রবল রাজ্যপ্রাপ্তির সময়ে যা ছিল তা তোমার থেকে বেশী নয় —বরং অনেক কম। সে সেই সামান্য সম্বল অবলম্বনে যদি আজ এই অভূতপূর্ব রাজশ্রী অর্জন করে থাকে—তুমি পারবে না কেন? তোমার আর পাণ্ডবদের একই পিতামহ—এ কোন দূরসম্পর্ক কিছু নয়। ভ্রাতারা যদি মিত্রতাপাশে বদ্ধ থাকে তবে সমৃদ্ধি ও শক্তি তাদের আশ্রয় করে। ভ্রাতাদের নাশ করতে চাও কেন? তুমি প্রীতিভরে তাঁদের কাছে কোন প্রার্থনা জানালে তাঁরা অবশ্যই তা পূরণ করবেন। তুমি যদি অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে চাও অনায়াসে করতে পার। ভার্গবজিৎ মহাত্মা ভীষ্ম, মহাধনুর্ধর দ্রোণ, ব্রহ্মাস্ত্রাভিজ্ঞ মহাবীর অশ্বত্থামা, অঙ্গরাজ মহাবলী কর্ণ, গুরু কৃপাচার্য, সুবলতনয়গণ, রাজা সোমদত্ত—এঁরা কেউই নগণ্য নন। এঁরা তোমার সহায় হ'লে অচিরে বসুন্ধরা তোমার পদানত হবে।'

শকুনি ইন্দ্রপ্রস্থ থেকেই ভাগিনেয়কে উত্তেজিত করছিলেন, এখানে এসেও জ্ঞাতিবিদ্বেষবহ্নিতে ইন্ধন ক্ষেপণে কিছুমাত্র আলস্য করেন নি। তিনি এখন বললেন, 'মহারাজ, আমার নাম উল্লেখ করলেন, আমাদেরও রথী বলে স্বীকার করলেন, সেই সাহসেই একটা কথা বলছি, বৃথা সন্তাপও যেমন অর্থহীন তেমনি নিজেদের শক্তি সহায় সম্বন্ধে অবাস্তব স্ফীত ধারণাও নৃপতিদের পক্ষে ক্ষতিকর। পাণ্ডবরা ও পাঞ্চালগণ একত্র হলে—বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ যদি সহায় থাকেন তো যাদব বীররাও অবশ্যই ওঁদের পক্ষে যোগ দেবেন—দেবতারাও এঁদের যুদ্ধে পরাভূত করতে পারবেন না। কল্যাণীয় দুর্যোধন, আমি যা বলছি শোন, আমি ওখানে থাকতেই একটা বিষয় লক্ষ্য করে এসেছি—অক্ষক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরের মাত্রাধিক আসক্তি। কিন্তু যতটা ওঁর সাধ ততটা নিপুণতা নেই। এ ক্রীড়ার কূটকৌশল, অক্ষ ক্ষেপণের হিসাব কিছুই জানেন না। ব্যসনই হচ্ছে

মানুষের দুর্বলতা, সেই ছিদ্রপথে মহা মহা বুদ্ধিমান ব্যক্তিরও সর্বনাশ প্রবিষ্ট হয়েছে। তুমি এক কাজ কর। অক্ষক্রীড়ার জন্য ওঁদের সাদর আমন্ত্রণ পাঠাও। ইতিমধ্যে আমি যেমন বলি তেমনি একটি সভাগৃহ নির্মাণ কর। না না, ওদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে বলছি না, ঐশ্বর্য দেখাবার প্রয়োজন নেই। তার আয়তন ও আড়ম্বর আমাদের সাধ্যসীমার মধ্যে রাখলেই হবে। আমি এক বিশেষ উদ্দেশ্যেই এই নবভবন নির্মাণের কথা বলেছি। যাতে যুধিষ্ঠিরের মুখের উপর আলো এসে পড়ে, তিনি অক্ষপট ভাল ক'রে দেখতে না পান—এই ভাবে তার দ্বারগবাক্ষাদি বসাতে হবে। আমি অক্ষচালনা কৌশলেই ওদের যথাসর্বস্ব—ঐ কুবেরকল্পনাতীত ঐশ্বর্য জয় ক'রে পাণ্ডবরাজলক্ষ্মীকে তোমার গৃহে বন্দিনী ক'রে দেব।'

দুর্যোধন লোভে ও প্রতিশোধস্পৃহা পরিতৃপ্তির আশায় নিদারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন, 'মহারাজ, মাতুলের কথা তো শুনলেন, এখন অনুমতি করুন, সেই ব্যবস্থাই করি।'

অকস্মাৎ ধৃতরাষ্ট্রের বাম অঙ্গ স্পন্দিত হয়ে উঠল, গবাক্ষপথের সম্মুখ দিয়ে এক বায়স কর্কশ কণ্ঠে ডেকে চলে গেল। আরও অনেক দুর্লক্ষণ অনুভব করলেন তিনি। অমঙ্গলাশঙ্কায় বিবর্ণ হয়ে অসহায় কণ্ঠে বললেন, 'তাই তো! শকুনি, তুমি কোথায় ওকে প্রতিনিবৃত্ত করবে, না উত্তেজিত করছ! এ ভ্রাতৃসংঘর্ষের ফল কদাচ শুভ হবে না। আমার মনে হচ্ছে তুমি ইচ্ছাপূর্বক এদের সর্বনাশের পথে ঠেলে দিচ্ছ। পুত্র, তুমি এখনও নিজেকে সংযত ও শান্ত কর। তুমি তো জ্যেষ্ঠ হিসাবে কুরুবংশের রাজসিংহাসন লাভ করেছ। ভারতখণ্ডের অগ্রগণ্য নৃপতি-রূপেই সকলে তোমাকে সমীহ করেন। পাণ্ডবরা সহায় থাকলে পৃথিবীর কোন ব্যক্তি তোমার কোন অমঙ্গল করতে পারবে না। তুমি নিঃসংশয়ে নিশ্চিন্তে রাজসুখ ভোগ কর—বৃথা কেন এ লোকক্ষয় স্বজনক্ষয়ের পথে যেতে চাইছ?'

দুর্যোধন ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, 'মাতুল, এক আপনি ব্যতীত এ পুরীতে আমার দ্বিতীয় কোন আত্মজন নেই। আপনিই দয়া ক'রে আমাকে কোন তীব্র হলাহল এনে দিন, যাতে বিনা যন্ত্রণায় নিমেষকাল মধ্যে প্রাণত্যাগ করতে পারি।'

ধৃতরাষ্ট্র উন্মত্তের মতো স্খলিতপদে পুত্রের কাছে আসার চেষ্টা করতে করতে বললেন, 'বৎস, ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও। আর কিছুকাল ধৈর্য ধর।···তুমি জান ধর্মাত্মা প্রাজ্ঞ বিদুরের সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে আমি কোন কর্মে প্রবৃত্ত হই না।

তাঁকে সংবাদ দাও, তিনি আসুন। তিনি কি বলেন আগে শুনি, তারপর মন স্থির করব—'

দুর্যোধন বিরক্তি ও অবজ্ঞাভরে বললেন, 'ক্ষত্তা বিদুর রাজা বা ক্ষত্রিয়দের মনোবেদনা কি বুঝবেন? তিনি স্বভাবভীরু ও পাণ্ডবদের সম্বন্ধে স্নেহান্ধ। তিনি আপনার অন্নে প্রতিপালিত হয়ে তাদের কল্যাণ চিন্তা করেন। তাতেও দোষ ছিল না, আমি লক্ষ্য করেছি, চিরদিনই দেখেছি—তিনি আপনার কাছে আমার বুদ্ধি ও প্রবৃত্তিকে হেয় প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। তাঁর কাছে এ প্রস্তাব উত্থাপন করলে তিনি ভালমন্দ না বুঝেই বাধা দেবার চেষ্টা করবেন. যেহেতু প্রস্তাব ও ইচ্ছা—আমার।...আমি আপনাকে শেষবারের মতো এই স্পষ্ট বলে দিচ্ছি—এই নিদারুণ মর্মদাহ, এই সন্তাপের উপশম ব্যবস্থা না হলে আমি প্রাণত্যাগ করবই। যুদ্ধ নয়, কলহ নয়—তাদের ক্রীড়ায় আহ্বান করছি, এতেও যদি বাধা দেন তাহলে আপনি নিরানব্বুই পুত্র নিয়েই সুখে বাস করুন, জ্যেষ্ঠ পুত্র আর কখনও আপনার বিরক্তিভাজন হবে না।'

প্রায় অশ্রুরুদ্ধ ভগ্ন কণ্ঠে অসহায় অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র বলে উঠলেন, 'তবু, তবু বিদুরকে যে বলা দরকার একবার। সে কী বলে···বিদুর, বিদুর কোথায়? সে ছাড়া ধর্মবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি কেউ যে আমার পাশে নেই। ওরে, কে এখানে আছিস, দ্বারসেবক,—কেউ বিদুরকে গিয়ে এখনই একবার সংবাদ দে না। বল্ আমি তাঁকে স্মরণ করেছি। বিশেষ প্রয়োজন তাঁকে। বিশেষ প্রয়োজন। এখনই আসতে বল্।'

তারপর, শূন্যে অবলম্বন সন্ধানের মতোই দুই বাহু সম্মুখে প্রসারিত ক'রে কম্পিত দুর্বল পদে সর্বতো-অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র এসে একসময় আবার শিবিকায় উঠলেন, জ্ঞানশূন্য, স্থানকাল-বিস্মৃতের মতো আর্ত উচ্চরবে 'বিদুর! বিদুর!' এই আহ্বান করতে করতে।

বলিষ্ঠ প্রৌঢ়ের সে উচ্চস্বর প্রাসাদপুরীর পাষাণপ্রাচীর ও বলভিতে অলিন্দে প্রতিধ্বনিত হয়ে কোন এক বিচিত্র নিয়মে বহুক্ষণ অবধি শেষ দুটি অক্ষর ফিরিয়ে দিতে লাগল—'দূর! দূর!'

সে প্রতিধ্বনি যাঁদের কর্ণগোচর হ'ল তাঁরা যেন অকারণেই শিউরে উঠলেন। কেবল মদ্য জয়মত্ত দুর্যোধনের কানেই তা কোন দুর্লক্ষণ রূপে প্রতিভাত হ'ল না।

॥ ২২ ॥

আনুষ্ঠানিক যজ্ঞ সম্পূর্ণ হওয়ার পরও ইন্দ্রপ্রস্থ বেশ কিছুদিন—সহজ নিয়মেই—জনসমাকীর্ণ ও কোলাহলমুখর ছিল, কর্মব্যস্ততারও অন্ত ছিল না। যেখানে কয়েক লক্ষ অতিথি আর অভ্যাগতের সমাগম হয়েছে, সহস্র যোজনব্যাপী অস্থায়ী জনপদ গড়ে উঠেছে, সেস্থানে কিছু একদিনেই সকল দায়িত্ব ও কর্মের অবসান ঘটে না। অতগুলি লোকের প্রত্যাবর্তন-পর্বই তো এক বিরাট ব্যাপার। অতগুলি যানবাহন অশ্ব-অশ্বতরাদির জন্য পথ পাওয়া, পথে পথে তাদের খাদ্য পানীয়ের ব্যবস্থা করা—আপাত-দৃষ্টিতে দুঃসাধ্য বলেই মনে হয়। সুদ্ধমাত্র পাণ্ডবদের শৃঙ্খলাবদ্ধ মন ও পূর্বচিন্তিত সুনির্দেশের জন্যই তা কোন শোচনীয় পরিণামে পর্যবসিত হতে পারে নি।

সুতরাং যজ্ঞের বৈদিক কার্যাদি এক্ষেত্রে বাহ্য ও সামান্য তথ্য মাত্র। যজ্ঞে আহূত দেবতারা স্বর্গে থাকেন, তাঁদের কোন পার্থিব বস্তুতে প্রয়োজন নেই, অভিমান কিছু থাকলেও সামান্য। এই বিপুল সংখ্যক ঈর্ষা-দ্বেষ-অভিমানে পূর্ণ নর-দেবতাদের তুষ্ট ক'রে মিষ্ট বাক্যে বিদায় দেওয়াকেই আসল যজ্ঞ বলা চলে। খাদ্য, পানীয়, সেবক, যানবাহন ইত্যাদি—অতিথিদের স্ব স্ব রাজ্যে প্রত্যাবর্তনের সুব্যবস্থা, কে কোন্ পথ দিয়ে কার পূর্বে বা পরে যাবেন, কার সত্বর যাওয়া প্রয়োজন—সমস্ত তথ্যাদি সংগ্রহ ক'রে কারও অহঙ্কারে আঘাত না লাগে—সে বিষয়ে সতর্ক হয়ে সুষ্ঠু কর্ম-পরিচালনা মানব-সাধ্যাতীত কাজ। বিদায়-পর্ব অভ্যর্থনা-পর্বাপেক্ষা কঠিনতর, দুর্বহ দায়িত্ব। কারণ এই প্রায় দুই মাস কালের অতন্দ্র অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের ক্লান্তি সকল কর্মীরই প্রভূত শক্তি হরণ করেছে। শুধুই দেহগুলোই অবসন্ন নয়—সে দেহকে যে চালিত করবে সে মন বা চিন্তাশক্তিও ক্লান্ত, উত্ত্যক্ত।

এই কারণেই এঁদের পরামর্শ উপদেশ দিতে বাসুদেব এখানে কিছু কালহরণ করবেন সেটা স্বাভাবিক। তাঁর উপস্থিতিটা আবশ্যিক ও ইন্দ্রপ্রস্থ-রাজসভা শাসন ব্যবস্থার অঙ্গ বলেই ধরে নিয়েছিল সকলে। বস্তুত যজ্ঞ সমাপ্তি ঘোষণার দিন থেকে মাসাধিককাল গত হওয়ার পরও যখন বাসুদেব দ্বারকা প্রত্যাবর্তনের প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন তখনও যেন মনে হয়েছিল পাণ্ডবদের শিরে আকাশ-পতন ঘটল। তাঁরা ব্যাকুল হয়েই আর কয়েকদিন অবস্থিতির অনুরোধ, অনুনয় জানিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণও সে আকুলতা ও মিনতি উপেক্ষা করতে

পারেন নি। তবুও শেষ পর্যন্ত যেদিন ওঁকে বিদায় নিতেই হ'ল সেদিন সাশ্রুলোচনেই প্রীতি নমস্কার ও আলিঙ্গনাদি নিবেদন করেছিলেন তাঁরা—এবং সামান্যা বৃদ্ধা নারীর মতো নগরীর প্রাকারসীমা পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের গরুড়ধ্বজ রথের অনুগমন করেছিলেন।

তবু, এ সবই স্বাভাবিক। এর মধ্যে বিস্ময়কর বা অশোভন কিছু দেখতে পান নি কেউ। শ্রীকৃষ্ণই এ যজ্ঞের প্রাণ-স্বরূপ, তিনি সমস্ত কাজ সুসম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এঁদের পাশে থাকবেন, এটাই আশা করবে সবাই। ইতিমধ্যে অন্য এক বিরাট নাটক কোথাও অভিনীত হচ্ছে, কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে তা কেউ সন্দেহমাত্র করে নি। শ্রীকৃষ্ণের অত সাধের রাজধানী দ্বারাবতী শত্রু দ্বারা উৎসাদিত, পুরনারীরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত এবং আত্মীয়স্বজন, বিশেষ তাঁর প্রিয় পুত্ররা পর্যন্ত নির্জিত ও আহত হচ্ছে—একথা যে কারও কল্পনামাত্র করাও সম্ভব নয়।

জানতেও সারে নি কেউ, যাদবরা পর্যন্ত না।

কারণ পর পর যে চারজন দূত এই বার্তা নিয়েই এসেছিল—সে সংবাদও তো কেউ পায় নি।

পায় নি তার কারণ—তাঁর ইন্দ্রপ্রস্থ আগমনের পর থেকে প্রতি সপ্তাহেই নিয়মিত দ্বারকার দূত আসত ওখানকার বার্তা নিয়ে। এই ব্যবস্থাই ক'রে এসেছিলেন বাসুদেব। বিশেষ কোন আশঙ্কা ক'রে নয়—নিতান্তই নিয়মমতো। রাজাদের সকলেরই এইভাবে দূত আসত—মানে প্রত্যক্ষভাবে রাজ্যশাসন করেন, নামমাত্র রাজা নন—তাঁদের সকলের পক্ষেই এটা প্রয়োজন ছিল। এক পক্ষের প্রেরিত সংবাদ বা উত্তরের জন্য অপেক্ষা করা বিপজ্জনক ; এমনিই তো—দিবারাত্র পথ চললেও—অশ্ব বা রথ যেখানে সবচেয়ে দ্রুতগামী যানবাহন, দূর দেশ থেকে বার্তাবাহকের পৌঁছতেই বহু কাল অতিবাহিত হ'ত—ততদিনে নানা প্রকারের বিপদ-বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে। কিরাত, ম্লেচ্ছ ও অনার্য জাতিরা অনেকে পর্বত শৃঙ্গে শৃঙ্গে আলোকসংকেতের আয়োজন ক'রে অনেক দ্রুত সংবাদ পাঠায়—কিন্তু তারও গতি সীমাবদ্ধ, এমন বহু পথ আছে যেখানে কোন পাহাড়-পর্বত নেই। তাই দুদিক থেকেই নিয়মিত বার্তাবাহক প্রেরিত হ'তে থাকত, প্রয়োজন বুঝে দুই-তিন দিবসের ব্যবধানে, শান্তি অব্যাহত থাকলে সপ্তাহ বা পক্ষকাল পর পরও। তাও অশ্বই বিশ্রাম পেত, অশ্বারোহী বা রথীরা নয়। বিশ্রাম অনিবার্য হয়ে পড়লে সাংকেতিক ভাষায় লিখিত পত্র অন্য লোককে দেওয়া হ'ত—সংবাদের গতি অব্যাহত থাকত।

লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে মাত্র দুই-একদিন বিশ্রাম ক'রেই পুনশ্চ অপর প্রান্তের জন্য সন্দেশ নিয়ে যাত্রা করতে হ'ত বাহকদের। এইভাবে চক্রাকারে চলত সমস্যা ও সমাধানের আদান-প্রদান ; শাসনকর্তার নির্দেশ বা মন্ত্রণা, অস্থায়ী শাসকদের বক্তব্য নিবেদনের পালা।

কিন্তু গত চার-পাঁচ সপ্তাহকাল যাদব শিবিরে এর ব্যতিক্রম ঘটেছে। তবে তাও, কারও জানা কি লক্ষ্য করার উপায় ছিল না। যেখানে উত্তাল জনসমুদ্র নিত্য-তরঙ্গিত, যেখানে অতিথি, অভ্যাগত সেবক কিঙ্কর পশু সব মিলে ঘনসন্নিবিষ্ট তৃণভূমির মতো নিশ্ছিদ্র অবস্থা—সেখানে সকলে সকলের গতিবিধির সংবাদ রাখবে এমন আশা করাও বাতুলতা।

দ্বারাবতীর দূত বাসুদেবের কাছেই সংবাদ পৌছাত, প্রেরক বসুদেব। বাসুদেবের আদেশ-নির্দেশ মতোই তাদের বাসস্থানাদি ও বিশ্রামের ব্যবস্থা হ'ত। পুনর্যাত্রার দিন তাঁর কাছ থেকেই পত্র নিয়ে তারা যাত্রা করত। সে সব পত্রে কি থাকে বা থাকছে তা কেউই কোন দিন জানতে চান নি, এমন কি অগ্রজ বলদেব বা সাত্যকি পর্যন্ত সে বিষয়ে কৌতূহল প্রকাশ করেন নি। বিশেষ যে কোন সংবাদ থাকতে পারে বা বিপদ-আপদ ঘটতে পারে—এমন মনে হয় নি কারও। কারণ এ তো নিতান্তই গতানুগতিক, নিত্যনৈমিত্তিক। বিশেষ জ্ঞাতব্য কিছু থাকলে তা বাসুদেবই অবশ্য জানাবেন।

গত চার-পাঁচ সপ্তাহেও দ্বারাবতীর বার্তা নিয়মিত ভাবেই পৌচেছে কিন্তু তার উত্তর সেখানে ফিরে যায় নি। কেন ফেরে নি তার কারণ কেউ জানে না, ফেরে নি যে, তাও না। বহু পরে জানা গেছে, ইন্দ্রপ্রস্থের সীমা অতিক্রম ক'রে আরণ্য অঞ্চলে পড়ামাত্র দস্যুদের হাতে প্রহৃত ও বন্দী হয়েছিল তারা। তারপর তারা কোথায় গেছে, পরিণতি কী ঘটেছে, জীবিত আছে বা নিহত হয়েছে—সে সংবাদ কেউ বলতে পারে নি। কীলক ও তার নিষাদের দল প্রত্যহ রাজধানীতে পর্বতপ্রমাণ মাংস সরবরাহ করতে এসেছে, হয়ত এক-আধদিন কোন দুর্লভ অবসরে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রেও গেছে—তবে তার সঙ্গে পঞ্চনদবাসী দস্যুদের কোন সংযোগ আছে, এমন সন্দেহ করবে কে ?

যে বিরাট বিপর্যয় ঘটে গেছে তার পূর্ণ বিবরণ পেলেন বাসুদেব একেবারে দ্বারকার উপান্তে পৌছে।

যজ্ঞারম্ভের দিন শিশুপাল নিহত হ'লে ক্রুদ্ধ ও প্রতিশোধ কামনায় অধীর শাল্ব যে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সকলের অজ্ঞাতসারে যজ্ঞ-নগরী ত্যাগ করেছেন

তা কেউই অত লক্ষ্য করেন নি। দু-একজন রাজকর্মচারী সে সংবাদ অবগত থাকলেও প্রধান কর্তাদের জানানো আবশ্যক বোধ করেন নি। যাঁরা লক্ষ্য করেছেন তাঁরাও তা নিয়ে চিন্তা করা বা শাল্বর গতিবিধির সংবাদ সংগ্রহ করা যে প্রয়োজন হ'তে পারে তাও মনে করেন নি। শাল্বও তা জানতেন—তিনি সেই সুযোগই গ্রহণ করেছেন। বাসুদেব ও অদ্ভুতকর্মা যাদববীরগণ এখনও বেশ কিছুকাল যজ্ঞনগরে ব্যস্ত ও আনন্দমত্ত থাকবেন—সে বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হয়ে তিনি সসৈন্যে দ্বারকা আক্রমণ ও উৎসাদন করেছেন। কিছু রক্ষীসৈন্য অবশ্যই ছিল। দু-চারজন উল্লেখযোগ্য যোদ্ধাও। কিন্তু সেই স্বল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে শাল্বকে বাধা দিতে পারেন এমন অভিজ্ঞ যুদ্ধ-পরিচালক তেমন কেউ ছিল না। এই অভাবিত অকারণ আকস্মিক আক্রমণের আশঙ্কাও করেন নি কেউ, তাই প্রস্তুতও ছিলেন না। শাল্ব নিজে সৌভ নামক যানে আসীন হয়ে যুদ্ধ করতেন, তাঁর জলে-স্থলে-গগনপথে সমান গতি ছিল।* তাঁর সঙ্গে পদাতিক তো নয়ই, রথারূঢ়দেরও যুদ্ধ করা কঠিন। শ্রীকৃষ্ণপুত্র কিশোর প্রদ্যুম্ন দুর্ধর্ষ বীর। তিনি প্রাণপণেই বাধা দিয়েছিলেন, কিন্তু গুরুতর আহত হয়ে পড়ায় শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ পরিচালনা সম্ভব হয় নি তাঁর পক্ষেও। ফলে এক সময় অসহায়, অরক্ষিত, দ্বারাবতী ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চল শাল্বর ভয়ঙ্কর নারকীয় প্রতিশোধ-বাসনার কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। তাঁর অনুচরদের বীভৎস কার্যকলাপের ফলে স্ত্রীলোক শিশু ও আতুরদের ক্রন্দনধ্বনি বহুদূর পর্যন্ত আকাশ-বাতাসকে কলঙ্কিত ও মসীলিপ্ত করেছে। সেসব অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করাও মহাপাপ।

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় পৌঁছে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দেখে কোন বিলাপ বা পরিতাপ করলেন না। সর্বাগ্রগণ্য কর্তব্য বিবেচনায় প্রথমেই নিহতদের গৃহে গিয়ে আত্মীয়দের সান্ত্বনা দান ও তাঁদের পরিবারের আর্থিক অবস্থাদি সম্বন্ধে সংবাদাদি নিলেন, আহতদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার কাজ কেমন চলছে প্রত্যক্ষভাবে তত্ত্বাবধান করলেন। পুত্র প্রদ্যুম্ন যৎপরোনাস্তি অমর্ষিত, দুঃখিত ও লজ্জিত বোধ করছিলেন—তাকে আশ্বস্ত করলেন। কর্তব্য পালনই ক্ষত্রিয়ের জীবন-ধারণের উদ্দেশ্য, তাতে কোন অবহেলা না করলে সেটাই সিদ্ধি বুঝবে ; ধর্মবোধে যুদ্ধ করা ব্যক্তিগত বিদ্বেষকে প্রাধান্য না দিয়ে, আর্তত্রাণে, দেশবাসীর সেবা ও দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় এগিয়ে যাওয়ার থেকে বড় কর্তব্য আর কী আছে ? যা অসম্ভব তা যদি সম্ভব করতে না পেরে থাকেন কুমার, তো লজ্জা বা ক্ষোভ বোধ

* মহাভারত—বনপর্ব দ্রষ্টব্য।

করার কোন কারণ নেই।...

এ সবই প্রহর দুই কালের কাজ। এই প্রাথমিক দায়িত্ব পালন শেষ হওয়া মাত্র বাসুদেব বৃষ্ণি, অন্ধক ও যাদব প্রধানদের নিয়ে মন্ত্রণাসভায় সমবেত হলেন—স্নানাহারের অবসরটুকুও না নিয়ে। কুলপ্রধানরাও এখানে এসে ধ্বংসকার্য ও প্রাণক্ষয়ের পরিমাণ দেখা পর্যন্ত অপমানে দগ্ধ হচ্ছেন, সে বহ্নির জ্বালায় অধীর ও উন্মত্তবৎ হয়ে উঠেছেন। কাজ তো একটিই, সে সম্বন্ধে আর দ্বিমত কার? এই অনাচার তস্করতা ও বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ এবং ঘৃণ্য অপরাধের শাস্তিদান না করা পর্যন্ত স্বস্তি নেই তাঁদের।

যুদ্ধযাত্রা তো বটেই। কিন্তু সেটা কবে, কখন, কী ভাবে—প্রশ্ন এই।

স্থির হ'ল আয়োজনে একান্ত আবশ্যক যেটুকু বিলম্ব—তাও প্রাণপণ চেষ্টায় এঁরা সেটাকে ত্বরান্বিত করবেন—সেইটুকু মাত্র অপেক্ষা ক'রেই এঁরা শাল্বকে শাস্তিদানে যাত্রা করবেন। সৈনাপত্যের প্রশ্নে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ সবিনয়ে করজোড়ে প্রধান যোদ্ধাদের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। ওঁরা রাজধানী রক্ষা করুন, ওঁদের অনুমতি পেলে তিনিই বাহিনী পরিচালনার ভার নেবেন।

এক প্রধান—উদ্ধব সস্নেহ হাস্যে উত্তর দিলেন, 'আমরাই বরং এতে উপকৃত হলাম বাসুদেব। তবে এত লোক দ্বারাবতী রক্ষায় আর প্রয়োজন হবে না, আমরা তোমার অধীনস্থ যোদ্ধারূপে তোমার অনুগমনই করব। তাতে আমাদের গৌরব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হবে বলে আমি মনে করি না।'

বাকী সকলেই, যেন সমস্বরে, সে প্রস্তাব অনুমোদন করলেন।

সমরায়োজনের চক্র আবর্তিত ক'রে প্রায় মধ্যরাত্রে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন বাসুদেব।

রুক্মিণী সঙ্গেই এসেছিলেন, এখানে পৌঁছে পুত্রের গুরুতর আঘাতের সংবাদ পাওয়া মাত্র রথের গতিমুখ পরিবর্তিত করে প্রদ্যুম্নের গৃহে চলে গেছেন। সুতরাং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উপায়ও নেই, প্রয়োজনও নেই। সামান্য একটুক্ষণ চিন্তা ক'রে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ সত্রাজিৎ-দুহিতার পুরীর পথই ধরলেন।

সত্যভামাও অন্যান্য বিশিষ্ট পুরনারীর সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়েছিলেন। যজ্ঞান্তের এক মাস কাল পরে যখন আর্য বলদেব সহ অধিকাংশ যাদবপ্রধান প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হলেন তখন তাঁকেও পাঠিয়ে দিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। এখানের অন্তঃপুর বিপুল, এক ক্ষুদ্র জগৎ বিশেষ। তার পরিচালনায় এতটুকু শৈথিল্য ঘটলেই নানা বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রাট দেখা দেবে। সেক্ষেত্রে সত্যভামার তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি,

সামগ্রিক কর্তৃত্বশক্তি ও সাংসারিক কার্যে অভিজ্ঞতা একান্ত প্রয়োজন—এই হেতু দেখিয়েই পাঠিয়েছিলেন। ভৃত্য পরিচারিকা ও অপর কর্মচারীদের দিয়ে সম্পূর্ণ কর্তব্য পালন করিয়ে নিতে সত্যভামার তুলনা কোথায় ?

এই অহেতুক কৈতববাক্যে সত্যভামার অধরোষ্ঠে মৃদুমধুর হাস্যরেখাই ফুটেছিল, প্রতিবাদের ভাষা নির্গলিত হয় নি। তার প্রথম কারণ—কথাটা অনেকাংশে সত্য। দ্বিতীয়ত—শ্রীকৃষ্ণের আদেশ অনর্থক নয়, বিনা উদ্দেশ্যে কোন ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হন না তিনি, আর—এতদিনে তিনি তাঁর প্রিয়তম আর্য-পুত্রকে ভালই চিনে নিয়েছিলেন ; ইচ্ছা বা আদেশ অত্যন্ত মিষ্ট ভাষায় অনুরোধ এমন কি অনুনয়ের ভঙ্গীতে জানালেও—তা অপরিবর্তনীয়। তাঁর আপাত-অর্থহীন দুর্বোধ্য কর্মপন্থার পরিবর্তন হয় না কখনও। সে আদেশই, এবং তা মান্য করিয়ে নিতেও তিনি জানেন, করিয়ে নিয়ে তবে ছাড়েন। তা সে কৌশলেই হোক, যুক্তিপ্রয়োগেই হোক বা কোন নির্মম কঠিন পদ্ধতিতেই হোক। তাঁর ইচ্ছায় বাধা দেবার চেষ্টা আর কঠিন শৈলগাত্রে সমুদ্রতরঙ্গের বার বার আছড়ে পড়া—সমান নিষ্ফল। তাতে পাষাণ বিচলিত হয় না, বিগলিত তো হয়ই না।

তবু—স্তম্ভগাত্রে প্রবুদ্ধ প্রায় শতাধিক তৈলবর্তিকার উজ্জ্বল আলোতে—শ্রীকৃষ্ণ ওঁর অনিন্দ্যসুন্দর প্রস্ফুট-কমলাননের দিকে চেয়ে বুঝলেন সেখানেও বিরাট একটা বাক্-বা অভিমান-যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হবে তাঁকে। সোহাগিনী সত্যভামা আজ অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হয়েছেন।

কারণটাও অনুমান করতে অসুবিধা হ'ল না।

তবু তিনি অজ্ঞতা ও সারল্যই শ্রেয় বিবেচনা করলেন এক্ষেত্রে।

রসিকতা ক'রেই বলতে গেলেন, 'পূর্ণিমার প্রস্ফুট জ্যোৎস্নায় আজ নিদাঘ-সূর্যের উত্তাপ পাচ্ছি যেন! প্রিয়তমে, তোমার এ রোষাগ্নি কার উদ্দেশ্যে মহত্তর উদ্যত-বজ্ররূপে প্রস্তুত হয়ে আছে ? সে হতভাগ্য তোমার এ দাসানুদাস নয় তো ?'

'কংসারি আজ নিজ জটিল উদ্দেশ্যের উর্ণাতন্তু-নির্মাণে এমনই তন্ময় ও একান্তচিত্ত হয়েছেন যে, এ বহু ব্যবহার-জীর্ণ রসিকতার রসহীন পুনরাবৃত্তির শ্রুতিকটুতাও আর তাঁর কর্ণকে আঘাত করছে না। হা ধিক, আপনার রসিক-রাজ নাম আজ আপনার লজ্জাকর ভূষণে পরিণত হ'ল।'

স্ফুরিতাধরা সত্যভামা এক নিমেষকাল স্তব্ধ থেকে নিজের ক্রোধ অভিমান প্রভৃতি আবেগকে কিছুটা সম্বরণ ক'রে নিয়ে পুনশ্চ বললেন, 'আপনার তো

বুদ্ধির সীমা নেই। তা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বার বার আমাদেরই লাঞ্ছনার মধ্যে নিক্ষেপ না ক'রে অন্য উপায় উদ্ভাবন করতে পারেন না? এখনই আবার কিছু দিন দ্বারকা থেকে, আপনার প্রাণের বন্ধুদের যোগাযোগ-সীমা থেকে দূরে থাকতে চান—এই তো? তা বেশ তো, তার জন্য বহু কারণই তো তৈরী হ'তে পারত। শিকারেও তো যেতে পারতেন কোন দূর বনান্তস্থলীতে। হিমালয়ে তপস্যা করতে কিংবা বৃন্দাবনে পুরাতন-পাদুকার-মতো-পরিত্যক্তা গোপিনীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে—অথবা গোদাবরী-তীর্থে স্নান করতে যাওয়া—কত কীই তো কারণ ঘটতে পারত। আপনার তীক্ষ্ণ মানস-ক্ষেত্রের উর্বরা ভূমিতে এমন অ-কারণ আবিষ্কার করা তো এক মুহূর্তের ব্যাপার।'

শ্রীকৃষ্ণ অতিরিক্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তখন। আর তিনি বার-বারই লক্ষ্য করেছেন, রুক্মিণী আর সত্যভামা এই দুই নারী, হয়ত বা দ্রৌপদীও—তাঁর মনের গহন অরণ্যের বহু গভীরে প্রবেশ করেছে। এদের কাছে অকারণ আত্মগোপন বা অভিনয় করতে গিয়ে লাভও নেই।

তিনি আর কথা বাড়ালেন না। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে মাথার উষ্ণীব ও কটিবন্ধের অসি কোষমুক্ত ক'রে নীরবেই সত্যভামার প্রসারিত হাতে দিলেন। তারপর একটা উচ্চ-আসনে বসে পড়ে শাণিত শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'তাতে শাল্ববধ করা যেত না। এতে একই সঙ্গে দুই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। দুটোই আমার প্রয়োজন। শাল্বর স্পর্ধা ও দুর্বৃত্ততা সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করেছে, শিশুপালের মতোই সে ধরার ভার, মনুষ্যসমাজের আবর্জনায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু এসব এখন থাক প্রিয়ে, আমি সত্যই বড় পরিশ্রান্ত। তৃষার্ত পথিক পিপাসাহরা প্রাণভরা সুধার অন্বেষণে তোমার দুয়ারে অতিথি, তাকে অমৃতর বদলে বহ্নি দিয়ে বঞ্চিত করো না।...একটু বিশ্রাম করতে দাও। বোধ করি এক প্রহরের মধ্যেই আবার আগামী কালের কর্মদিবস আরম্ভ হয়ে যাবে। বিশ্রামের অবসর বড় স্বল্প।'

এই পুরুষশ্রেষ্ঠর পক্ষে অস্বাভাবিক, অপরিসীম শ্রান্তি চোখেই দেখা যাচ্ছে, এর পর দুটি ইন্দীবর-কোমল সেবাহস্তে দয়িতের সে ক্লান্তি অপনোদন করতে এগিয়ে আসা ছাড়া উপায় কি? বুকে যে মমতা ঘনিয়ে এসেছে—ঐ ধূলিস্বেদ-বিজড়িত রেখাঙ্কিত ললাট ও অবসন্ন দৃষ্টি দেখে—তাতেই তো আহত অভিমান ও রোষের আগুন তিন-চতুর্থাংশ নির্বাপিত-প্রায়—বাকি যেটুকু, অন্তরের উদ্বেলিত প্রেমে এখনই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

তাছাড়া, ও কণ্ঠস্বরও চেনেন বইকি। বৃথাই কিছু এতকাল এ মানুষটাকে

নিয়ে ঘর করেন নি!

এ শান্ত কণ্ঠস্বর—প্রস্তর নয়, প্রস্তরও পর্যাপ্ত তাপে দ্রবীভূত হয়—নিয়তির মতোই কঠিন, নির্মম; মৃত্যুর মতোই অনিবার্য।

ওঁর পায়ে মাথা কুটেও লাভ নেই, তাতে নিজের ললাটই রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত হবে, ওঁকে বিগলিত করা যাবে না।

॥ ২৩ ॥

যাকে দেখা মাত্র মন আনন্দে আশ্বাসে কৃতজ্ঞতায় তৃপ্তিবোধে ভরে যায়—কখনও কখনও সে অসেচনককে দেখেও আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে উঠতে হয়—এ এক অভিনব অভিজ্ঞতা যুধিষ্ঠিরের।

বিদুর চিরদিনই তাঁদের হিতাকাঙ্ক্ষী—তাঁরাও বিদুরের প্রিয়—তবু সেদিন ওঁকে দেখেই কোন্ এক অজ্ঞাত অমঙ্গলাশঙ্কায় যেন তাঁর বুক কেঁপে উঠেছিল। এখন ওঁর বার্তা শুনে বিহ্বল হয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বহুকাল কোন বাক্যস্ফূর্তি হ'ল না।

বিহ্বলতা ছাড়া আর কোন শব্দে তাঁর তখনকার মনোভাব বর্ণনা করা যায় না। কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা বললেও ঠিক বলা হয় না। এ প্রস্তাব, এ আমন্ত্রণ এতই অপ্রত্যাশিত, বিদুরের মুখভাব এমনই ভাবলেশহীন নির্বিকার, আত্মীয়তাসম্পর্কহীন—যুধিষ্ঠিরের আননের প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্রে পূর্ব পূর্ব কালে যে বিদুরের দৃষ্টি স্নিগ্ধ ও মুখভাব প্রীতিকোমল হয়ে উঠেছে—যে, তাঁর মুখ-নিঃসৃত বাক্যগুলির মর্মার্থ বুঝতে বেশ একটু বিলম্ব ঘটল।

দুর্যোধন এক নূতন সভাগৃহ নির্মাণ করিয়েছেন; সে সভাগৃহপ্রবেশের অনুষ্ঠানে কুলাগ্রজ হিসাবে তিনি যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। নূতন সে সভার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন তাঁদের জ্যেষ্ঠ অগ্রজ, ভারতের অবিসম্বাদী সম্রাট যুধিষ্ঠির—এই তাঁর ইচ্ছা। দুর্যোধন সেই উৎসব উপলক্ষে কিঞ্চিৎ দ্যূত-ক্রীড়ার আয়োজনও রেখেছেন। কুরুবৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে বিদুর এই উভয়-বিধ অনুষ্ঠানে সপরিবারে তাঁদের আমন্ত্রণ জানাতে এসেছেন। বিদুর আত্মীয়রূপে, কুরু-রাজ্যের মন্ত্রীরূপে এসেছেন বলেই সঙ্গে পুরোহিত বা কোন রাজকুলবধূকে আনার আবশ্যকতা বোধ করেন নি। তিনি আশা করেছেন মহারাজ-চক্রবর্তীর কাছেও সেটা কোন ত্রুটি বলে গণ্য হবে না।

বাহ্যত এ বক্তব্য অতি প্রাঞ্জল, কোন বাক্য বা বাক্যাংশের শব্দগত অর্থ বুঝতেও কোন অসুবিধা নেই।

বিহ্বলতা বা অর্থগ্রহণে অসুবিধা অন্য কারণে।

এ আমন্ত্রণ এত আকস্মিক, এত অকারণ এবং বিদুরের মুখভাব ও কণ্ঠস্বর এমনই চেষ্টাকৃত আত্মীয়তালেশহীন যে, যুধিষ্ঠিরের এই যোগাযোগগুলোর গূঢ়ার্থ অনুসন্ধানের ব্যাকুলতাতেই সরল মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে না।

সব চেয়ে বিস্ময়কর বিদুরের আচরণ।

এই কঠিন নিস্পৃহতা বা নৈর্ব্যক্তিকতার একটিই মাত্র অর্থ হয়—এ যাত্রায় তিনি মাত্র আদেশ পালন করতেই এসেছেন, এ কার্যে তাঁর হৃদয়ের বা বিচার-বুদ্ধির অনুমোদন নেই।

বিদুর শুধুই ধর্মজ্ঞ বা ধর্মপরায়ণ নন। তিনি অতীব বুদ্ধিমান, অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ্। বহুদূরদর্শী বলেও তাঁর খ্যাতি আছে। তিনি সর্বদা সৎ পরামর্শ দেন। কদাচ কোন অসৎ বা অমঙ্গলকর পরামর্শ দেন না, ভবিষ্যতে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে এমন প্রস্তাব অনুমোদন করেন না। এই সত্য সম্যক অবগত আছেন বলেই তাঁর পরামর্শ সর্বদা প্রেয় বা রুচিকর বোধ না হ'লেও শ্রেয়জ্ঞানে, তাঁকে যথার্থ শুভার্থী জ্ঞানে মন্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত রেখেছেন ধৃতরাষ্ট্র, পুত্রদের প্রবল প্রতিবাদ সত্ত্বেও।

বিদুর তাঁর জীবনদর্শন ও জীবনাদর্শকে ধর্ম ও সত্যের সঙ্গে যুক্ত রেখেছেন বলেই সম্ভবত খলবুদ্ধি-বর্জিত পাণ্ডবরা তাঁর সমধিক প্রিয়। চিরদিন তিনি এঁদের কল্যাণ কামনা ক'রে এসেছেন। সে পরিচয়ও চূড়ান্তভাবে পেয়েছেন যুধিষ্ঠির বারণাবত যাত্রার সময়। বিদুর সতর্ক ক'রে না দিলে আত্মরক্ষার জন্য তাঁরা প্রস্তুত হতে পারতেন না। এমন কি বিপদের কোন আশঙ্কাই তাঁদের মনে দেখা দিত না হয়ত। সেই বিদুরের এই দুর্বোধ্য মুখভাব আদৌ কোন শুভ সূচিত করছে না।···

যুধিষ্ঠির বহুক্ষণ এইপ্রকার হতভম্ব ভাবে বসে আছেন দেখে বিদুর তাঁর বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করলেন ; সাবধানে, যেন প্রতিটি শব্দ স্মরণ ক'রে ক'রে।

এবার বাক্যগুলির মধ্য থেকে সরল ও সাধারণ আপাত-বক্তব্যটুকু মস্তিষ্কে প্রবেশ করতে আর বিলম্ব হ'ল না।

তথাপি, আরও কিছুকাল নীরব থেকে যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করলেন, 'ক্ষত্তা, এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য ও পরামর্শ জানতে পারি কি ?'

এবার বিদুরের ললাট উজ্জ্বল, মুখভাব কিঞ্চিৎ স্বাভাবিক বোধ হ'ল।

তবে তিনিও আর একটি প্রশ্নেই এর উত্তর দিলেন, 'তুমি আমার ব্যক্তিগত মত শুনতে চাও ?'

'হ্যাঁ। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী ও স্নেহপরায়ণ পিতৃব্যরূপে।'

'বৎস, দ্যূতক্রীড়ায় কারও মঙ্গল হয়েছে বলে আমি শুনি নি। অপিচ এই ক্রীড়া উপলক্ষ ক'রে বহু বিবাদবিসম্বাদ, রক্তক্ষয়, স্বজনহানির ভয়াবহ ও শোকাবহ বিবরণ আমার শোনা আছে। পণ রেখে যে খেলা হয়, তাতে অনেক সময় নিজের বিচারবুদ্ধি নিষ্ক্রিয়, দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে যায়, হিতাহিতজ্ঞান লোপ পায়। এসব ক্রীড়ার নেশা আসব পানের আসক্তি অপেক্ষাও প্রবল। আমি এ আয়োজনে আমার অনিচ্ছা ও আপত্তি জানিয়েছিলাম, কুরুকুলপতি ধৃতরাষ্ট্র পুত্রস্নেহমোহান্ধ হয়ে তাতে কর্ণপাত করেন নি। আমি তাঁর বেতনভুক্ ভৃত্যরূপে তাঁর আদেশ পালন করতে এসেছি, এ আমন্ত্রণে বা এ দ্যূতক্রীড়ার ব্যবস্থায় আমার কিছু মাত্র অনুমোদন বা আনন্দ নেই। তোমরা সপরিবারে তোমাদের পৈতৃক বাসভবনে—আমার একান্ত সন্নিকটে যাবে, সে সম্ভাবনাতেও আমি কিছুমাত্র উৎফুল্ল বোধ করছি না। এই সভাগৃহ অতি দ্রুত নির্মিত হয়েছে, পাপবুদ্ধি সৌবল এর প্রধান উদ্যোক্তা ও এই সমস্ত আমন্ত্রণ-পর্বের পরামর্শদাতা। দুর্যোধন একান্তভাবে তার পরামর্শেই চালিত হচ্ছেন। বৎস যুধিষ্ঠির, এ সকলের মধ্যে আমি কিছুমাত্র মঙ্গল লক্ষণ দেখছি না, পরন্তু যৎপরোনাস্তি উদ্বেগ বোধ করছি।'

বিদুর নীরব হলে যুধিষ্ঠির ললাটে হস্ত মর্দন ক'রে কিছুক্ষণ বিভ্রান্তের মতোই কি যেন চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, 'এক্ষেত্রে উপায় ?'

'তুমি তোমার বুদ্ধি ও ভ্রাতৃগণের পরামর্শ অনুসারে যদি আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে পার তাহলেই সকল দিক রক্ষা হয়।'

যুধিষ্ঠির বিপন্ন মুখে বললেন, 'কিন্তু ক্ষত্তা, শুনেছি ভদ্রজনসমাজে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধ ও দ্যূতক্রীড়ার আহ্বান গ্রহণ না করা কাপুরুষতা বলেই গণ্য হয়। মাত্র কিছুদিন পূর্বে সমগ্র রাজন্যসমাজ যাঁকে সম্রাট বলে স্বীকার ও পূজা করেছেন, তাঁর পক্ষে এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করা কি শোভন বা সঙ্গত হবে ?'

বিদুর যেন ঈষৎ অসহিষ্ণু কণ্ঠেই বললেন, 'সাধারণ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম ও রাজার ধর্ম এক নয় বৎস। রাজার সর্বপ্রথম কর্তব্য তাঁর প্রজাদের প্রতি। তার পর তাঁদের ও বংশের মর্যাদা রক্ষা করার প্রশ্ন, নিজ সিংহাসনের নিরাপত্তার প্রশ্নও বিবেচনা করা কর্তব্য। তোমার রাজত্বে যারা সুখে আছে, নিত্যবর্ধমান সমৃদ্ধি

ভোগ করছে—তাদের এক অত্যাচারী দাম্ভিক নিজ-সম্ভোগসর্বস্ব প্রতিবেশী রাজ-পরিবারের করুণায় নিক্ষেপ করার কোন অধিকার তোমার নেই।...তাছাড়া, শব্দ ও বাক্য প্রয়োগের গুণে ও নিপুণতাতেই বার্তা মনোহারী হয়, অন্যথায় অরুচিকর ও অপ্রীতিকর হয়ে ওঠে। প্রত্যাখ্যানের শত শত সত্য কারণ নির্ণয় কি রাজনীতিবিদ বা রাজ্যশাসকদের পক্ষে এমন কিছু কঠিন কাজ ?...এমন কি এমতাবস্থায়—আত্মরক্ষার জন্যই বলতে গেলে—সামান্য মিথ্যার আশ্রয় নেওয়াতেও অন্যায় হয় না—শাস্ত্রে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া আছে।'

যুধিষ্ঠির নত মুখে নীরবে বসে রইলেন, কোন প্রত্যুত্তর করলেন না। অর্থাৎ এ পরামর্শ তাঁর মনঃপূত হ'ল না। বিদুর এবার প্রমাদ গণলেন। সৎ পরামর্শ যখন গ্রহণযোগ্য বোধ হয় না—তখনই বুঝতে হবে যথার্থ দুঃসময় এসেছে, দুর্গ্রহ-সমাবেশ হয়েছে শ্রোতার রাশি-লগ্নে।

তিনি অল্প কিছুক্ষণ যুধিষ্ঠিরের উত্তর প্রতীক্ষা ক'রে উৎকণ্ঠিত ভাবে পুনশ্চ বললেন, 'বেশ তো, তোমাদের শুভাশুভ সকল কর্মে যিনি তোমাদের হিত পরামর্শ দেন, যিনি যথার্থ তোমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—সেই বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করছ না কেন ? তাঁর পরামর্শ চেয়ে পাঠাও না !'

এবার বোধ করি উপদেশটা ধর্মরাজের মনোমত হ'ল। তবু তিনি ঈষৎ চিন্তা ও দ্বিধা-গ্রস্ত চিত্তে বললেন, 'কিন্তু যত দ্রুতই দূত-যাতায়াতের ব্যবস্থা করি না কেন, দণ্ডকাল মাত্র বিশ্রাম গ্রহণ না ক'রেও যদি সূক্ষ্মমাত্র অশ্ব পরিবর্তন করার কাল-হরণই করে সে, তাহলেও এখান থেকে দ্বারাবতী যাতায়াতে মাসাধিক কাল লাগবে, কুরুরাজদূত কি এতদিন অপেক্ষা করতে পারবেন ? আপনি তো সে রাজ্যের মন্ত্রীও বটে !'

'না-ই বা পারলাম। এত বড় বিশাল রাজ্য-শাসন ব্যবস্থার যাঁরা নিয়ন্তা, যাঁদের দায়দায়িত্বের অন্ত নেই—তাঁরা এক মুহূর্তের মধ্যেই সকল কার্য ফেলে এই প্রায়-অকারণ আমন্ত্রণে যাত্রা করবেন—এমন আশা করাই তো অসঙ্গত। তোমাদের সকল দিক বিবেচনা ক'রে অনুপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী হলে সে অবস্থায় কে কোন্ ভার নেবেন তার ব্যবস্থা করতে—মনস্থির করতে বিলম্ব হবে, এটাই তো স্বাভাবিক।'

তারপর কিছুকাল নীরব থেকে—যেন মনে মনে হিসাব ক'রে নিয়ে বিদুর বললেন, 'আমি বরং পাঁচ ছয় দিন বিশ্রাম নিয়েই পুনর্যাত্রা করি। এই কথাই তাঁদের জানাই যে এ আমন্ত্রণের উত্তর দিতে তোমাদের কিছুদিন বিলম্ব ঘটবে। তোমাদের মন ও বক্তব্য স্থির হলে তোমাদের দূত সে উত্তরের বার্তা সেখানে

পৌঁছে দেবে। ততদিন অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।'

'আপনি আরও কিছুদিন বিলম্ব করতে পারেন না?'

'মহারাজ-চক্রবর্তী আদেশ করলে অবশ্যই তা পালন করতে হবে। তবে সেক্ষেত্রে সেখানে অধীরতা ও ঔৎসুক্য বৃদ্ধি পাবে, দুর্যোধন অসহিষ্ণু হয়ে উঠবেন। ভাববেন আমি এখানে থেকে তোমাকে তাঁদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করছি। তার প্রয়োজন নেই, আমি আমার বিশ্বস্ত সঙ্গী একজনকে রেখে যাচ্ছি, সে-ই তোমাদের প্রতিক্রিয়া ও উত্তরের বার্তা নিয়ে যথাসময়ে হস্তিনা যাত্রা করবে।'

সেই ব্যবস্থাই হ'ল।

কঠোর পরিশ্রমী, অভিজ্ঞ ও পারগ বার্তাবহদের সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী রথে প্রেরণ করা হ'ল দ্বারকায়। তাদের দুটি দলে বিভক্ত ক'রে দুই দলকে দুই বিভিন্ন পথে পাঠানো হ'ল। এক দল যদি কোন কারণে বিপন্ন হয় কি দস্যু-হস্তে নিগৃহীত কিংবা বন্দী হয়, আর এক দল পেঁছিতে পারবে। দুই দলের হস্তে একই পত্রের প্রতিলিপি দেওয়া হ'ল। স্থির রইল—এরা কেউই পথিমধ্যে বিশ্রাম করবে না, রথেই রাত্রিদিন বাস করবে। কেবলমাত্র সম্রাটের অশ্ব-শালাগুলি থেকে তাঁর অনুজ্ঞালিপি অনুযায়ী সারথি ও অশ্ব পরিবর্তিত হবে—তাদের শ্রান্তি বিবেচনা ক'রে।

কিন্তু মাসাধিককাল পরে দুই দলই ফিরে এসে একই সংবাদ নিবেদন করল—শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় অনুপস্থিত। কোথায় ঠিক আছেন, কেউ জানে না। বাসুদেবের ইন্দ্রপ্রস্থ অবস্থানকালে শাল্ব দ্বারকা উৎসাদন ও লুণ্ঠন করেছেন। নিগ্রহে নিপীড়নে দুর্দশার চরম হয়েছে বৃষ্ণি ও অন্ধকদের, শিশু ও নারীর হাহাকারে সেখানের আকাশ বাতাস পর্যন্ত যেন ক্রুদ্ধ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছে। শ্রীকৃষ্ণ এখান থেকে প্রত্যাবৃত্ত হবার পর এই দৃশ্য দেখে ও দুর্দশার কাহিনী শ্রবণ ক'রে প্রতিশোধ-পিপাসায় উন্মত্তবৎ হয়ে বিনা বিশ্রামে প্রায় তৎক্ষণাৎই শাল্বর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছেন। শাল্ব সৌভ নামক ত্রিচর বিমানের অধিকারী। তিনি অন্তরীক্ষ থেকে যুদ্ধ ক'রে আত্মরক্ষার জন্য সমুদ্রগর্ভে আশ্রয় নেন। শ্রীকৃষ্ণ আহার-নিদ্রা ত্যাগ ক'রে সর্বত্র তাঁর অনুসরণ করছেন, কখন কোথায় তাঁদের যুদ্ধ হচ্ছে তা কেউ জানে না। সুতরাং বাসুদেবের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে যুধিষ্ঠিরের পত্র তাঁকে দেওয়া সম্ভব হয় নি।

আবারও সেই দ্বিধা, সেই কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা।

কিন্তু বিস্ময়ের এই, দুঃসময় আসন্ন হলে যেমন বুদ্ধিনাশ হয়—এই দারুণ দায়িত্ব ও সুদূর-বিপদসম্ভাবনাপূর্ণ ইতিকর্তব্য নির্ধারণে তিনি ভ্রাতাদের পরামর্শ নেওয়া উচিত বিবেচনা করলেন না। প্রহরকালমাত্র ইতস্তত ক'রে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করার সম্মতি জানিয়ে কুরুরাজ-দূতকে রীতিমতো উপঢৌকন ও পুরস্কারাদি দিয়ে বিদায় দিলেন।

তারপর যখন ভ্রাতা ও স্ত্রীদের জানালেন তখন আর করার কিছুই নেই। ভীম ক্রুদ্ধ হলেন, অর্জুন প্রচ্ছন্ন তিরস্কার করলেন,—ভবিষ্যৎদ্রষ্টা নকুল গম্ভীর হয়ে রইলেন। কিন্তু রাজসম্মতির অন্যথা করা তখন আর সম্ভব নয়।

আসলে শকুনি ঠিকই অনুমান করেছিলেন—যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় দুর্বল, অপটু, সেইজন্যই তাঁর এ ক্রীড়ায় আসক্তি প্রবল। সেই প্রলুব্ধ আসক্তিই দুর্বার গতিতে তাঁকে আকর্ষণ করেছে—অথবা নিয়তি, কে জানে কি!

এই সংবাদ নিয়ে হস্তিনায় দূত পৌছলে সেখানে মহোৎসবের মহোল্লাসধ্বনি উঠল। প্রাসাদের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে পান-ভোজনের বন্যা বয়ে গেল প্রায়!

কেবল বিদুর ললাটে করাঘাত ক'রে অস্ফুটস্বরে বললেন, 'পাণ্ডব সৌভাগ্য-সূর্য প্রায় উদয়ক্ষণেই অস্ত গেল! সম্মুখে দুর্ভাগ্যের দুস্তর রাত্রি। জানি না বাসুদেব, এ তোমার কি খেলা।'

যাত্রার ঠিক পূর্বক্ষণে—ঠাটকটক প্রস্তুত, অগ্রগামী দল যখন প্রায় ইন্দ্রপ্রস্থের সীমা পর্যন্ত পৌছে গেছে, পশ্চাদনুসরণকারী দলের অসহিষ্ণু অশ্বনিচয়ের হ্রেষারব নদীর পরপারবর্তী শৈলসানুতে প্রতিধ্বনি জাগ্রত ক'রে শান্ত অনুদ্বিগ্ন নগর-বাসীদের সচকিত ও ত্রস্ত ক'রে তুলছে—তখন সামান্য একটু বাধা পড়েছিল।

পট্টমহাদেবীর শিবিকা থেকে এক করঙ্কবাহিনী এসে সংবাদ দিল- যাত্রায় বিঘ্ন দেখা দিয়েছে, সম্রাজ্ঞী অকস্মাৎ রজস্বলা হয়ে পড়েছেন। এ অবস্থায় তো যাত্রা নিষিদ্ধ। মহাদেবীও অস্বস্তি বোধ করছেন, অমঙ্গল আশঙ্কা করছেন। এক্ষণে মহারাজ-চক্রবর্তীর কি নির্দেশ জানতে চান তিনি।

যুধিষ্ঠির এই অযথা বিলম্বে বিরক্ত মুখে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে উত্তর দিলেন, 'আমরা পূর্বেই যথাবিহিত শাস্ত্রবিধি-অনুযায়ী যাত্রা ক'রে প্রাসাদপরিখা অতিক্রম করেছি, এখন যা-ই ঘটুক, তাতে যাত্রার বাধা জন্মাবে না। পট্টমহিষীর শিবিকা আমাদের রথের পুরোভাগে আনতে বল, তিনিই অগ্রগামিনী হবেন। মহিষীরা সকলেই আগে যাবেন, আমাদের রথ তাঁদের অনুগামী হবে— এই আমার ইচ্ছা।'

এর পর আর কোন প্রশ্নই ওঠে না।

সেই মতোই শিবিকা, রথ, হস্তী, অস্ত্র ও খাদ্যবস্তুবাহী গোশকট ইত্যাদি একে একে চলে গেলে পশ্চাদংশরক্ষাকারী সৈন্যদল তাদের অনুগামী হ'ল। এই বিপুল যানবাহন-পদোৎক্ষিপ্ত ধূলিতে মনে হ'ল—প্রাক্-মধ্যাহ্নসূর্যের প্রদীপ্ত রশ্মিজাল প্রাবৃটজলদাবৃত হয়েছে, প্রায় প্রভাতকালেই নেমেছে সন্ধ্যার ছায়া।

সেই ধূলিরাশিও দীর্ঘকাল বায়ুতাড়িত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে একসময় যখন স্থির ও ভূমিস্থ হয়ে এল, সূর্যকিরণ ও তার খরতাপ পুনশ্চ পথচারীর দেহকে উত্তপ্ত ও স্বেদসিক্ত ক'রে তুলল, তখন দেখা গেল আরও কয়েকটি প্রাণী পদব্রজে এই দলের অনুসরণ করছে।

নিষাদ কীলক ও কয়েকটি সারমেয় পরিবৃত বিরাট একদল বৃষ ও মেষ। কীলকও বোধ করি বাণিজ্য করতেই চলেছে। কিন্তু আজ তার চোখে মুখে সেই প্রায়চিরস্থায়ী হিংস্রতা ও ঘৃণার ভাব নেই, বরঞ্চ এক অপরিসীম তৃপ্তির প্রসন্নতা ফুটে উঠেছে। ফলে তার বীভৎস মুখও অপেক্ষাকৃত দৃষ্টিসহনীয় বোধ হচ্ছে।

কীলক যেতে যেতে সঙ্গীতের কলির মতোই অস্ফুটস্বরে বার বার একই বাক্যের পুনরাবৃত্তি করছিল, 'সর্বনাশের দিকে ছুটে যাবার কী আনন্দ, কী আগ্রহ! নিজেরই হোক পরেরই হোক—সর্বনাশের পথই বোধ করি অধিকতর মনোহর।'

॥ ২৪ ॥

রাজকুলের অন্তঃপুরেও সৌজন্যরক্ষার কতকগুলি বাঁধাধরা রীতি আছে—যা অবশ্য-পালনীয়। সে কথা জানেনও কৌরববধূরা। তত্রাচ তাঁদের প্রত্যেককেই সে সম্বন্ধে পুনশ্চ সচেতন ক'রে দেওয়া হয়েছিল। এই সতর্কীকরণের জন্য বিশেষ সংবাদবাহিকা থাকেন, তিনি রাজা বা প্রধানা মহিষী—বা অন্তঃপুরের কর্ত্রীস্থানীয়া—তাঁর নির্দেশ প্রতি বধূ বা কন্যার কক্ষে কক্ষে গিয়ে জানিয়ে দিয়ে আসেন। এক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় হয় নি।

যে বধূরা প্রধান প্রাসাদে থাকেন না, দুর্যোধন বা দুঃশাসনের পত্নীগণ—এই সব প্রধান কুমাররা স্বতন্ত্র গৃহে দাসদাসী পরিজন নিয়ে পৃথক বাস করেন—তাঁদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁরা যেন ঐদিন পাণ্ডবপুরনারীদের অভ্যর্থনার জন্য

স্নান প্রসাধন সমাপ্ত ক'রে প্রাসাদে এসে অপেক্ষা করেন। কারণ পৃথক বাস করেন স্থানাভাববশত, মূলে তাঁরা এই পরিবারের অন্তর্গত, প্রধানা মহিষী গান্ধারীর অধীন। অন্তত লোকদৃষ্টিতে তাই। পাণ্ডবমহিষীগণ, রাজমাতা ও অন্যান্য যেসব পুরললনা তাঁদের সঙ্গে আসছেন, অন্তঃপুরের প্রবেশপথে রথ বা শিবিকা থেকে বস্ত্রবেষ্টনী সরিয়ে হাত ধরে নামিয়ে আনতে হবে। এবং প্রতি অতিথিকে এক জন হিসাবে পুরবর্তিনী হয়ে নির্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে পৌঁছে দিতে হবে।

মর্যাদা উভয় পক্ষেরই বিচার্য। সেই ভাবেই অভ্যর্থনা পর্ব পালিত হবে। নির্দেশও খুব স্পষ্ট। দুর্যোধনের প্রধানা পত্নী ভানুমতী পাণ্ডবদের পট্টমহাদেবী দ্রৌপদীর হাত ধরে নামাবেন, মালাচন্দন নববস্ত্রে ভূষিত করবেন, উপহারাদি গ্রহণ করবেন, তারপর হাত ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। অন্যান্য বধূরা এ পক্ষের অপরাপর মহিষীদের বা বধূদের নামাবেন, বয়স ও পদবীর ক্রম অনুযায়ী এ পক্ষের বধূরা কে কাকে স্বাগত জানাবেন, তাও পূর্বেই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

এই রীতি অনুযায়ী গান্ধারীরও দেহলীপ্রান্তে আসবার কথা—গান্ধারীর যাতা রাজমাতা কুন্তীকে অভ্যর্থনা করার জন্য। কুন্তীর সঙ্গে সাক্ষাতে ওঁর এমনি যথেষ্ট আগ্রহ কিন্তু এক্ষেত্রে একটু দ্বিধা ও সঙ্কোচ ছিল। পুত্রদের এ ষড়যন্ত্রে অবশ্যই তাঁর সম্মতি নেওয়া হয় নি। তাঁকে এ সমস্ত সংবাদ জানানোই হবে না—এটা পিতা-পুত্র কোন আলোচনা না ক'রেও স্থির রেখেছিলেন। অলিখিত বা অকথিত চুক্তি বলা যায়। কিন্তু একান্ত ধর্মপরায়ণা ও অতিশয় বুদ্ধিমতী গান্ধারী যেন বাতাসেই অধর্মের গন্ধ পেতেন। অকস্মাৎ পাণ্ডবদের সাড়ম্বরে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে, সাজ সাজ রব পড়ে গেছে ভৃত্য সেবক পরিজন দেহরক্ষী সারথি তৈজসবাহক—এতগুলি লোকের স্থানসংকুলান করা, তাদের খাদ্য-পানীয় ইত্যাদির ব্যবস্থা করা, খুব সহজ কর্ম নয়, নিঃশব্দে করার মতোও নয়।

এ সবই কেবলমাত্র সৌজন্যবশত নয়। বিশেষ কোন উৎসব, সানন্দ অনুষ্ঠান —সৌজন্য, সৌহার্দ্য, সৌভ্রাত্র ঘটনা হলে পূর্বেই তাঁকে জানানো হ'ত, তাঁর মত ও নির্দেশ নেওয়া হ'ত। তাতে যে এসব কর্মদায়িত্ব পালনের গুরুভার অনেক লাঘব হ'ত—তাঁর পুত্রদের তাও অজানা নেই। তাঁকে জানানো হয় নি আশঙ্কাবশতই। তিনি দৃঢ় ও স্পষ্ট কণ্ঠে কোন কার্যে নিষেধ করলে এ পুরীতে এমন কেউ নেই যে সে নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করতে সাহসী হ'ত। এ অন্য কিছু, এবং এতে পাণ্ডবদের শুভ কি কল্যাণ নেই। অধর্মের পথ অবলম্বন করলে

কৌরবদেরও না। মূঢ়রা জানে না, অধর্মে কিছুদিন বেশ সুবিধা হতে পারে, জয় বা সাফল্যও অসম্ভব নয়, কিন্তু সে পথে গেলে একদিন সমূলে বিনষ্ট হতে হবে।

সঙ্কোচ এই কারণেই ছিল। রাজমাতা কুন্তী সে দায় থেকে তাঁকে অব্যাহতি দিলেন, রাজধানীতে প্রবেশের পূর্বেই দ্রুতগামিনী দূতী প্রেরণ ক'রে জানিয়ে দিলেন—তিনি বিদুরের গৃহেই বাস করবেন এবং সরাসরি সেখানেই চলে যাবেন।

সুতরাং ভানুমতীই আজ সর্বতো কর্ত্রী। অভ্যর্থনাকারিণীদের প্রধানা। তবে, এই প্রথম, প্রাধান্য তাঁর কাছে অরুচিকর ঠেকছে।

ভানুমতী কুরুভাণ্ডারের সর্বাপেক্ষা মহার্ঘ্য মণিমুক্তার অলঙ্কারে সর্বাঙ্গ আবৃত ক'রে, নিপুণভাবে আতশয় অনিচ্ছা ও অরুচির ভাবটিই মুখে ফুটিয়ে দ্বারে এসে দাঁড়ালেন। ঈর্ষার চিহ্নমাত্রও না মুখে ফোটে এই তাঁর চেষ্টা। উপেক্ষা, তাচ্ছিল্য, রূঢ়তা যা হয় বুঝুক ওরা—কিন্তু মাৎসর্য অর্থাৎ তিনি ঈর্ষিতা—এ কথা না ভাবতে পারে।

কিন্তু প্রথমেই প্রচণ্ড একটা আঘাত পেলেন দুর্যোধন-মহিষী—যার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। যে অবস্থার কথা সুদূরতম কল্পনাতেও ছিল না।

অথচ এর মধ্যে পাণ্ডবদের কোন চক্রান্ত বা পূর্বপরিকল্পনা ছিল না। ঘটনাটা নিতান্তই আকস্মিক। খাণ্ডবপ্রস্থ পার হওয়ার সময় কে বা কারা অন্তরাল থেকে তীক্ষ্ণ ও অব্যর্থ শরনিক্ষেপে মহারাজ্ঞী কৃষ্ণার রথের চারটি অশ্বকেই গুরুতর আহত করল। জীবন রক্ষা হোক বা না হোক সে পরের কথা, রথাকর্ষণ অন্তত এযাত্রা তাদের দ্বারা সম্ভব হবে না।

ঘটনাটা যে সত্যই ঘটেছে এবং তার গুরুত্ব অনুভব করতেই বহুক্ষণ সময় লাগল এঁদের।

এত দুঃসাহস কার? এর থেকে সাক্ষাৎ কৃতান্তর মুখগহ্বরে প্রবেশ করাও যে অনেক তুচ্ছ এবং নিরাপদ কাজ!

প্রথমেই সন্দেহ হয় এ কোন কৌরব গুপ্তচরের কাজ—কিন্তু পাণ্ডব ভ্রাতারা শোভনতা ও স্বীয় বংশের সম্মানের কথা চিন্তা ক'রে কেউই সে সংশয় মুখে উচ্চারণ পর্যন্ত করলেন না। তার পরিবর্তে সেখানকার বিটপীবহুল বনস্থলীতে যাকে বলে 'পত্রে পত্রে সন্ধান' তাই করলেন। কিন্তু নিজেদের বিশ্বস্ত পরিচিত যাত্রীদলভুক্ত লোক ছাড়া তেমন সন্দেহ-ভাজন কাউকেই পাওয়া গেল না। এক কয়েকজন নিরীহ নিষাদ মাংসব্যবসায়ী তাঁদের পিছু পিছু আসছিল একপাল

মৃগ ও শূকর নিয়ে—এদের প্রয়োজনমতো কিছু ব্যবসায় করবে এই আশায়—এত সাহস তাদের হবে এ কথা কারও মনে হ'ল না। তারা ছিলও অনেক পিছনে, তাছাড়া তাদের কাছে যে ধনুঃশর ছিল তা নিতান্তই গ্রাম্য বা বন্য ধরনের, গৃহনির্মিত। আমমাংসের স্থূল তন্ত্রী ও বেত্রদণ্ডের ধনু। শর প্রভৃতিতেও কুত্রাপি কোন নিপুণতার চিহ্ন নেই। যে সুতীক্ষ্ণ সায়কে রাজ-অশ্বগণ আহত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে কোন সুদক্ষ যান্ত্রিক দ্বারা প্রস্তুত। এবং অভ্যস্ত ও সুশিক্ষিতপটু ছাড়া এমন অব্যর্থ শরসন্ধানও সম্ভব নয়।

অগত্যা অনুসন্ধান পর্বে ছেদ টানিতে হয়েছিল।

এখন প্রশ্ন মহাদেবী কিসে যাবেন? অন্য কোন শিবিকারোহিণীর সঙ্গে যাওয়া তাঁর পক্ষে অশোভন, অমর্যাদাকর। রথ বা শিবিকা হয়ত একটা খালি করিয়ে নেওয়া যেতে পারে তবে তা মহামহিষীর উপযুক্ত হবে না। অনেক চিন্তা ও আলোচনার পর মনে পড়ল—এই রাজযাত্রী-দলের পুরোভাগে একটি হস্তী যাচ্ছে, সৌন্দর্য ও আড়ম্বরের লক্ষণ হিসাবে—হস্তীপৃষ্ঠে রাজজনোচিত বরগুকের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে কিন্তু আরোহী কেউ নেই। এ হস্তী রাজসূয় যজ্ঞে প্রাগ্-জ্যোতিষপুরের উপহার হিসাবে এসেছে, পর্বতাকার বিরাট ও সুদন্তী এবং সুশিক্ষিত। সুসজ্জিত তো বটেই। ভীমসেন আদেশ করলেন, 'মহামহিষী কৃষ্ণা ঐ গজপৃষ্ঠেই আরোহণ করুন, তাতে তাঁর মর্যাদা খর্ব হবে না। অসুবিধারও কোন কারণ নেই। বরং তাঁর অনুরূপ বাহন বলেই বিবেচিত হবে সকলের কাছে। আরোহিণীর জন্য যে বরগুক আছে তা যথেষ্ট আরামদায়ক, বিস্তৃত ও মহার্ঘ্য বস্ত্রাবরণে নাতিক্ষুদ্র গৃহতুল্য বলেই বোধ হবে, স্বচ্ছন্দে যেতে পারবেন। মনে হচ্ছে যেন ওঁর জন্যই, কেউ পূর্বাহ্ণে এ সম্ভাবনার কথা চিন্তা ক'রেই, এভাবে সুসজ্জিত করেছে।'

এ প্রস্তাবে আপত্তির কোন কারণ খুঁজে পান নি কেউ। এর মধ্যে যে কিছু অতিরিক্ত দম্ভ প্রকাশ পেতে পারে বা অপরকে ক্ষুদ্র করার চেষ্টা বলে মনে হবে—তাও কারও চিন্তায় আসে নি।···

প্রাসাদান্তঃপুরের প্রবেশপথের কিছু দূরেই সে বিপুলকায় হস্তীকে থামতে হ'ল। কারণ বহির্দ্বার রথ বা শিবিকার কথা চিন্তা ক'রেই হয়ত নির্মিত হয়েছিল, এমন বিশালকায় বাহনের কল্পনা ছিল না। শিক্ষিত হস্তী অবশ্য পরিচালকের ইঙ্গিতে অতি সাবধানে বসে পড়ল, তবু সে প্রাবৃটকান্তি গজপৃষ্ঠকে স্ত্রীলোকের পক্ষে পর্বতাকারই বোধ হবার কথা, ভয়াবহ তো বটেই।

অবশ্য এমনি কারও পক্ষেই সেখান থেকে নেমে আসা সম্ভব নয়। এক

শিক্ষিত মহামাত্র ছাড়া। সে ব্যবস্থাও ছিল, রজতনির্মিত এক সোপানশ্রেণী সঙ্গেই আসছিল, মহারাজ্ঞীর অবতরণের সুবিধার্থে তা আসনের সঙ্গেই একেবারে লাগিয়ে দেওয়া হ'ল।

কিন্তু ভানুমতীর অন্য সমস্যা। এক্ষেত্রে তাঁর করণীয় কি? হস্তীপৃষ্ঠ থেকে নেমে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা—অথবা সেখান পর্যন্ত উঠে গিয়ে নামিয়ে আনা? রাজ-আচরণবিদের নির্দেশ খুব স্পষ্ট: বাম হস্তে শিবিকা বা রথের প্রবেশাবরণী-বস্ত্র অপসারণ ক'রে দক্ষিণ হস্তে আরোহিণীর দক্ষিণ হস্ত ধারণ ক'রে সসম্মানে নামিয়ে নিতে হবে।...এ তো শিবিকাও না, রথও না; এক্ষেত্রে কি কর্তব্য?

চিন্তা করা, অপেক্ষা করার সময় নেই। প্রাসাদ-কর্তৃপক্ষর কাছ থেকে নির্দেশ আনার চেষ্টা করা তো বাতুলতা। অগত্যা সেই ঈষৎ দোলায়মান স্বল্প-পরিসর সোপান বেয়ে—অস্থায়ী সোপান বলেই পা রাখার স্থানও সঙ্কীর্ণ—উঠে যেতে হয়। কিছুদূর তো যেতে হবেই; যদি পাণ্ডবমহিষী অভিমানবশতঃ বসেই থাকেন তো পুরোটাই উঠতে হবে। এ যেন মর্ত্যের জীবের স্বর্গবাসিনীকে নামিয়ে আনতে যাওয়া!

এ অপমান মৃত্যুতুল্য বোধ হ'ল ভানুমতীর। অজ্ঞাতকুলোদ্ভবা ক্রীতদাসীর মতো নগণ্য ও অবজ্ঞেয় ব্যক্তির পর্যায়ে পৌঁছলেন বলে মনে হতে লাগল। চোখে জল আসা স্বাভাবিক। কিন্তু সে তো সামান্যা প্রাকৃত স্ত্রীলোকের পক্ষে। রাজরাণীর কারও সামনে চোখের জল ফেলতে নেই, সে অধিকতর অপমান। এসব জেনেও ওঁর দৃষ্টি এত অবাধ্য হ'তে চায় কোন্ স্পর্ধায়?

তবু এতেই দীনতার শেষ নয়। উপরে উঠতে উঠতেই চোখে পড়ল গজপৃষ্ঠের হেমনির্মিত আসনবেষ্টনীতে পাশ্চাত্ত্য দেশাগত যে সূক্ষ্ম পশুলোমের আবরণী দেওয়া—তাদৃশ নয়নমনোহর বস্ত্র ইতিপূর্বে কখনও দেখেন নি ভানুমতী। সে বস্ত্রই নিঃসন্দেহে মহার্ঘ্য—কোন্ উপকরণে প্রস্তুত তাও জ্ঞান বা অনুমানের অতীত—তবে সেও তুচ্ছ কথা, সে বস্ত্রের উপর যে কারুকার্য করা হয়েছে তা বোধ করি কোন কারুশিল্পীর সমগ্র জীবন-সাধনার ফল।

নিমেষকালেরও কিঞ্চিৎ অধিক সময় হবে—ভানুমতী সেদিকে চেয়ে বিহ্বল হয়ে গিছলেন, স্থান কাল পাত্র কিছুর সম্বন্ধেই সচেতনতা ছিল না তাঁর—তার মধ্যেই স্বীয় বামহস্তে সে সম্মুখাবরণ উন্মোচিত ক'রে সহাস্যবদনা মহিষী কৃষ্ণা নেমে এলেন।

'তুমি কেন উঠতে গেলে ভাই আবার এ সিঁড়িতে—এ যে ভীষণ কষ্ট। ছি ছি! এ কি স্ত্রীলোকের কর্ম, এই একটা কিম্ভূতকিমাকার জীবের পৃষ্ঠে

আরোহণ করা! মধ্যম পাণ্ডব নিজের মতোই বিশ্বসংসারকে ভাবেন, দিলেন আমাকে এখানে উঠিয়ে!···তুমি সাবধানে আগে নেমে যাও, আমি ঠিক নামছি।'

কিন্তু এসব কোন কথারই অর্থ বোধগম্য হওয়ার মতো অবস্থা ছিল না তখন ভানুমতীর। তাঁর মতো সর্বঅঙ্গ-আবরিত করা স্বর্ণ ও রত্ন-অলঙ্কারের বাহুল্য নেই পাণ্ডব মহিষীর—কিন্তু যে স্বল্পসংখ্যক মণিরত্ন দ্রৌপদী পরিধান করেছেন তার দুষ্প্রাপ্যতা, মহার্ঘ্যতা ও শিল্পচাতুর্য সম্বন্ধে অলঙ্কারপ্রিয় ভানুমতীর কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না। এগুলির নির্বাচনেও যথেষ্ট সুরুচির পরিচয় দিয়েছেন কৃষ্ণা, সেটা মুখে স্বীকার করুন বা না করুন, তাতেই যে এই আশ্চর্য রূপবতী নারীর সহজ সৌন্দর্য শতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে তা মনে মনে অন্তত অস্বীকার করবেন কি ক'রে! আর এর পার্শ্বে নিজের দেহের এই স্বর্ণ ও প্রস্তরের বোঝা যে দাসী ও অন্যান্য পুরললনার কাছে পরিহাসের বস্তু হয়ে উঠেছে তা অনুভব ক'রে নিজেকে আরও হীন ও লুব্ধ বোধ হতে লাগল।

যে ঈর্ষা-চিহ্ন কিছুতে মুখে প্রকাশিত হতে দেবেন না বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন ভানুমতী, সেই ঈর্ষাতেই মুখ মসীবর্ণ ধারণ করল—মাৎসর্যের তীব্র আশীবিষ-জ্বালায় যেন সকল প্রকার হিতাহিত জ্ঞান হারালেন, নিমেষে প্রধান মহিষীর স্তর থেকে গ্রাম্য প্রাকৃত নারীতে পরিণত হলেন! হাত ধরে নিয়ে যাওয়ার সুস্পষ্ট নির্দেশও মনে রইল না। শুধু পথ দেখিয়ে যাওয়ার মতো আগে আগে গেলেন মাত্র। এবং দেহলীপ্রান্তে পৌছে—দাসী মাল্যচন্দন মধু নববস্ত্র প্রভৃতি অভ্যর্থনার উপচার সজ্জিত স্বর্ণথালি নিয়ে প্রস্তুত হয়েই ছিল—কোনমতে অবশ্যকরণীয় সে পর্বটুকু শেষ ক'রে—বিনা সম্ভাষণে যন্ত্রচালিতবৎ—আর এক ছত্রবাহিনী দাসীকে নির্দেশ দিলেন, 'যা, পাণ্ডবমহিষীকে তাঁর কক্ষে পৌছে দিয়ে আয়। সাবধানে নিয়ে যাস।' শেষের বাক্যটি অনেক পরে অনেক অনিচ্ছায় উচ্চারিত হ'ল।

অবমাননাটা তীব্র কষাঘাতের মতোই অনুভূত হ'ল দ্রৌপদীর।

মাত্র কয়েক মাস পূর্বেই তিনি এই বধূকে সসম্মান সাড়ম্বর অভ্যর্থনা জানিয়ে দু হাত ধরে নির্দিষ্ট প্রাসাদে নিয়ে গিয়েছিলেন। সে কথাও স্মরণে রইল না!

তবে দ্রুপদনন্দিনী পাণ্ডবজায়ার শিক্ষা অন্যরূপ। তাঁর মুখে কোন ভাবান্তর লক্ষিত হ'ল না। পূর্বের মতোই বরং আন্তরিক অমায়িকতার সুরে বললেন, 'সামান্য কিছু উপহার এনেছিলাম ভগ্নী—'

ঈর্ষা ক্ষোভ বা তজ্জনিত উষ্মা যতই প্রবল হোক, কৌতূহল প্রবলতর। তাই

থমকে দাঁড়িয়ে সেদিকে চাইতে হ'ল।

'সামান্য' এক্ষেত্রে উপঢৌকনের স্তূপ। আচ্ছাদনী বস্ত্র (তাও অদৃষ্টপূর্ব) অপসারিত করতেই মুহূর্তে দৃষ্টি যেন বিভ্রান্তিপ্রাপ্ত হ'ল। রত্নালঙ্কার, মহামূল্য বস্ত্র, দুর্লভ এবং এদের অজ্ঞাত গৃহসজ্জার উপকরণ—যা পাণ্ডবরাও পূর্বে কখনও দেখেন নি, ব্যবহার তো দূরে থাক, এই রাজসূয় যজ্ঞ উপলক্ষে প্রথম দেখলেন, কার কি ব্যবহার শুনলেন। দূরাগত অতিথিরাই এনেছিলেন রাজচক্রবর্তীর প্রাপ্য অর্ঘ্য হিসাবে। পাণ্ডবদের জ্ঞান এমন কি শ্রুতিরও বাইরের বহু দেশ থেকে এসেছিলেন তাঁরা, তাঁদের দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পসামগ্রী নিয়ে। তা থেকেই দ্রৌপদী নারীমনোরঞ্জক দ্রব্যগুলি বেছে বেছে এনেছিলেন, ভানুমতী প্রীত ও প্রসন্ন হবেন এই দুরাশায়।

দ্রৌপদী যা ভেবেছিলেন প্রীতির সেতু রচনা করবে—তা 'তীব্রজ্বালা অগ্নিঢালা' হলাহলবৎ দগ্ধ করতে লাগল কৌরব বধূ-প্রধানাকে। তিনি প্রাণপণ চেষ্টায় মুখে উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটিয়ে একবার মাত্র সেই চারজন বলিষ্ঠা যবনী-দাসীবাহিত পর্বতপ্রমাণ উপঢৌকনরাশি দুই হাতে স্পর্শ ক'রে বললেন, 'নিলাম। সত্যই বড় সুন্দর।' তার পর আর এক দাসীকে আদেশ করলেন, 'এই—এগুলো আমার প্রাসাদের কোন কক্ষে রেখে দিয়ে আয়। একটা তালিকা ক'রে রাখতে বলিস কাউকে, এই বুঝে এঁদের বিদায়কালে উপহার দিতে হবে।'

তার পর দ্রৌপদীকে কোন সম্ভাষণ মাত্র না জানিয়ে দ্রুত অন্য দিকে প্রস্থান করলেন।

দ্রৌপদী পূর্বোক্ত দাসীর সঙ্গে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট বাসকক্ষে যাত্রা করার পূর্বে একবার দুই পাশে চেয়ে দেখলেন। অন্যান্য পাণ্ডবপত্নীদের অভ্যর্থনাজ্ঞাপনের জন্য যে সব কৌরববধূরা অপেক্ষা করছেন, প্রত্যেকেরই বিরস বদন—বিরক্তি ও ঈর্ষায় মসীবর্ণ ধারণ করেছে। অভ্যর্থনা যে কেমন হবে তা তো ওঁকে দিয়েই বুঝতে পারছেন। এদের কারও মুখভাবেই প্রীতি বা শুভেচ্ছা—এমন কি সৌজন্যেরও বিন্দুবৎ চিহ্নমাত্র নেই। যেন তাঁদের লাঞ্ছিত ও অপমানিত করার জন্যই ডেকে আনা হয়েছে।

এ কী করলেন ধর্মরাজ! এখানের আকাশ-বাতাসও বোধ করি পাণ্ডবদের সম্বন্ধে বিদ্বেষ-বিষে তিক্ত, বিষাক্ত। যুধিষ্ঠির নিজে এসে তো ভুল করলেনই—অধিকতর ভুল করলেন অন্তঃপুরিকাদের সঙ্গে এনে।

শুধু অভ্যর্থনাতেই নয়—আহার বিশ্রাম স্নানাদি—সর্ব ব্যবস্থার সর্ব পর্যায়েই

অসূয়া বিদ্বেষ—তজ্জনিত চেষ্টাকৃত তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেতে লাগল। এক-এক-বার তা সর্বপ্রকার শোভনতা শালানতা এমন কি এঁদের সহ্যেরও সীমা অতিক্রম করল। বোধ করি কৃষ্ণার কয়েকবারই মনে হ'ল তাঁর শিবিকা বা রথ আনিয়ে তিনি একাই ইন্দ্রপ্রস্থে যাত্রা করেন বা বিদুরের গৃহে জননী কুন্তীর কাছে চলে যান। কিন্তু সৌজন্যবোধ যাদের সহজাত, অস্থিতে মজ্জাতে রক্তে মিশে আছে, তারা সহস্র অবমাননা সহ্য ক'রেও অপর পক্ষকে আঘাত করতে দ্বিধা বোধ করে। দ্রৌপদীও তাই অতিকষ্টে নিজেকে সম্বরণ ক'রে রইলেন।...

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে এলেও গৃহে প্রদীপ জেলে দেওয়ার কথা কারও মনে পড়ে নি। দ্রৌপদীর নিজস্ব দাসীদের কোথায় কোন এক দূর প্রান্তে স্থান দিয়েছে এরা কে জানে, তাদের কেউই আসছে না। হয়ত এরাই বাধা দিয়েছে, 'আমাদের গৃহে আমাদের দাসীই পরিচর্যা করবে' এই অছিলায়।

সেই প্রায়ান্ধকার কক্ষে প্রাণপণে চক্ষুপ্রান্তাগত ক্রোধোত্তপ্ত অশ্রু দমন করার চেষ্টা করছেন দ্রৌপদী, দ্বারপ্রান্তে অন্ধকারের মধ্য থেকে যেন সেখানকার ছায়াই ঘনতর হয়ে মূর্তি ধারণ ক'রে পাশে এসে দাঁড়াল।

'কে ?' চমকে উঠলেন কৃষ্ণা।

যে এসেছিল সে এবার সামনে এসে ওঁর পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করল।

'মহাদেবী আপনি আমাকে চিনবেন না। আমি এক নগণ্যা শূদ্রা দাসী মাত্র।'

'দাসী ? কার দাসী ? কে পাঠিয়েছে ?'

সে কথার উত্তর দিল না মেয়েটি। ঘোর কৃষ্ণবর্ণা, অনার্য কন্যা। কিন্তু তার কথাবার্তা বেশ মার্জিত মনে হ'ল।

সে এবার ওঁর চরণপ্রান্তে এক খণ্ড বস্ত্র রেখে বলল, 'আপনার কোন হিতাকাঙ্ক্ষী বান্ধব পূর্বদেশাগত এই সূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্র পাঠিয়েছেন। দুইশত হস্ত পরিমিত বস্ত্র, কিন্তু পরে থাকলে মনে হবে একটিই মাত্র একপ্রস্থ শাড়ি। কাল প্রভাতে আপনি অতি অবশ্য এই বস্ত্র ধারণ করবেন।'

দ্রৌপদী অধিকতর বিস্মিত, কিছু বা সন্দিগ্ধ হয়ে বললেন, 'আমি রজস্বলা, এ অবস্থায় নববস্ত্র পরিধান যে নিষেধ।'

দাসীটি সবিনয়ে অথচ বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর দিল, 'আপৎকালে কোন কিছুই নিষিদ্ধ নয় মহাদেবী। কাল আপনাকে ঘোর বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। ধর্ম যাঁর আজ্ঞাধীন এমন এক ব্যক্তি এ বস্ত্র পাঠিয়েছেন। আমি যে শত্রুপক্ষের কোন লোক নই বা বাতুলও নই—তার প্রমাণ এই অঙ্গুরীয়।'

দুই হাতে একটা কি বস্তু মেলে ধরল সে।

দ্রৌপদী তা হাতে ক'রে তুলে নিয়ে পশ্চিম বাতায়নের কাছে এনে তখনও যেটুকু আলোর আভাস ছিল—তাতেই ভাল ক'রে চেয়ে এবং ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। তাঁরই অঙ্গুরীয়, কুমারী অবস্থার—পিতৃদত্ত। কিন্তু এ কেমন ক'রে পেল? কই, তিনি যে কাউকে দিয়েছেন কখনও—তা তো মনে পড়ছে না! হয়ত খুলে কোনদিন কোন পেটিকায় রেখেছেন, এ অঙ্গুরীয়ের কথা স্মরণে পড়লেও এই ভেবেই আশ্বাস লাভ করতেন।

তিনি ফিরে আরও কিছু প্রশ্ন করতে যাবেন—দেখলেন সে দাসী নেই। যেমন এসেছিল ছায়ামূর্তির মতো ঘনায়মান অন্ধকারকে যেন ঘনতর ক'রে—তেমনি সেই অন্ধকারেই মিশে গেছে কখন।

শুধু এ যে সমস্তটাই স্বপ্ন নয়—তার প্রমাণ স্বরূপ সে বস্ত্রখণ্ডটি পড়ে আছে এখনও।

॥ ২৫ ॥

মানবজীবনে কখনও কখনও এমন দিন আসে, এমন ঘটনা ঘটে—যা সম্পূর্ণ সজ্ঞানে প্রত্যক্ষ ক'রে বা নিজে সে ঘটনাবর্তের অঙ্গীভূত হয়েও মানুষ সম্পূর্ণ উপলব্ধি বা বিশ্বাস করতে পারে না। নিজের জীবনের একটি বাস্তব খণ্ডাংশকে সে উত্তপ্ত ক্লান্ত মস্তিষ্কের কল্পনা ভাবে, দুঃসহ চরম দুঃখদুর্দশাকেও দুঃস্বপ্ন বলে বোধ করে।

এ সত্যটা দ্রৌপদী নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে উপলব্ধি করলেন, নারীজীবনের চরম লাঞ্ছনার মূল্যে তা ক্রয় করতে হ'ল।

সে দিনের প্রতিটি দণ্ড পলের ইতিহাসই তো অবিশ্বাস্য। মানুষ যে এমন ভাবে অনায়াসে পশুরও নিম্ন পর্যায়ে নেমে আসতে পারে তা তো কোনদিন সুদূরতম কল্পনাতেও ধারণা করতে পারেন নি তিনি। না, পশুর সঙ্গে তুলনা দিলে পশুর অপমান করা হয়। অতি ঘৃণ্য, অস্পৃশ্য, অখাদ্যভোজী, মললুব্ধ পশুদের জীবনেও কতকগুলি নিয়ম আছে, যা তারা কদাচ লঙ্ঘন করে না। কিন্তু এরা সে নিয়মও রক্ষা করে নি সে দিন। তারা যে আচরণ করেছে ঐ অন্ত্যজ পশুদেরও জ্ঞান বা অনুভব শক্তি থাকলে তারা ঘৃণায় লজ্জায় শিহরিত হ'ত। কারও পক্ষে কোন অবস্থাতেই তো এমন আচরণ কল্পনা করা সম্ভব নয়।

এই ইতরতা, এই কদর্য প্রবৃত্তির তুলনা রাজবংশে কেন—অতিতামস জীবন-যাপনকারী মদা-সুরামত্ত নিষাদ-জীবনেও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তবু সেদিনের সেই লাঞ্ছনা অবমাননার মধ্যে, আকণ্ঠ-ফেনায়িত গ্লানি ও ক্ষোভের মধ্যে, আপন-দাহী উষ্মার অসহ্য জ্বালার মধ্যেও—জীবনের শেষদিন পর্যন্ত যার আচরণ দুর্বোধ্য ও সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর বলে বোধ হবে কৃষ্ণার—তা হ'ল অঙ্গাধিপতি কর্ণর উন্মত্ত ইতরতা।

দুর্যোধন দুঃশাসন প্রভৃতি কৌরবপ্রধানদের এমন পশুবৎ আচরণের তবু কিছু কারণ আছে। ঈর্ষাই সে কারণ। জ্ঞাতিদের মধ্যে যে ঈর্ষা এ সব ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী না হলেও দুর্লভ নয়। একই বংশের দুটি শাখা—একটি ধনে মানে শৌর্যে বীর্যে প্রভাবে অপর শাখাকে বহু পশ্চাতে রেখে উন্নতির শীর্ষস্থানে উঠলে—বিশেষ যে শাখাটিকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার প্রচেষ্টায় কোন ত্রুটিই রাখেন নি হীনপ্রতিষ্ঠ শাখাটি—অপর শাখার অন্তরে তীব্র হলাহল জ্বালা অনুভূত হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু অঙ্গাধিপতির সে ঈর্ষা থাকার তো কোন কারণ নেই। সামান্য সুতপুত্র কৌরবদের করদ বা আশ্রিত রাজ্যের অধিপতি বলে স্বীকৃত হয়েছেন। কার্যক্ষেত্রে স্বাধীন শাসক হিসাবেই রাজত্ব করছেন—তাই কি যথেষ্ট নয়? যে উচ্চাশা কৌরবে স্বাভাবিক, যে আশাভঙ্গের বেদনা তাঁদের পক্ষে অসহ বোধ হতে পারে—সে আশা কি তাঁদের আশ্রিত ব্যক্তিও মনে মনে পোষণ করবেন? তিনি এত নির্বোধ, এত অবিবেচক?

তবে কি এ দ্রৌপদীর প্রতিই ক্রোধ, ব্যক্তিগত উষ্মা? সে দিনের সেই স্বয়ম্বর সভার রূঢ় অবজ্ঞাপূর্ণ প্রত্যাখ্যানের জ্বালা কি তিনি আজও ভুলতে পারেন নি? সে প্রতিহিংসাস্পৃহাই কি এমন অমানুষ ক'রে দিয়েছে তাঁকে?

তাও তো বিশ্বাস হয় না। অন্তত বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না দ্রৌপদীর। অঙ্গরাজ কর্ণের শৌর্যখ্যাতি, তাঁর অগণিত মহানুভবতার ও অকৃপণ দানের কাহিনী—যা সমগ্র ভারতখণ্ডে তাঁর জীবদ্দশাতেই কিম্বদন্তীতে পরিণত—তাঁর দীপ্ত কান্তি, আভিজাত্যপূর্ণ ব্যবহার, বিনম্র বাক্য প্রভৃতির সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচয়—কিছু বা প্রত্যক্ষ কিছু বা জনশ্রুতিতে—ঘটেছে বৈকি। তার পর এই অহেতুক অকারণ অভদ্রতা, কুৎসিত অমার্জিত বাক্যপ্রয়োগ বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না যে! এ কি কৃষ্ণা নিজ কানে শুনছেন? সে কদর্য অঙ্গভঙ্গী ও মুখভঙ্গী নিজে প্রত্যক্ষ করছেন?

এই দুটো সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যক্তিসত্তাই যে তিনি মেলাতে পারছেন না কোনমতে।

প্রাভাতিক স্নানবন্দনাদি সমাপন হতেই পাণ্ডবভ্রাতাদের আবাহন এসেছে দ্যূতক্রীড়া-সভা থেকে। সামান্য জলযোগ মাত্র ক'রেই ওঁদের যাত্রা করতে হয়েছে। তখন থেকেই পাণ্ডবদের পট্টমহাদেবী তাঁর কক্ষের বাতায়নপার্শ্বস্থ আসনে বসে আছেন—অদূরে নবনির্মিত সভাহর্ম্য লক্ষ্য ক'রে। সেদিকে চেয়ে চেয়ে তাঁর কেবলই মনে হচ্ছে ওটা একটা ক্লেদাক্ত জীব, বিষাক্ত কোন সরীসৃপের মতো। ওটা পিশাচপুরী, ওর প্রতি প্রস্তরখণ্ড বিদ্বেষের উপকরণে গ্রথিত, ওর প্রতি রন্ধ্রে সর্বনাশের ষড়যন্ত্র। যেমন এই কৌরবপ্রদত্ত তাঁর বাসগৃহ—এর অন্তঃ- ও বহিঃ- প্রদেশের বায়ুমণ্ডল যেন লক্ষ সর্পের নিঃশ্বাসে বিষাক্ত। ইন্দ্রপ্রস্থের সভাগৃহ দানবে প্রস্তুত করেছিল কিন্তু পাণ্ডবদের পুণ্যে ও সদিচ্ছায় সেখানে দেবতাদের আরাধনা সম্ভব হয়েছে, তাঁদের আবির্ভাব ঘটেছে। যজ্ঞাগ্নিতে নিবেদিত হবি স্বয়ং ব্রহ্মণ্যদেব গ্রহণ করেছেন। কিন্তু মনুষ্যনির্মিত সভাগৃহে আজ দানবীয় লীলার নিপুণ আয়োজন, মিথ্যা ও শাঠ্য এখানের সমিধ্, স্বার্থ এখানে ঋত্বিক—ঈর্ষাই অগ্নি। অপরের সর্বনাশে এ যজ্ঞের সিদ্ধি। এ আয়োজন আজ শেষ পর্যন্ত নারকীয় পৈশাচিক ঘটনাতে পরিসমাপ্তি হলেও বিস্মিত হবার কিছু থাকবে না।

অস্বস্তির সীমা থাকে না। বাহিরের নিশ্চলতা বা স্থৈর্যের মধ্যে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রের অস্থিরতা। এমন মানসিক উদ্বেগের সঙ্গে দ্রৌপদীর পূর্বপরিচয় নেই। অশুচি অবস্থায় ইষ্টবন্দনা চলবে না, স্মরণ মাত্র বিধেয়। সুতরাং পূজাপাঠের কোন আবশ্যকতা নেই। আহার্য এসেছিল—অবজ্ঞার দান, বিদ্বেষ-বিষতিক্ত বোধেই তা গ্রহণে প্রবৃত্তি হয় নি। পূর্ব রাত্রিও প্রায় অনাহারে অতিবাহিত হয়েছে, অনিদ্রাতেও বটে।

রাত্রি জাগরণে আরক্ত, উপবাসক্লান্ত-নয়না দ্রৌপদী অবদ্ধবেণী আলুলায়িত-কেশা একবস্ত্রা অবস্থায় সেই এক স্থানে বসে আছেন—অজ্ঞাত অমঙ্গল আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে।

অজ্ঞাত—অর্থাৎ বিপদ কোন্ পথে কী বেশে আসবে তা জানা নেই—কিন্তু অমূলক নয় একেবারেই। এই জ্ঞাতিশত্রুগণ স্বল্পমাত্র কৌতুকক্রীড়া বা অলস ব্যসনের উদ্দেশ্যে পাণ্ডবদের এখানে আহ্বান করেন নি। এঁরা কোন ইষ্টবুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত নন। এঁদের স্নেহ-প্রীতি আত্মীয়তাবোধ নেই কিছু মাত্র।

কখনই ছিল না। পাণ্ডবরা যখন পিতৃহীন—বাস্তবিকপক্ষে ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রিত মাত্র—তখনও ছিল না। বিষপ্রয়োগে, অগ্নিতে দগ্ধ ক'রে—নানা ভাবে হত্যার চেষ্টা করেছে কৌরবরা। আজ, সর্বোচ্চ শক্তিধর, সর্বাপেক্ষা সম্মানিত, সকলের ভীতি-উৎপাদক সম্রাটপদে অধিষ্ঠিত পাণ্ডবদের প্রতি সুপ্রবৃত্তি থাকবে—এমন ধারণা বাতুল ছাড়া কেউ করবে না।

এরা বিবেককে স্বীকার করে না, ধর্মকে উপেক্ষা করে। নিজেদের ইচ্ছার সঙ্গে যুক্তি গ্রথিত ক'রে গুরুজনদের উপদেশ নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে। জ্যেষ্ঠ রাজনীতিবিদদের বুদ্ধির অপেক্ষা নিজেদের কূটবুদ্ধি ও পাপপ্রচেষ্টায় আস্থা বেশী। সুতরাং যথাসর্বস্ব তো যাবেই—সর্বস্বান্ত হয়েই এ কালপুরী থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে হবে—তা ভারতসর্বেশ্বরী দ্রৌপদী জানেন কিন্তু তাছাড়াও আরও কী অনিষ্ট হবে, আরও কোন্ কোন্ উপায়ে এরা দীর্ঘদিনের সঞ্চিত বিদ্বেষ, হীনমন্যতা এবং অধুনা-প্রবল-প্রজ্বলিত মাৎসর্যাগ্নির শোধ তুলবে—বহু চেষ্টাতেও ঠিক সেটা কল্পনা করতে পারছেন না বলেই তাঁর এই অস্বস্তি, উদ্বেগ—রাত্রের নিদ্রা ও প্রভাতের আহার তাঁকে ত্যাগ করেছে।

সংবাদ পৌঁছনোর আয়োজন আছে।

সহদেবকে অনুরোধ ক'রে দ্রৌপদীই সে ব্যবস্থা করেছেন।

অগ্রজদের তুল্যই দ্রৌপদীর প্রণয়মুগ্ধ হওয়া সত্ত্বেও—এই কনিষ্ঠ স্বামীটির মন থেকে গুরুজনবোধজনিত সম্ভ্রমের ভাবটা যেতে চায় না কিছুতেই। এমন কি কৃষ্ণাকে প্রণয়ালিঙ্গনে বদ্ধ ক'রেও যেন তিনি সহজ বা স্বচ্ছন্দ হতে পারেন না। স্বামীর প্রাপ্য একান্ত বশ্যতা ও শ্রদ্ধা পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ কি উপভোগ করতে পারেন না। জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ জ্ঞানে মধ্যে মধ্যেই 'আর্যা' ও 'দেবী' সম্বোধন করতে যান—হয়ত সে শব্দের একাক্ষর উচ্চারিত হবার পর কৃষ্ণার উচ্ছ্বসিত কৌতুকহাস্যে সম্বিৎ ফেরে, আত্মসম্বরণ করে নেন।

এই অলোকসামান্যা, সুরলোকবাসী-ঈপ্সিতা নারীরত্ন যে সত্যই তাঁর রমণী হয়েছেন—এটা ওঁকে বক্ষলগ্ন দেখেও বিশ্বাস হতে চায় না, ধারণায় আনতে বিলম্ব হয়। বিশেষ দ্রৌপদীর গাম্ভীর্য, সহজাত কর্তৃত্বশক্তি, সর্বদিকে প্রখর দৃষ্টি ও প্রখরতর বুদ্ধি, বিরক্তিসঞ্জাত অবস্থায় বজ্রাগ্নির মতো রোষদীপ্ত দৃষ্টি ও কঠিন ভ্রূভঙ্গী দেখে সমীহ না ক'রেও পারেন না।

সহদেবের এ মনোভাব, এ দুর্বলতা দ্রৌপদী জানেন। এও জানেন যে এই কারণেই ওঁর মনস্তুষ্টি করার জন্য তিনি সদা ব্যস্ত। কৌরবদের অন্তঃপুরে প্রবেশ

করার পর থেকে স্বামীদের সঙ্গে ওঁর সাক্ষাৎ হয় নি। ঋতুস্নান করার পূর্বে সাক্ষাৎ করাও নিষিদ্ধ। কিন্তু পত্রালাপে অসুবিধা নেই। দ্রৌপদী সেই সুযোগ নিয়েই সহদেবকে একটি অনুরোধলিপি পাঠিয়েছেন। যাতে তিনি দুটি বুদ্ধিমতী প্রত্যুৎপন্নমতিত্বসম্পন্না সুদক্ষা সংবাদবাহিকা নিয়োগ করেন—যারা এক দণ্ড অন্তর ক্রমান্বয়ে তাঁকে সভাগৃহের সংবাদ পৌঁছে দিয়ে যাবে। সহদেব পত্র-প্রাপ্তি মাত্র সে ব্যবস্থা করেছিলেন। শুধু তাই নয়—এই বিশেষ দূতীরা যাতে অবাধে সভাগৃহে গমনাগমন করতে পারে সেজন্য প্রবেশাধিকারের সাংকেতিক শব্দও জানিয়ে দিয়েছিলেন।

সে সংবাদ নিয়মিতই আসছে।

তার কোনটাই শুভ নয়—আশ্বাসদায়ক তো নয়ই।

যুধিষ্ঠির কেবলই পরাজিত হচ্ছেন। দুর্যোধন ক্রীড়ার আহ্বায়ক এবং পণ-সরবরাহক হলেও তাঁর প্রতিভূ রূপে 'অক্ষপাতন করছেন সৌবল শকুনি। তিনি যে সহজ সত্যপথে ক্রীড়া করছেন না, কপটতার আশ্রয় নিচ্ছেন, সে বিষয়ে যুধিষ্ঠিরের সংশয়মাত্রও নেই, তাঁর সে নিশ্চিত বিশ্বাস তিনি অদ্ব্যর্থ ভাষায় প্রকাশও করেছেন, তত্রাচ এ ক্রীড়া থেকে নিবৃত্ত হন নি। অক্ষের নেশা তাঁকে মোহগ্রস্ত করছে।

সেই তথ্যই বোধ করি অদ্যকার চরম দুঃসংবাদ।

অন্তত দ্রৌপদীর কাছে। এর মধ্যেই তিনি নিয়তির নির্মম ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছেন। পরমা নির্ঋতির অতল অন্ধ আহ্বান।

যুধিষ্ঠির প্রথম পণ রাখেন তাঁর কণ্ঠস্থ বিশ্বে অদ্বিতীয়, কুবেরেরও ঈর্ষা-আনয়ন-কারী অমূল্য মণিহার। দুর্যোধন কি রাখলেন তা নির্দিষ্ট ক'রে বলেন নি, শুধু বলেছিলেন, 'আমার বিস্তর মণিরত্ন আছে, তুমি জয়লাভ করলে, পণের অভাব হবে না।'

অবশ্য তাঁর পণ নির্ধারণের আবশ্যকও হ'ল না। কারণ কাপট্য-পারঙ্গম শকুনি নিমেষপাতমাত্র সময়ে সে পণ জিতে নিলেন। অতঃপর যুধিষ্ঠির সহস্র স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ কয়েক শত পেটিকা পণ রাখলেন। সেও শকুনি তৎক্ষণাৎ কপট পাশা নিক্ষেপে তা জিতে নিলেন। অতঃপর ক্রমান্বয়ে মহারাজ-চক্রবর্তীর মণিরত্নশোভিত স্বর্ণ রথ ও তাঁর তুষার-শুভ্র কুমুদকান্তি অশ্বঅষ্টক*, সুন্দরী

* যুধিষ্ঠির কহিলেন, জলদ ও জলধিতুল্য নিনাদযুক্ত, সহস্র রথের বেগবিশিষ্ট, ব্যাঘ্রচর্মাবৃত, সুপ্রতিষ্ঠিত, সুন্দর চক্র ও উপস্কর সমন্বিত, শ্রীমান, কিঙ্কিণী-জালভূষিত, হৃদয়-হ্লাদন, যে রাজরথ আমাদিগকে এখানে আনয়ন করিয়াছে এবং কোন ভূচর ব্যক্তি যাহাদের পদবিক্রম হইতে নিষ্কৃতি

সালঙ্কারা চন্দনচর্চিতা নৃত্যগীতাদি-নিপুণা এক লক্ষ তরুণী দাসী; কর্মকুশল নম্রস্বভাব মেধাবী এক লক্ষ সুদর্শন তরুণ দাস; এক সহস্র রণহস্তী; স্বর্ণময় ধ্বজাপতাকাশোভিত কয়েক সহস্র রথ—যার রথীরা যুদ্ধ না করতে হলেও মাসিক সহস্র স্বর্ণ বেতন পান; গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ অর্জুনকে যে সব বিচিত্র বর্ণ অশ্ব দিয়েছিলেন; বহু সহস্র সাধারণ রথ, শকট, অশ্ব; ষষ্টি সহস্র বীর সবলদেহ যোদ্ধা; কয়েকশত ধনভাণ্ডার—এ সকলই শকুনি তাঁর বিশেষ-কৌশলে-নির্মিত অক্ষ দ্বারা জয় ক'রে নিলেন। স্থিতধী যুধিষ্ঠিরের একবারও মনে হ'ল না যে তিনি ঐ অক্ষ পরিবর্তন করতে বলেন, অথবা তাঁর নিজস্ব অক্ষ ব্যবহারের দাবি জানান।

ক্রীড়ার গতি ও ধর্মরাজের মোহমত্ততা দেখে—নিতান্ত নিয়তিসৃষ্ট বিভ্রান্তি ছাড়া যাকে আর কোন আখ্যা দেওয়া যায় না—সভাস্থ বয়স্ক ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা চিন্তিত হলেন। যাঁরা ধর্মভীরু সৎ প্রকৃতির লোক তাঁরা এই প্রত্যক্ষত কপট ক্রীড়ার পরিণাম বুঝে ভবিষ্যতের মহা সর্বনাশ কল্পনায় চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

শেষে বিদুর আর থাকতে না পেরে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, 'মহারাজ, আপনার ঘোর বিপদ উপস্থিত, এ সময় আপনি উদাসীন থাকবেন না। স্মরণ করুন—এই দুর্যোধন ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র গোমায়ুর* মতো রব করেছিল। তখনই জানি এ জাতক ভারতবংশ ধ্বংস করবে। কুরুরাজ, নিজের দেহের কোন অংশ অচিকিৎস্য-ভাবে বিষাক্ত হলে তাও তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করতে হয়। আপনি জানেন, অন্ধক যাদব আর ভোজবংশীয়রা তাঁদের আত্মীয় কংসকে ত্যাগ করেছিলেন, তাঁদেরই নির্দেশে শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করেন। মহারাজ, আপনি আদেশ দিন, অর্জুন দুর্যোধনকে বধ করলে কৌরবগণ ও এ রাজ্য অমঙ্গলমুক্ত হবে। একজনকে ত্যাগ করলে যদি কুলরক্ষা হয়—সে নির্মমতাই প্রাজ্ঞদের বাঞ্ছনীয়; কলহমত্ত বৃষ যেমন নিজের শৃঙ্গ ভঙ্গ ক'রে ভবিষ্যতের নিরাপত্তা নষ্ট করে—দুর্যোধনও তেমনি নিজের পুরী ও রাজ্যের মঙ্গল দূর করছে। এখনও সময় আছে আপনি তাকে ত্যাগ করুন।'

সভাস্থ অনেকেই তাঁর অনুমোদন ক'রে প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করলেন কিন্তু দুর্যোধনের উষ্মার সীমা রইল না। তিনি বিস্তর কটু বাক্য বলে বিদুরকে সভাগৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে আদেশ দিলেন।

পাইতে পারে না, কুমুদের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট, রাষ্ট্রপ্রশংসিত এইরূপ উৎকৃষ্ট অষ্ট অশ্ব যাহাকে বহন করে সেই জয়শীল রথবর এবার আমার পণ রহিল। [বর্ধমান সংস্করণ মহাভারত]

* শৃগাল

একটির পর একটি এমনি দুঃসংবাদ পাচ্ছেন ভারতসম্রাজ্ঞী দ্রৌপদী।

তাঁর ললাট ও হস্ততালু স্বেদাক্ত হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যেই। অপরিসীম পিপাসায় বক্ষ পর্যন্ত যেন শুষ্ক হয়ে উঠেছে।

আরও সাংঘাতিক দুঃসংবাদ আসবে—এ তিনি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন। ধর্ম যখন মোহান্ধতা, মূঢ়তা, ভ্রান্তি ও জাড্য দ্বারা আচ্ছন্ন হন তখন আর শ্রেয় কোথায়? শ্রী ও কল্যাণ তো অন্তর্হিত হবেনই।

সংবাদ পেলেনও।

নিয়তির নির্দয় নির্দেশের মতোই তা অব্যর্থ ও অমোঘ ভাবে এসে আঘাত করতে লাগল তাঁর সহ্যশক্তিকে।···

শকুনি সবিদ্রূপে প্রশ্ন করলেন, 'রাজন! তোমার তো প্রায় তাবৎ ধনই আমাদের করায়ত্ত হ'ল। পণ রাখার মতো আর কিছু আছে নাকি?'

যুধিষ্ঠির অন্ধের মতোই তাঁর এই সুচিন্তিত বিদ্রূপের ফাঁদে পা দিলেন। বললেন, 'আমার ঐশ্বর্য অপরিমেয়, অসংখ্যেয়। তুমি অযুত প্রযুত কোটি অর্বুদ এমন কি মধ্য পরার্ধ* যা পণ চাও আমি তাই রাখছি।'

সেও যখন এক নিমেষে স্বামী বদল করল তখন যুধিষ্ঠির বললেন, 'পর্ণাশা থেকে সিন্ধু নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে আমার যে গো-মেষ-মহিষ প্রমুখ পশুসম্পদ আছে—এবার তাই পণ রাখলাম।'

অতঃপর রাজ্যের যা অবশিষ্ট পণ-যোগ্য সম্পদ ও নরনারী—তাও যখন গেল তখন ভ্রাতাদের অঙ্গের মহামূল্য অলঙ্কার পণ রাখলেন। কিন্তু পুষ্পদণ্ডের দ্বারা যেমন প্রবল বন্যার জলে বাধা দেওয়া যায় না—তেমনি এই অবশিষ্ট সামান্য পণে সর্ববিনষ্টির আসন্নতাকে প্রলম্বিত করা গেল না!

ধন ধেনু রথ অশ্ব দাস দাসী সব গেল। অবশিষ্ট পঞ্চ ভ্রাতা।

যুধিষ্ঠির এবার উন্মত্তের মতো তাঁদেরই পণ রাখতে লাগলেন।

নকুল, সহদেব, ধনঞ্জয়—শেষে ভীমও, এই ভাবে অত্যল্প সময়ে শত্রু-হস্তগত হলেন।

শেষে যুধিষ্ঠির নিজেকেই পণ রাখলেন। যেন সর্বনাশকে অগ্রবর্তী হয়ে অভ্যর্থনা করাতেই আগ্রহ তাঁর।

সে পণও—কৌরবপক্ষের সভাষদ পারিষদ তোষামোদকারীদের বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে—জিতে নিলেন শকুনি।

কিন্তু তাতেও বিরত হলে চলবে না তাঁর।

* কোটি, অর্বুদ, খর্ব, নিখর্ব, শঙ্খ, পদ্ম, মহাপদ্ম, মধ্য, পরার্ধ।

এরা পথের ভিখারী হয়েছে, তাঁদের দাস হয়েছে—কিন্তু অবমাননার চূড়ান্ত হয় নি এখনও।

অন্তঃপুরের মর্যাদা বিনষ্ট করতে না পারলে তা হবেও না।

শকুনি ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে ব্যঙ্গভরা কণ্ঠে বললেন, 'এবার? আর তো কিছুই পণ রাখার মতো রইল না তোমার। এক বাকি আছেন তোমাদের প্রেয়সী—পাঞ্চালনন্দিনী। তা—লোকে বলে স্ত্রীভাগ্যে ধন। দ্যাখো—তাঁকে পণ রেখে ভাগ্য পুনরুদ্ধার করতে পার কি না।'

যুধিষ্ঠির আর দ্বিধামাত্র করলেন না, কর্তব্য-অকর্তব্য চিন্তার অবকাশ নিলেন না, ন্যায়-নীতির অনুশাসন চিন্তা কি বিচার করলেন না—তৎক্ষণাৎ সেই পণই রাখলেন—

এবং পরাজিত হলেন!*

শকুনি 'তাও জিতে নিলাম' এই বাক্যে উচ্চারণ করা মাত্র—সমস্ত সভা অকস্মাৎ কিছুক্ষণের মতো প্রায় প্রস্তরীভূত ও নিস্তব্ধ হয়ে গেল; তারপর সভাস্থ প্রবীণ ও পক্ষপাতশূন্য সমস্ত লোক একবাক্যে 'ধিক্! ধিক্!' এই দুটি শব্দ উচ্চারণ করলেন। যে সকল করদ ও মিত্ররাজ্যের অধিপতি উপস্থিত ছিলেন—তাঁরা লজ্জায় ও ক্ষোভে মাথা হেঁট করলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি প্রধানদের প্রচুর স্বেদ নির্গত হতে লাগল। দ্বারপ্রান্তে অপেক্ষমাণ বিদুর বার বার মস্তকে করাঘাত ক'রে হাহাকার ক'রে উঠলেন।

কেবল ধৃতরাষ্ট্রই আর মনের ভাব বাহ্যিক সৌজন্যে আবরিত করতে না পেরে ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করতে লাগলেন, 'আমাদেরই জয়লাভ হ'ল তো? আমরাই জিতলাম তো?'

শকুনি উত্তর দিলেন, 'নিশ্চয়! আপনি বিজয়োৎসবের আদেশ দিন, যাজ্ঞসেনী

---

* যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'যিনি না খর্বাকৃতি, না দীর্ঘা, না কৃশা, না স্থূলা, সেই নীলকুটিলকুন্তলা, শারদপদ্মপলাশনয়না, শারদোৎপল-গন্ধা, রূপে শারদোৎপলসেবিনী লক্ষ্মীর এবং লাবণ্য-সৌভাগ্যাদিরূপিণী শ্রীর সদৃশা পাঞ্চালীর দ্বারা তোমার সহিত ক্রীড়া করিতেছি। হে সৌবল! পুরুষ লক্ষ্মীতুল্য গুণশালিনী যাদৃশী স্ত্রী কামনা করে, কি দয়া। কি রূপ-সম্পত্তি, কি শীল-সম্পত্তি সর্বাংশেই যিনি তাদৃশা হইতে পারেন: মনুষ্য অনুকূলা, প্রিয়ম্বদা ও ধর্মকামার্থ-সিদ্ধি প্রযোজিকা যাদৃশী স্ত্রী ইচ্ছা করে—তাদৃশ সমস্ত গুণেই যিনি উপপন্না হইয়াছেন; যিনি সকলের শেষে শয়ন ও অগ্রে জাগরণ করেন এবং গোপাল ও মেষপাল পর্যন্ত সকল লোকেরই তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন; যাঁহার ঘর্মবিন্দুযুক্ত মুখমণ্ডল শিশির-শোভিত কমল ও মল্লিকার ন্যায় শোভা পায়; বেদীসদৃশ সুমধ্যমা, দীর্ঘকেশা, তাম্রবদনা, অনতিলোমান্বিতা—এবম্বিধা সর্বাঙ্গসুন্দরী পাঞ্চালনন্দিনী দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিতেছি।' [মহাভারত—বর্ধমান সংস্করণ]

এখন আমাদের পণে ক্রীতা-দাসী।'

দুর্যোধন পূর্বলাঞ্ছনা-দৈন্য-প্রতিশোধ উল্লাসে ও গর্বে একবার নিজের গুম্ফ মার্জনা ক'রে নিয়ে বিদুরকেই ডাকলেন আবার, 'ক্ষত্তা, আপনি যাজ্ঞসেনীকে এখনই এ সভায় নিয়ে আসুন, তিনি আমার পদসেবা করবেন।'

বিদুর ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 'মূঢ়, বিক্রীত ব্যক্তির কোন সম্পত্তি থাকে না, যুধিষ্ঠিরের এ পণ রাখার কোন অধিকারই নেই। এ তোমার বিজয় লাভ নয় নিদারুণ পরাজয় মাত্র। বিষধর সর্প তোমার সম্মুখে ফণা বিস্তার করেছে—তুমি তাকে কুপিত ও উত্তেজিত ক'রে অতিশোচনীয় মৃত্যুকে আহ্বান করছ। তুমি মৃগ হয়ে ব্যাঘ্রকে লাঞ্ছিত করতে চাইছ! মেষশাবক হয়ে সিংহের গহ্বরে প্রবেশ ক'রে স্পর্ধা প্রকাশের অভিলাষী হয়েছ! এভাবে মৃত্যুর দিকে ধাবমান হয়ো না; সে তো আছেই, অনিবার্য, তাকে আহ্বান ক'রে এনে লাভ কি? তুমি যে বাক্য উচ্চারণ করেছ তা শ্রবণেও মহাপাপ। মূর্খ, এখনও নিজেকে সম্বরণ ও সংযত কর, আমি তোমাকে সতর্ক করছি।'

দুর্যোধন অধিকতর রুষ্ট হয়ে দ্বারদূত এক প্রাতিকামীকে ডেকে আদেশ দিলেন, 'ক্ষত্তা বিদুর কেবল নিজকুশল-চিন্তা ও আমাদের অবনতি কামনা করেন। তোমার কোন ভয় নেই, তুমি গিয়ে আমাদের দাসী দ্রৌপদীকে এখানে নিয়ে এস। তিনি আমাদের সেবা করবেন।'

প্রাতিকামী লজ্জায় অধোবদন হয়ে আশঙ্কায় কম্পিত হতে হতে গিয়ে অত্যন্ত দীন ও অনুতপ্তভাবে অগত্যা পাঞ্চালীকে সে আদেশ নিবেদন করল।

পাণ্ডবকুললক্ষ্মী দ্রৌপদীরও সর্বাঙ্গ কম্পিত হচ্ছিল—তবে সে কোন শঙ্কায় নয়—ক্ষোভে ও রোষে। কারণ কিছু পূর্বে তিনিও এ সংবাদ পেয়েছেন।

তিনি ক্ষোভরুদ্ধ কণ্ঠে শুধু বললেন, 'প্রতিহারী, মনে হচ্ছে তুমি কৌরবদের দূতরূপে প্রেরিত হলেও আমার সম্বন্ধে করুণার্দ্র। আমার অনুরোধ, তুমি একবার সভায় ফিরে যাও, ধর্মরাজকে প্রশ্ন কর—তিনি কি পূর্বে নিজেকে পণ রেখে পরাজিত হয়েছেন?—না তার পূর্বে আমাকে পণ রেখেছিলেন? নিজে পরাজিত হওয়ার পরও কি আমাকে তাঁর পণ রাখার অধিকার ছিল?'

প্রাতিকামী ন্যায়ের এত সূক্ষ্ম ও কুটিল নীতি অবগত নয়, সে কিছুক্ষণ বিহ্বলের মতো দাঁড়িয়ে থেকে সভায় ফিরে গেল—এবং যুধিষ্ঠিরের মুখের দিকে না চেয়েই প্রশ্নটি উপস্থাপিত করল।

যুধিষ্ঠির পূর্বেই অধোমুখে নির্জীব জড়পদার্থের মতো বসে ছিলেন, সেই ভাবেই

স্থির হয়ে বসে রইলেন, এ প্রশ্ন তাঁর কর্ণগোচর হ'ল কিনা বোঝা গেল না। উত্তর দিলেন দুর্যোধনই, অসহিষ্ণুভাবে বলে উঠলেন, 'তাঁর যা কিছু প্রশ্ন তা তিনি সভায় এসে নিজেই করুন।...যাও, নিয়ে এস তাঁকে।'

প্রাতিকামী বেতনভোগী ভৃত্য, আদেশ পালন ব্যতীত তার গত্যন্তর নেই। সে আবারও পাংশুমুখে স্খলিত পদক্ষেপে ফিরে এসে পাঞ্চালীকে যুধিষ্ঠিরের নিরুত্তরতা ও দুর্যোধনের আদেশ জানাল। দ্রৌপদী উষ্মায় ও অপমানবোধে অগ্নিশিখার মতোই মূর্তি ধারণ করেছেন ; সেদিকে চেয়ে—যারা তাঁর শাসনকর্ত্রীর রূপেই অভ্যস্ত—তাঁরা অবশ্যই ভীত বোধ করবে।

পাঞ্চালনন্দিনী কিন্তু কোন কটূ বা কুবাক্য বললেন না। বরং ধীরভাবে মিনতির ভঙ্গীতেই বললেন, 'প্রাতিকামী, আমি অনুনয় করছি, তুমি আরও একবার সে সভায় যাও, যদিচ তার প্রতি অণুপরমাণু পাপবুদ্ধি শাঠ্য ও বিদ্বেষ দ্বারা গঠিত তবু আশা করছি কিছু সৎবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত আছেন যাঁরা ন্যায়নীতির মর্যাদা সম্বন্ধে অনবহিত নন, আমার প্রশ্ন তাঁদেরই কাছে : তুমি তাঁদের জিজ্ঞাসা ক'রে এস—আমি কৌরবদের বিজিতা কিনা, ওঁদের এ আদেশ করার কোন অধিকার আছে কিনা!'

প্রাতিকামীর অবস্থা শোচনীয়। দুর্যোধনের করাল কোপকে কে না ভয় করে! অথচ এখানে এই মহিমময়ী নারীর অনুরোধ বা আদেশ অমান্য করার শক্তিও তো তার নেই! সে যজ্ঞে-উৎসর্গীকৃত পশুর মতোই কম্পিত ধীর পদক্ষেপে এসে সভার মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে পাণ্ডব-অধিরাজ্ঞীর বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করল!

কিন্তু উত্তর দেবে কে?

ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি প্রবীণগণ সকলেই লজ্জাবনত শিরে নীরব থেকে ললাটের ঘর্ম মোচন করতে লাগলেন। অর্জুন স্বীয় অধরোষ্ঠ দন্তে পিষ্ট করে উচ্ছ্বসিত রোষবহ্নির বহির্পথ রুদ্ধ করার প্রচেষ্টায় ওষ্ঠ দুটি রক্তাক্ত ক'রে তুললেন, ভীম নিষ্ফল ক্ষোভে শত্রুর পরিবর্তে কক্ষকুট্টিমের প্রস্তরখণ্ডেই মুষ্ট্যাঘাত করতে লাগলেন বারবার। শুধু যুধিষ্ঠির পানীয়-প্রার্থনা-ছলে স্বপক্ষীয় এক বিশ্বস্ত অনুচরকে কাছে ডেকে তাকে দিয়ে গোপনে বলে পাঠালেন, পাঞ্চালী যেন এই রজস্বলা একবস্ত্রা অবস্থাতেই সভামধ্যে এসে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে করুণা ভিক্ষা করেন।

দূত গিয়ে সে নির্দেশ নিবেদন করতে এতক্ষণ পরে যেন দ্রৌপদীর নয়ন-কোণের উদ্যতবজ্র বিদ্যুতাগ্নি নির্বাপিত হয়ে সেখানে বর্ষণ শুরু হ'ল। তিনি বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বললেন, 'ঐ পাপিষ্ঠরা কত কি লাঞ্ছনা করবে তা এখনও জানি না, কিন্তু আমার ক্ষত্রিয় ভর্তা এই প্রস্তাব পাঠিয়ে যে অপমান করলেন আমাকে—

এমন আর কেউ কোন দিন করেন নি। আমার ভাগ্যকেই ধিক্! শুনেছি আমি যজ্ঞসম্ভবা—হায়! সে যজ্ঞাগ্নিতেই আমার মৃত্যু হ'ল না কেন!'

এধারে দুর্যোধন—এই অবিশ্বাস্য অপ্রত্যাশিত কল্পনাতীত সিদ্ধি হস্তগত হওয়া সত্ত্বেও তা উপভোগে অযথা বিলম্ব হওয়ায়—অধৈর্য হয়ে রূঢ় কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'এসব বাগ্‌বিস্তারে তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। অধিকারও নেই। তুমি পুনশ্চ সেখানে গিয়ে আমাদের সুস্পষ্ট আদেশ জানাও। সহজে আসতে না চান—তুমি বলপূর্বক তাঁকে এখানে নিয়ে এস।'

'বলপূর্বক' শব্দটি যেন বেত্রাঘাতের মতোই আঘাত করল সভাস্থ নিরপেক্ষ জনদের। প্রাতিকামীও বাত্যাতাড়িত বেতসপত্রের মতো কেঁপে উঠল একবার, তারপর জোড়করে করুণ কণ্ঠে বলল, 'আপনি স্বামী, আপনার অবাধ্য হলে আপনি আমাকে যে কোন কঠিন শাস্তি দিতে, এমন কি বধ করতেও পারেন। আপনি সেই দণ্ডই দিন, আমি বিনা অনুযোগে মাথা পেতে নেব—কিন্তু তবু এ আদেশ পালন করতে পারব না।...ভারতসম্রাজ্ঞীকে বলপূর্বক এই পুরুষদের সভায় আনয়ন করার সাহস বা সাধ্য আমার নেই।'

কৌরব এবং তাঁদের স্তাবক, অনুগৃহীত ও আশ্রিত ব্যক্তিগণ ব্যতীত সে সভায় প্রায় প্রত্যেকেই 'সাধু' 'সাধু' রবে সেই সামান্য দীনবংশোদ্ভব প্রাতিকামীকে অভিনন্দিত করল। বিদুর এসে তাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন।

কিন্তু সেই অপরিসীম চাঞ্চল্য ও সাধুবাদের শব্দকে অতিক্রম ক'রে কার পরুষ কর্কশ কণ্ঠ ধ্বনিত হয়ে উঠল, 'এই নীচকুলোদ্ভব মূর্খ প্রাতিকামী বৃথাবলদর্পিত অতিভোজী ভীমসেনকে দেখে মৃত্যুভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়েছে! ওর কর্ম নয়। দুঃশাসন, তুমি যাও, বলপূর্বক কেশাকর্ষণ ক'রে আমাদের দাসী দ্রৌপদীকে এ সভায় নিয়ে এস!'

কার কণ্ঠ, সে কোলাহলের মধ্যে অনেকেই বুঝতে পারলেন না। দুর্যোধনের কি—না অঙ্গাধিপতি কর্ণর?

আর যে দুর্গতিই কল্পনা ক'রে থাকুন দ্রৌপদী—দুঃশাসনের এ ধৃষ্টতা, এত বড় দুঃসাহস হবে তা ভাবতে পারেন নি। যুধিষ্ঠিরের সম্পর্ক ধরলে তিনি ওর জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়া, মাতার সমান মাননীয়া। পাদবন্দনার যোগ্যা। দুঃশাসনের কলুষ-হস্তস্পর্শে তাই তিনি যে কেঁপে উঠেছিলেন তা যতটা রোষে, বোধ হয় ঠিক ততটাই বিস্ময়ে।

তবু তিনি দুঃশাসনের রাজরক্তকে জাগ্রত করার জন্যই করুণ কণ্ঠে বলতে গিছলেন, 'দুঃশাসন, আমি বর্তমানে রজস্বলা, একবস্ত্রা। এ অবস্থায় উত্তরীয় ব্যবহার যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি নিষিদ্ধ গুরুজন বা পরপুরুষের সম্মুখীন হওয়া। তুমি এ ভাবে আমাকে নিয়ে যেও না। তোমারই বংশের বধূ আমি, সেটা স্মরণ করো।'

কিন্তু সুরা ও বিজয়গর্ব—এই দুই উগ্র মাদকে উন্মত্ত আরক্ত-লোচন দুঃশাসন পরুষ কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'থাম্ থাম্। তুই এখন কৌরবদের দাসী। আমাদের যা ইচ্ছা, যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে হবে ; যেখানে বাস করতে বলব সেখানেই বাস করতে হবে। রাজকুমারী বা রাজকুলবধূর যে মর্যাদা তা তুই এখনও প্রত্যাশা করছিস ? তোর স্পর্ধাও তো কম নয় !' বলতে বলতে হা-হা ক'রে প্রমত্ততারই হাসি হেসে দ্রৌপদীর সেই তরঙ্গায়িত ঈষৎ নীলাভ-কৃষ্ণবর্ণ সুবিপুল কেশরাশি মুষ্টিবদ্ধ ক'রে সেই কক্ষের নির্গমন পথের দিকে আকর্ষণ করতে লাগলেন।

দ্রৌপদী নিতান্ত বলহীনা নন। পাঞ্চাল দেশের নারীরা স্বভাববলিষ্ঠা—তিনি আকস্মিক বলপ্রয়োগে দুঃশাসনের কবলমুক্ত হয়ে ছুটে গেলেন যেখানে কুরু-কুলনারীরা নির্বাক বিস্ময়ে, হতবুদ্ধি ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভীতনেত্রে এই অঘটিতপূর্ব দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছিলেন। তাঁদের সম্মুখে গিয়ে অপমানকম্পিত রোদনরুদ্ধ কণ্ঠে আবেদন জানালেন, 'তোমরাও রাজবংশ ক্ষত্রিয়বংশের কন্যা, বধূ,—এই মর্মান্তিক অপমানের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করো। আমি তোমাদের দাসীরূপে তোমাদের সেবা করতে প্রস্তুত আছি। আমাকে এই ভাবে সাধারণ পুংশ্চলীর মতো প্রকাশ্য সভাগৃহে সহস্র ইতরদৃষ্টির সম্মুখে নিয়ে যেতে দিও না।'

রাজমাতা গান্ধারী সেখানে ছিলেন না। ভানুমতীও না। অবশ্য তিনি উপস্থিত থাকলেও তাঁর হৃদয় বিগলিত হ'ত কিনা সন্দেহ। যাঁরা উপস্থিত

ছিলেন তাঁরা দুঃশাসনের সেই ভয়ঙ্কর মুখভাব দেখে ও অভব্য বাক্যাদি শুনে কিছু বলতে সাহস করলেন না। অবশ্য সে অবসরও বিশেষ পেলেন না, তার পূর্বেই পশ্চাদ্ধাবী দুঃশাসন ছুটে এসে পুনরপি কৃষ্ণার কেশরাশি দৃঢ়তর মুষ্টিতে আবদ্ধ ক'রে সবলে আকর্ষণ করতে করতে জনবহুল পরিজন-পরিবৃত পথ অতিক্রম ক'রে সভাগৃহে উপনীত হলেন।

এহেন অশালীন, রাজবংশ বিধিবহির্ভূত আচরণে প্রায় সকলেই লজ্জা পেলেন, এমন কি দুর্যোধনও অপর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে নীরব রইলেন—কেবল কর্ণই উচ্চরবে দুঃশাসনের এই দুর্মতির ভূয়সী প্রশংসা ক'রে তাঁকে অধিকতর উত্তেজিত করতে লাগলেন।

একেবারে সভার মধ্যস্থলে পৌছে দ্রৌপদী আবারও প্রাণপণ বলপ্রয়োগে দুঃশাসনের মুষ্টিমুক্ত হলেন। তারপর একবার মাত্র বর্ষণবিদ্যুৎভরা দৃষ্টিতে লজ্জাবনতমুখ স্বামীদের দিকে তাকিয়ে সভাস্থ প্রবীণ ও কুলপ্রধানরা যেদিকে বসেছিলেন, সেইদিকে ফিরে বললেন, 'আপনারা আমার গুরুজন—শিক্ষা, দীক্ষা, ন্যায়বিচার, ধর্মবুদ্ধি, সকল দিকেই শ্রেষ্ঠ—আপনাদের কাছে আমার একটি প্রশ্ন, আশা করছি উত্তমরূপে বিচার ক'রেই উত্তর দেবেন,—নিজে পরাজিত হবার পরও মহারাজচক্রবর্তী যুধিষ্ঠিরের কি এই কপট দ্যূতক্রীড়ায় আমাকে পণ রাখার অধিকার ছিল?'

নিষ্ফল-রোষদগ্ধ প্রতিকারশক্তিহীন ভীষ্ম ললাটের ঘর্ম মোচন ক'রে বললেন, 'ভাগ্যবতী, এ প্রশ্ন তুমি করার পূর্বে আমার মনেই উপস্থিত হয়েছে, কিন্তু এর যথার্থ মীমাংসায় এখনও উপনীত হতে পারি নি। ধর্মের বিচার অতি সূক্ষ্ম, তার সত্যাসত্য নির্ণয় করা আমাদের সাধ্যাধীত। বিজিত বা বিক্রীত ব্যক্তির কোন কিছুতেই অধিকার থাকে না, অথচ স্ত্রীর উপরও স্বামীর চিরন্তন অধিকার। যদি তাঁর কিছু না থাকে—তাঁর স্ত্রীরই বা থাকবে কি ক'রে? সেদিক দিয়ে বিচার করলে এই স্বামীদের পরাজয়ের সঙ্গেই তোমার স্বাধীন সত্তা বিলুপ্ত হয়েছে। যুধিষ্ঠির পরম ধার্মিক, শ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞ, তিনি যখন তোমাকে পণ রেখেছেন তখন তাঁর সে অধিকার নেই তাই বা বলি কি ক'রে?···তুমি কপট দ্যূতক্রীড়ার অভিযোগ এনেছ—সে বিচারের কথাও যুধিষ্ঠিরের। হতে পারে শকুনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ কিতব, সুচতুর, ও অক্ষক্ষেপণকুশলী। যুধিষ্ঠির তাঁর যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী নন। এতক্ষণ খেলার পরও তিনি যদি প্রতিবাদ ক'রে বা প্রতিনিবৃত্ত হয়ে না থাকেন তাহলে এ অভিযোগই বা করা যায় কি ক'রে?'

আবারও কর্ণের যেন চেষ্টাকৃত রূঢ় কণ্ঠ ধ্বনিত হয়—'দুঃশাসন, এই দাসী ও এক জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের প্রলাপোক্তি এত মনোযোগ দিয়ে শোনার কি আছে? দ্রৌপদী যে আমাদের দাসী হয়েছে সেটা তাকে ভাল ভাবে অনুভব করতে দাও।'

আরও একবার—যেন চরম বিপদে পরম অভয় অন্বেষণের মতোই স্বামীদের দিকে আর্ত দৃষ্টিতে চাইলেন দ্রৌপদী। কিন্তু তাঁরা সকলেই মাথা নত ক'রে বসে—তাঁদের দৃষ্টিতে এ বিপন্ন আবেদন পৌঁছল না।

কর্ণ বোধ করি অনিমেষপাত-নেত্রে কৃষ্ণাকে লক্ষ্য করছিলেন, ওঁর এ নিঃশব্দ আবেদনও তাঁর দৃষ্টি এড়াল না। তিনি নিষ্ঠুর কৌতুকে হা-হা ক'রে হেসে বললেন, 'ঐ নির্জীব কাপুরুষ দাসগুলোর দিকে তাকিয়ে কোন লাভ হবে না পাঞ্চালী। ওরা কি মানুষ? মেষপাল বললেও বুঝি তাদের অপমান করা হয়। পতি নির্বাচনের সময় তুমি সুবিবেচনার পরিচয় দাও নি। সেদিন দুর্যোধনকে বরণ করলে আজ এ দুর্গতি হ'ত না।'

এবার ভীমসেন আর আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না। বিপুল দুঃখের উপর এই মর্মান্তিক, কঠিন আঘাত স্ফুলিঙ্গাঘাতে অগ্নি-প্রজ্বলনের কাজ করল। তিনি জ্যেষ্ঠাগ্রজকে সম্বোধন ক'রে বললেন, 'মহারাজ, সসাগরা পৃথিবী জয় ক'রে যে ধনরত্ন আহরিত হয়েছিল, ভুবনবিজয়ী নৃপতিগণ স্বেচ্ছায় প্রীতিবশে যে সব অমূল্য দ্রব্যাদি উপহার দিয়েছেন—তৎসমস্ত সহ আমাদের স্বপ্রতিষ্ঠিত রাজ্য, ঐশ্বর্য, এমন কি আপনার ভ্রাতাদেরও আপনি পণ রেখে পরাজিত হয়েছেন—তাতেও আমার তাদৃশ ক্রোধ উৎপন্ন হয় নি। কারণ আপনি এ সমুদয় এবং আমাদেরও প্রভু। কিন্তু এবার আমাদের সহের সীমা অতিক্রম করেছে। দ্যূতক্রীড়াপ্রিয় ব্যক্তিদের অনেক রক্ষিতা থাকে—তাঁরাও সেই বেশ্যাদের প্রতি স্নেহবশতঃ কখনও তাদের পণ রাখেন না। আপনি আপনার প্রিয়তমা ভার্যা আমাদের কুললক্ষ্মীকে পণ রাখলেন। সহদেব, অগ্নির আয়োজন কর, আমি ওঁর ঐ হাত, যে হাতে স্ত্রীকে পণ রেখে তিনি অক্ষক্ষেপণ করেছেন—দগ্ধ করব।'

উত্তেজনায় ভীমসেন উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, অর্জুন ওঁর বাহুমূল ধরে নিরস্ত ক'রে বললেন, 'ছিঃ! আর্য ভীমসেন, আপনি ভাগ্যের প্রতারণায় উত্তেজিত হয়ে জ্ঞান হারিয়েছেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম্বন্ধে এ ধরনের বাক্য উচ্চারণ করা এমন কি কল্পনা করাও গর্হিত। আমরা এখন প্রবল শত্রুর সম্মুখীন, ভাগ্য আমাদের উপর বিরূপ, এ অবস্থায় আমাদের ঐক্য ও শৃঙ্খলা বিনষ্ট হওয়ার অর্থ প্রকারান্তরে তাদেরই বৃহত্তর জয়লাভ, তাদের হাতে আঘাতের নূতন অস্ত্র তুলে দেওয়া। ভেবে দেখুন, এ সময়ে কোনরূপ অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ পেলে শত্রুরা উৎসাহিত হবে,

আমরাও মানবসমাজে উপহাসাস্পদ হব। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধে বা অক্ষক্রীড়ায় পশ্চাৎপদ হওয়ার অর্থ শুধু কাপুরুষতা প্রকাশ পাওয়া নয়, ধর্মভ্রষ্ট হওয়াও। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কুলধর্ম পালনের জন্যই এই দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।'

অর্জুনের বক্তব্য শেষ হওয়ার পূর্বেই এক সুদর্শন তরুণ যুবক সভাস্থলে উঠে দাঁড়ালেন। ইনি দুর্যোধনের সহোদর অনুজ—বিকর্ণ।

বিকর্ণ বললেন, 'হে সভাস্থ ভদ্রমণ্ডলী, মনস্বিনী দ্রৌপদী যে প্রশ্ন করেছেন তা আপনাদের সকলেরই উদ্দেশ্যে। কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম, কুলপ্রধান ধৃতরাষ্ট্র, আচার্য দ্রোণ, কৃপ—আপনারা কেউ এঁর প্রশ্নের সম্যক উত্তর দেন নি। এই সভামধ্যে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমাগত রাজন্যবৃন্দও রয়েছেন, ক্ষত্রিয়ের পালনীয় ধর্ম বা আচরণ তাঁরাও অবগত আছেন। আপনারা পক্ষপাত অথবা ব্যক্তিগত দ্বেষ কি আশঙ্কা ত্যাগ ক'রে সত্য মতামত ব্যক্ত করছেন না কেন?'

যেন উত্তরের জন্যই কিছুক্ষণ নীরবে অপেক্ষা করে বিকর্ণ পুনশ্চ বললেন, 'আপনারা এই লজ্জাজনক অবস্থা এবং এক্ষেত্রে নিজেদের কি করণীয় তা স্থির-মস্তিষ্কে চিন্তা করুন। পণ্ডিতেরা রাজাদের চার প্রকার প্রবল আসক্তিকে ব্যসনরূপে অভিহিত করেছেন। মৃগয়া, সুরাপান, দ্যূতক্রীড়া এবং স্ত্রীসম্ভোগ। ব্যসনে মত্ত হলে কোন হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, ধর্মবুদ্ধি সে ব্যক্তিকে ত্যাগ করে। সে শ্রেণীর ব্যক্তিকে অমানুষ বলে গণ্য করা হয়। তাদের অনুষ্ঠিত কর্মকেও কেউ অভ্রান্ত বা প্রামাণিক ভাবে না। মহারাজ যুধিষ্ঠিরও ব্যসনমত্ত অবস্থাতেই দ্রৌপদীকে পণ রেখেছেন। দ্রৌপদী অন্য পাণ্ডবদেরও পত্নী। নিজে পূর্বে পরাজিত হয়ে স্ত্রীকে পণ রাখার কী অধিকার তাঁর ছিল, অপরের পত্নীকেই বা তিনি পণ রাখেন কি ক'রে? আরও একটি বিষয় আপনারা স্মরণ রাখবেন, পাণ্ডবমহিষীকে পণ রাখার কথা যুধিষ্ঠির পূর্বে কল্পনামাত্র করেন নি—ধূর্ত শকুনিই ওঁর বিহ্বলতা ও বুদ্ধিবিভ্রম লক্ষ্য ক'রে সুযোগ বুঝে সে প্রস্তাব করেন —ব্যসনাসক্ত মহারাজ অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না ক'রে তাতেই সম্মতি দান করেন। সুতরাং সেক্ষেত্রে কোনমতেই দ্রৌপদীকে কৌরবদের বিজিতা বলে স্বীকার করা যায় না।'

বিকর্ণের বক্তব্য শেষ হতে সভামধ্যে দারুণ কোলাহল দেখা দিল। অধিকাংশ ব্যক্তিই বিকর্ণকে সমর্থন ও শকুনির ঘোর নিন্দা করতে লাগলেন। কিন্তু কুরুকুলের কেউ এমন কি দুর্যোধনও এ কথার কোন উত্তর দেওয়ার পূর্বেই ক্রোধরক্তিমানন অঙ্গাধিপতি কর্ণ উঠে দাঁড়িয়ে প্রবল কণ্ঠে বিকর্ণকে তিরস্কার করতে লাগলেন।

'বিকর্ণ, তুমি তোমার বংশের, আপন ভ্রাতাদের বিরুদ্ধাচরণ করছ—এই তো সর্বাপেক্ষা অমানুষের কাজ। অরণি-কাষ্ঠ ঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হয়ে সেই কাষ্ঠকেই সর্বাগ্রে বিনাশ করে—তুমিও সেইভাবে পিতৃকুলের স্বার্থবিরুদ্ধ কাজ করছ। এ সভায় এত প্রবীণ জ্ঞানী শাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তি নীরব রয়েছেন—কিছু বলতে সাহস করছেন না—তুমি কি তাঁদের চেয়েও পণ্ডিত মনে কর নিজেকে? তুমি বালক, ধর্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব কিছুই জান না—আমাদের সে সম্বন্ধে জ্ঞান দিতে এসেছ! এর অপেক্ষা ধৃষ্টতা এবং অর্বাচীনতা আর কি হতে পারে! তোমার বয়স অল্প সে কারণেই এতাদৃশ প্রগল্‌ভতা প্রকাশ ক'রে নিজেকে মূর্খ প্রতিপন্ন করছ।··· কৃষ্ণা এখন নন, বহুপূর্বেই কৌরব কর্তৃক বিজিতা হয়েছেন। যুধিষ্ঠির সর্বস্ব পণ রেখে পরাজিত হয়েছিলেন, দ্রৌপদীও কি সে সর্বস্বের মধ্যে পড়েন না? শকুনি ওঁর নামটা মনে করিয়ে দিয়েছেন বলেই যুধিষ্ঠির পণ রেখেছেন? তিনি কি একেবারে শিশু, না কি এতই নির্বোধ? আর যদি মনে করো তাঁকে একবস্ত্রা অবস্থায় সভামধ্যে আনা অন্যায় হয়েছে—তবে তার উত্তরে একটি কথা বলেই তোমার ভ্রান্তি নিরসন করব; স্ত্রীলোকের একটিই মাত্র পতি শাস্ত্রে বিহিত হয়েছে। বিশেষ পঞ্চপতি হলেই সে নারী বেশ্যারূপে পরিগণিত হয়। এ কথা সবাই জানে। দ্রৌপদী যখনই পঞ্চ ব্যক্তির স্বামীত্ব স্বীকার করেছেন তখনই তো তিনি বারাঙ্গনার পর্যায়ে পড়েছেন। বহুজনভোগ্যা বারনারীকে একবস্ত্র কেন বিবস্ত্র অবস্থায় আনাতেও কোন দোষ হয় না।'

এতদূর অসৌজন্য, অশালীন ভাষা ব্যবহারেও বুঝি অঙ্গাধিপতির অন্তরের জ্বালা প্রশমিত হয় না—তাঁর উদ্ধত উচ্চ কণ্ঠস্বর সে সভার পরিবেশ বিদ্বেষবিষ-জর্জরিত ক'রে দিয়েছে অনুভব ক'রেও বুঝি থামতে পারেন না—কঠোর বাক্যাঘাত শেষ হতেই অধিকতর অপমানের কথা মনে পড়ে তাঁর। তর্জনী সংকেতে দুঃশাসনকে লক্ষ্য ক'রে বলেন, 'দুঃশাসন, বিজ্ঞতাভিমানী বালক বিকর্ণর আস্ফালনে তুমি কর্তব্যে বিরত কেন? তুমি পাণ্ডবদের ও যাজ্ঞসেনীর বস্ত্রসকল আহরণ করো। যাজ্ঞসেনীকে একবস্ত্রে আসতে হয়েছে বলে উনি বড়ই দুঃখিত—সে বস্ত্র-বন্ধন থেকে ওঁকে মুক্তি দাও!'

বিস্মিত হলেন সকলেই। কর্ণের পক্ষে এ ধরনের অন্ত্যজবৎ আচরণ কল্পনাতীত।

কিন্তু দুঃশাসনের এসব কোন চিন্তাসংকট বা ভাবদ্বন্দ্বের দুর্বলতা নেই। তিনি বিকর্ণ ও কর্ণের বাক্‌যুদ্ধের অবসরে মত্ততাজনিত ঈষৎ তন্দ্রাসুখ উপভোগ করছিলেন, সহসা অকারণেই হেসে উঠে দ্রৌপদীর দিকে অগ্রসর হলেন।

কর্ণের নির্লজ্জ নির্দেশ শোনামাত্রই পাণ্ডবরা নিজ নিজ উত্তরীয় ও উষ্ণীষ খুলে দুঃশাসনের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করেছিলেন। তবে সেদিকে না দুঃশাসন আর না কর্ণ কারও লক্ষ্য ছিল না। তাঁদের দৃষ্টি দ্রৌপদীতেই আবদ্ধ। দ্রৌপদী তখন দুঃখে ক্ষোভে লজ্জায় ও উষ্মায় বাত্যাতাড়িত বেতসপত্রের মতোই কম্পমানা। তাঁর দুই চক্ষুতে একই সঙ্গে বজ্র ও বর্ষণের সম্মেলন ঘটেছে।

কিন্তু দুঃশাসনকে অগ্রসর হতে দেখেই কৃষ্ণা যেন অকস্মাৎ শান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন হয়ে গেলেন। স্থিরকণ্ঠে কুরুপ্রধানদের শ্রবণযোগ্য স্বরে বললেন, 'বুঝলাম এ সভাগৃহে সকলেই দুর্যোধনের ভয়ে ত্রস্ত, আতঙ্কিত। এখানে সুবিচার বা সুবিবেচনা আশা করাই নির্বুদ্ধিতা। একমাত্র পাণ্ডবদের পরম শুভানুধ্যায়ী দ্বারকাধীশ যদি এখানে উপস্থিত থাকতেন তাহলে এ স্পর্ধার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতেন। তিনি থাকলে কারও এতখানি দুঃসাহস হ'তও না। সুতরাং আমি জন্মে জন্মান্তরে যা মানবের নিত্য-সঙ্গী নিত্য-রক্ষক—সেই ধর্মকে স্মরণ করে নীরব রইলাম। এঁদের প্রত্যেকের ঘরেই জননী জায়া দুহিতা আছে, তত্রাচ তাঁরা নীরবে বিনা প্রতিবাদে আমার এ লাঞ্ছনা প্রত্যক্ষ করছেন। মনে হচ্ছে জগৎ থেকে শ্রেয় বুদ্ধি অন্তর্হিত হয়েছে, অধর্মই আজ প্রবল ও প্রধান। তথাপি আমি এ সংসারের শাশ্বত বস্তু ধর্মকেই আশ্রয় করলাম, তিনি আমাকে রক্ষা করুন।'

সভাস্থ সকল ভদ্রব্যক্তিই নীরব ও চিত্রার্পিতপ্রায় নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন। দ্রৌপদীর অভিযোগে সকলেই লজ্জিত, তবু 'অপর কেউ প্রতিবাদে অগ্রসর হলে আমি অবশ্যই হব' প্রত্যেকেই এই বোধে এত বড় অশালীন কাজেও বাধা দিতে উঠলেন না। দুঃশাসনের তো এসব কথার মর্ম বোঝারই অবস্থা নয়, বিশেষ কর্ণ উন্মত্ত বৃষভবৎ ক্রমাগত উত্তেজিত করছেন—তিনি সত্যই অগ্রসর হয়ে দ্রৌপদীর বস্ত্রপ্রান্ত ধরে আকর্ষণ করলেন!

কর্ণ, দুর্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি আর যে ঘটনার কথাই কল্পনা ক'রে থাকুন, বাস্তবে তার কিছুই ঘটল না। ক্রন্দন আক্ষেপ করুণাভিক্ষা—হয়ত শেষে আত্ম-সমর্পণ—এই কথাই চিন্তা করছিলেন তাঁরা। কিন্তু যাজ্ঞসেনী সে-সব কিছুই করলেন না, এমন কি বিন্দুমাত্র বিচলিত বলেও মনে হ'ল না, দুই চক্ষু বন্ধ ক'রে করজোড়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ধর্ম—এবং তাঁর কাছে যিনি ধর্মশক্তির প্রতীক—সেই শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করতে লাগলেন।

তবু বিস্ময় শুদ্ধমাত্র এই স্থৈর্যেই নয়।

সেই সভাগৃহে সেদিন যে অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটল, যে অলৌকিক দৈবশক্তির

আবির্ভাব হ'ল—তা সভাস্থ তাবৎ লোকেরই আমরণ স্মরণ রাখার মতো। পুত্রপৌত্রাদিক্রমেই এ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে সেই সভায় আগত আহূত-অনাহূত ব্যক্তি বা আগন্তুকদের বংশে—যদিচ পরবর্তী কালের মানুষের পক্ষে, পূর্বপুরুষদের দ্বারা কথিত হওয়া সত্ত্বেও, এই লোকোত্তর ঘটনা বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

প্রথমটা অনেকে বুঝতেও পারেন নি, বিশেষ দূরস্থিত দর্শকরা। দুঃশাসন পৈশাচিক উল্লাসে ভ্রাতৃজায়ার বস্ত্র আকর্ষণ করছেন, সে বস্ত্র শিথিল হয়ে খুলে আসছে—এ-ই দেখেছে সবাই। অনেকে লজ্জায়—নিজ বংশের সংস্কারে, চক্ষু মুদিত করেছেন। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও তো প্রত্যাশিত কোন ধিক্কারের শব্দ উঠল না। তখন সকলেই চেয়ে দেখলেন—দুঃশাসনের সামনে বস্ত্রের স্তূপ জমে উঠেছে—উঠছে—কিন্তু দ্রৌপদী তখনও অনাবৃতা হন নি। কে যেন কোন্ অলৌকিক-শক্তিবলে অদৃশ্য থেকে দুর্বৃত্ত দুঃশাসনের হাতে ক্রমাগত বস্ত্র যুগিয়ে যাচ্ছে, অঞ্চলই বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর হচ্ছে—দ্রৌপদীর পরিধেয় এতটুকু কোথাও স্থানচ্যুত হচ্ছে না।

নারীদের প্রমাণ পরিধেয়ের পরিমাপ সম্বন্ধে সকলেরই অল্পবিস্তর ধারণা আছে—সে মাপের হিসাবে শতাধিক বস্ত্র খুলে এসেছে, এখনও ক্রমাগতই আসছে, স্তূপ ক্ষুদ্র পর্বতাকৃতি ধারণ করছে—তবু দ্রৌপদীর অঙ্গ অনাবরিত হওয়া তো দূরে থাক, কোন অঙ্গের আবরণই এতটুকু স্থানচ্যুত হয় নি। এবার পিছনের লোকরা এই অভূতপূর্ব, প্রায় দৈবঘটনা চাক্ষুষ করার জন্য উঠে দাঁড়াল। এখনও বস্ত্রের পর বস্ত্র চলে আসছে, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় দ্রৌপদীর অঙ্গ থেকেই। দুঃশাসনও বিস্ময়ে হত-চেতন-প্রায়। শুধু অবিরলভাবে বেরিয়ে আসছে বলেই বিস্ময় নয়—এত সূক্ষ্ম ও মহার্ঘ্য বস্ত্র তিনি কখনও দেখেন নি। এ কোন্ তন্তু থেকে নির্গতই বা হয়েছে! এত দীর্ঘ বস্ত্র ধারণ করতে পারে এমন কোন তন্তু কখনও তিনি দেখেন নি, শোনেনও তিনি এতদিনের মধ্যে।

বহুক্ষণ ধরে চলল এই ঘটনা। হতবাক সকলেই। কারও চোখে পলক পড়ছে না। লজ্জাবনতমুখ পাণ্ডবরাও কোন আশ্চর্য ঘটনা ঘটছে অনুভব ক'রে মুখ তুলে চেয়েছেন এবং চেয়েই আছেন।

বহুক্ষণ ধরে বস্ত্র আকর্ষণ-পর্ব চলার পর যখন শিথিল সেই বস্ত্রের স্তূপ সত্যই পর্বতাকার ধারণ করল তখন দুঃশাসন ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে বসে পড়লেন। সভামধ্যে দারুণ কোলাহল উত্থিত হ'ল। এবার কৌরবদের আশ্রিতরাও—বোধ করি ধর্মের এই মহান মহিমা প্রত্যক্ষ ক'রে কিছু সাহস সঞ্চারিত হওয়ায়

—সরবে কৌরবদের নিন্দাবাদ ও পরমাসতী দ্রৌপদীর জয়গান করতে লাগলেন। সভায় সংপ্লবের অবধি রইল না।

কিছুক্ষণ দারুভূতবৎ নির্বাক বসে থাকার পর এ পক্ষে কর্ণরই প্রথম সম্বিৎ ফিরল। তিনি সভার এই বিরূপতা লক্ষ্য ক'রে বললেন, 'দুঃশাসন, অকারণ বিলম্ব করছ কেন, এই দাসীকে এবার আমাদের দাসীদের আবাসে নিয়ে যাও!'

কর্ণর বক্তব্য শেষ হওয়ার পূর্বেই—চতুর্দিকের মহতী হলহলা শব্দ প্রদমিত করে সভাকে নিস্তব্ধ ক'রে ভীমের বজ্রনির্ঘোষ কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হ'ল, 'এই সভাস্থ সকলে শুনে রাখুন, যুদ্ধক্ষেত্রে আপন নখরে এই পাপাত্মা পাপকর্মা দুঃশাসনের বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে ওর রক্ত পান করব। যদি না পারি মৃত্যুর পর যেন আমার পিতৃলোকে গতি না হয়—যেন পিশাচত্ব প্রাপ্ত হই।'

এই ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞায় সমগ্র সভাকক্ষ কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে রইল। সকলেই যেন এক আসন্ন অপ্রতিরোধ্য অমঙ্গলাশঙ্কায় অবশ হয়ে গেলেন।

এই সুযোগে বিদুর আবারও সভাস্থ ভদ্রজনের শুভবুদ্ধির কাছে পুনরাবেদন জানানোর প্রয়াস পেলেন। দুই বাহু উর্ধ্বে উৎক্ষেপণ ক'রে বললেন, 'সভ্যগণ, সাধ্বী দ্রৌপদী যে প্রশ্ন করেছেন আপনারা এতাবৎ তার কোন উত্তর দেন নি। বালক বিকর্ণর যে সৎসাহস আছে, এ সভার প্রবীণ ও বিজ্ঞজনদেরও তা নেই দেখে আমি যুগপৎ বিস্ময় ও ব্যথা অনুভব করছি এবং এই কালকে ধিক্কার দিচ্ছি। শাস্ত্রে আছে অভিজ্ঞ হয়েও যে ব্যক্তি ধর্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিকে সত্য উত্তর না দেয়, তার দুর্দশার সীমা থাকে না। যার ধন অপহৃত হয়, যার পুত্র নিহত হয়, যে ঋণ-শোধে অপারগ, যে স্ত্রী অকালবৈধব্য প্রাপ্ত হয়, যে রাজপুরুষদের হাতে নিগৃহীত ও সর্বস্বান্ত হয়, যাকে শার্দূলে আহত করে, যে নারীকে সপত্নীসঙ্গ সহ্য করতে হয়—মিথ্যা উত্তরদাতাদের সেই সমস্ত এবং আরও বহুবিধ দুরবস্থার ন্যায় যন্ত্রণাভোগ নির্দিষ্ট হয়েছে।'

বিদুর যেন কিছুই বলেন নি এই ভাবে কর্ণ আবারও বললেন, 'দুঃশাসন কী দেখছ? এ উন্মাদ এবং স্থবিরদের সভা। তুমি দাসীকে শীঘ্র তার যথাযোগ্য বাসগৃহে নিয়ে যাও।'

দুঃশাসন এতক্ষণে কিছুটা শান্ত ও শ্রান্তিবিযুক্ত হয়েছেন, ভীমের ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞার প্রাথমিক আতঙ্ক-আচ্ছন্নতাও কিছুটা বিদূরিত হয়েছে। তিনি আবারও উঠে অশ্রাব্য কটূক্তি ও স্খলিত হাস্যসহকারে দ্রৌপদীর কেশমণ্ডলীতে হস্তার্পণ করলেন।

কিন্তু বোধ করি মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি অভিজ্ঞতার অতীত অদৃষ্টপূর্ব এই

দৈবঘটনায় চিত্তবল ফিরে পেয়েছিলেন দ্রৌপদী, তিনি কুপিতা ব্যাঘ্রীর ন্যায় গর্জন ক'রে উঠলেন। সজোরে দুঃশাসনের কবলমুক্ত হয়ে সভাস্থ প্রবীণ ও প্রধান ব্যক্তিদের দিকে চেয়ে উচ্চরবে বললেন, 'যাকে কোনদিন এমন কি চন্দ্র সূর্যও দেখতে পেত না—সে আজ এই ভাবে কলুষিত দৃষ্টির সম্মুখে লাঞ্ছিত হ'ল ! পাঞ্চালরাজের কন্যা, পাণ্ডবদের পট্টমহাদেবী, কংস ও শিশুপালের নিহন্তা বাসুদেবের প্রিয় সখীর আজ এই দুর্গতি হচ্ছে দেখেও পাণ্ডবরা নীরব রয়েছেন, কৌরবরাও তাঁদের স্নুষা ও দুহিতা প্রকাশ্য সভায় নিগৃহীতা দেখে সহ্য করছেন, সেক্ষেত্রে আমি এখানে কারও কাছ থেকেই এর প্রতিবাদ কি প্রতিকার আশা করি না, শুধু আমার প্রশ্নের উত্তর প্রার্থনা করি—আপনারা দয়া করে বলুন আমি বিজিতা কি অজিতা ! আপনারা সকলে যে মত দেবেন আমি তাই স্বীকার করে নেব।'

প্রবীণরা সকলেই লজ্জিত অপ্রতিভ ভাবে প্রবীণতম সভ্য ভীষ্মর মুখেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন।

ভীষ্ম অধোমুখেই উত্তর দিলেন, 'কল্যাণী, তোমাকে পূর্বেই বলেছি, ধর্মের গতি বিজ্ঞ মানব এমন কি ঋষিদেরও সম্পূর্ণ জ্ঞাত নয়। এ সংসারে বলবান মানুষ যাকে ধর্ম মনে করে, তা অধর্ম। হলেও লোকসমাজে তাই সত্য ও ধর্ম বলে প্রতিষ্ঠা পায়, দুর্বলের কথিত পরম ধর্মও কেউ স্বীকার করে না। উপস্থিত এই জয়পরাজয়ের প্রসঙ্গে যে ন্যায়ের প্রশ্ন তুমি তুলেছ তার সূক্ষ্মতা ও দুরবগাহতা বিচার ক'রে আমার পক্ষে এর সত্য নির্ণয় করা অসাধ্য। তবে এইটুকু বলতে পারি আজ এখানে কৌরবরা যে কুৎসিত লোভের পরিচয় দিল ও যে ইতরতা প্রকাশ করল তাতে অচিরকাল মধ্যেই এই কুল ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। ভাগ্যবতী, তুমি যে এই কষ্ট ও দুর্দশার মধ্যেও ধর্মকে অবলম্বন করেছ—এ তোমারই উপযুক্ত হয়েছে, এর জন্য আমি তোমাকে প্রশংসা করছি। আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলুম না, দ্রোণ কৃপ প্রভৃতি শাস্ত্রজ্ঞ ও ধর্মজ্ঞ বৃদ্ধরা মৃতর মতো জড় হয়ে বসে আছেন, সুতরাং আমার মতে, তোমার প্রশ্ন তুমি ধীমান যুধিষ্ঠিরকেই কর। উনি অন্যায় বলবেন বলে বোধ করি না।'

ভীষ্ম নীরব হলে আর কোন আশ্রয় কি ভরসা কোথাও রইল না ভেবে দ্রৌপদী আর্তস্বরে ক্রন্দন করতে লাগলেন। সভাস্থ সকলেই মূক। ভীষ্মের এই স্পষ্টোক্তির পরও যুধিষ্ঠির পূর্ববৎ আনত মুখে বসে রইলেন, একটি শব্দও উচ্চারণ করলেন না।

সভার এই মৌনতা লক্ষ্য ক'রে নিজের শক্তি ও জয় সম্বন্ধে সুনিশ্চিত

দুর্যোধন ঈষৎ হাস্য ক'রে বললেন, 'পাঞ্চালী, যুধিষ্ঠির তো দেখছি নিরুত্তর। আমাদের কথার প্রতিবাদ করার শক্তি ওঁর নেই। বেশ তো, তোমার তো আরও চারজন মহাবল ও জ্ঞানবান স্বামী এখানে উপস্থিত আছেন, এ প্রশ্ন তুমি তাঁদেরই কর না। তাঁরা এই সভাস্থ আর্যদের সামনে বলুন যুধিষ্ঠিরের এই পণ রাখার কোন অধিকার ছিল না, তিনি মিথ্যাবাদী,—আমি এখনই তোমাকে মুক্তি দিচ্ছি। যা হোক একটা পথ তুমি অবলম্বন কর, সভাস্থ সকল ভদ্রব্যক্তিই তোমার রোদনে দুঃখ বোধ করছেন, কেবল তোমার মন্দভাগ্য স্বামীদের মুখ চেয়ে চক্ষুলজ্জাতেই যথার্থ উত্তর দিতে পারছেন না।'

আবারও এক বিপুল কোলাহল উঠল। অনেকে দুর্যোধনকে সমর্থন করলেন, অর্বাচীনরা পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে চক্ষুর ইঙ্গিত ক'রে কৌতুকসূচক শব্দ করতে লাগল। যাঁরা কিছুটা মধ্যপথাবলম্বী তাঁরা উৎকণ্ঠ হয়ে যুধিষ্ঠিরের দিকে চেয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন, উনি কি বলেন শোনার জন্য।

উত্তর দিলেন ভীম। তবে সে এ প্রশ্নের উত্তর নয়। সশব্দে দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন ক'রে বললেন, 'এই ধর্মরাজ আমাদের জ্যেষ্ঠ ও কুলাধিপতি। ইনি আমাদের প্রভু, আমাদের পুণ্য, তপস্যা এমন কি জীবনেরও অধীশ্বর। ইনি নিজেকে এবং আমাদের পরাজিত বোধ করছেন বলেই অগত্যা আমাদের নীরব থাকতে হয়েছে। নইলে পাঞ্চালীর কেশপাশ স্পর্শ করার পরও কোন দেহধারী জন্মমরণশীল ব্যক্তি দণ্ডমাত্রও জীবিত থাকত না। জ্যেষ্ঠের গৌরব রক্ষার্থই এই অপমান সহ্য করতে হয়েছে, বিশেষ স্থিতধী অর্জুন বারম্বার নিরস্ত করছেন—নইলে কেবলমাত্র হস্ত ও পদদ্বারাই আজ কৌরবদের নিশ্চিহ্ন করতাম।'

কর্ণর সব্যঙ্গ কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠল, বললেন, 'থাক, থাক। তুমি ভোজনে আর আস্ফালনে পটু তা সকলেই জানে। সামান্য অপরাধীরা যখন বন্দী হয়ে রাজকীয় কারাগারে আবদ্ধ থাকে, তখন তারাই এ রকম বালকোচিত আস্ফালন করে। কোন ক্ষত্রবংশীয়ের এবম্প্রকার বৃথা বাক্যবিক্রম-প্রদর্শন শোভা পায় না। যাজ্ঞসেনী, তুমি আমার কাছে তোমার প্রশ্নের উত্তর শোন। শাস্ত্রে আছে অস্বাধীন দাস, তার পুত্র ও নারী এ তিনজনই অধম, এদের নিজস্ব কিছু থাকে না, তারা যদি কখনও কিছু লাভ করে তা তাদের প্রভু বা স্বামীরই প্রাপ্য বলে গণ্য হয়। তুমি সেই অধম দাসের পত্নী, তাদের সমুদয় ধনের সঙ্গে তুমিও এই প্রভুর অধীন হয়েছ। অতএব আর বৃথা বাগজাল বিস্তার না ক'রে তোমার প্রভুর অন্তঃপুরে গমন কর এবং তাঁর পরিবারবর্গের সেবা কর। সুন্দরী, এখন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররাই তোমার স্বামী। তবে দাসীদের পক্ষেও পতিবরণ

অবিধেয় নয়। পঞ্চপাণ্ডব পরাজিত এবং দাসে পরিণত। তাদের আর তোমার পতিত্বের অধিকার নেই। তুমি শীঘ্রই এই কৌরবদের মধ্যে মনোমত কাউকে পতিত্বে বরণ ক'রে নাও—যাঁর হাতে পড়লে ভবিষ্যতে এমন লাঞ্ছনার সম্ভাবনা থাকবে না। ক্ষত্রকুলজাত তো দূরে থাক, এই কৌন্তেয়রা যদি মানুষ হ'ত—এতটুকু পৌরুষ বা শৌর্য যদি থাকত—তাহলে নিজেদের পত্নীকে পণ রেখে অক্ষক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হ'ত না।'

ভীম উচ্চৈঃস্বরে একটা হা-হা রব ক'রে উঠে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। জ্যেষ্ঠের উদ্দেশে বললেন, 'ঐ নীচ সূতপুত্রটার দোষ দিতে পারি না। কারণ সে সত্য কথাই বলেছে, আমরা যথার্থই এখন ওদের দাসে পরিণত হয়েছি···হায়, আপনি যদি কৃষ্ণাকে পণ না রাখতেন তাহলে আজ শত্রুরা এমন ভাবে আমাদের ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করতে পারত না। সে-ই একসময় আপনাকে ক্রীড়ায় ক্ষান্তি দিতে হ'ল, নিজেদের পরাজয়েই ক্ষান্ত হলেন না কেন!'

এবার দুর্যোধনের পালা। তিনি কৃত্রিম সহানুভূতির স্বরে বললেন, 'কই, মহারাজচক্রবর্তী যুধিষ্ঠির, আপনি নীরব কেন?···ভীম অর্জুন তো সর্বতোভাবে আপনারই ওপর নির্ভর করছে। আপনিই বলুন এবার—কৃষ্ণা অপরাজিতা না পরাজিতা!'

এই বক্রোক্তির সঙ্গেই এক হাতে গুম্ফকে বক্রতর করতে করতে অপর হাতে নিজের বাম উরুর বস্ত্র অপসারিত ক'রে সেই কদলীদণ্ডসদৃশ অনাবরিত উরুদেশ দেখিয়ে দ্রৌপদীর দৃষ্টি আকর্ষণ উদ্দেশ্যে মৃদু চপেটাঘাত করলেন এবং সেই দেহাংশে এসে উপবেশন করার ইঙ্গিত করলেন।

তাঁর এই শিক্ষা সংস্কৃতি বংশমর্যাদাহীন বর্বরোচিত আচরণে ভীমসেন ক্রুদ্ধ সিংহের মতো গর্জন ক'রে বললেন, 'আপনারা সকলে শ্রবণ করুন, আমি যদি একদা সমরাঙ্গণে গদাঘাতে এই পামরের ঐ উরু ভঙ্গ করতে না পারি, তবে যেন মৃত্যুর পর আমার সদ্গতি না হয়—পিতৃপুরুষরা যেন আমার অশুচি আত্মাকে নিত্য অভিসম্পাত করেন!'

বলতে বলতে মনে হ'ল উষ্মা নয়—ভীমের সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে সত্যকার বহ্নিশিখাই নির্গত হতে লাগল।

তাঁর সেই সাক্ষাৎ কৃতান্তসদৃশ করাল মূর্তি দেখে অনেকেই আতঙ্কে মূর্ছাহত হয়ে পড়ল। বিদুর এই সুযোগটিরই যেন অপেক্ষা করছিলেন, তিনি উঠে দাঁড়িয়ে পুনরায় বললেন, 'হে সভ্যগণ, আপনারা দেখুন মহাবলী বৃকোদর থেকে

আজ ধরিত্রীর মহাভয় উপস্থিত হ'ল। মনে হচ্ছে দৈবই প্রতীপবংশীয়দের প্রতি প্রতিকূল, সেই কারণে অক্ষবেশে অধর্মকে প্রেরণ করেছেন। ধার্তরাষ্ট্ররা বংশ-মহিমা এবং নিজেদের মর্যাদাকে ধূলিসাৎ ক'রে স্ত্রীলোককে বিশেষ নিজকুলের বধূকে পণীভূত ক'রে এই দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। ধর্ম বিনষ্ট হলে সর্ব কার্যই দূষিত হয়। এ সভাও পাপপুরীতে পরিণত হয়েছে। কোনও ব্যক্তি নিজে অনীশ্বর হয়ে—অর্থাৎ বিক্রীত হবার পর যদি কিছু পণ রাখে তা জয় করাও অর্থহীন; স্বপ্নলব্ধ পণের সঙ্গে তার কিছুমাত্র প্রভেদ নেই। কৌরবগণ এখনও সতর্ক হোন, নতুবা মহাসর্বনাশ হবে!'

দুর্যোধন এ বক্তৃতার প্রারম্ভেই ভ্রূ কুঞ্চিত করেছিলেন, এখন বিদুরের সতর্কবাণী শেষ হতেই ব্যঙ্গ-বিষাক্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'বেশ তো, এই কথাটাই ভীম অর্জুন নকুল সহদেব স্বীকার করুন যে যুধিষ্ঠির অনীশ্বর হয়ে কৃষ্ণাকে পণ রেখেছেন —আমি এখনই যাজ্ঞসেনীকে মুক্তি দিচ্ছি!'

ঠিক সেই সময়, সেই দিবাভাগেই, অগ্নিহোত্র গৃহে* এক শৃগাল বিকট চিৎকার ক'রে উঠল এবং সেই সঙ্গে যেন ঐকতান মিলিয়ে কোথা থেকে কয়েকটি গর্দভ ও সভাগৃহের বলভিতে উপবিষ্ট কয়েকটি কদাকার বিরাট পাখীও শ্রুতিকটু ঘোর রবে ডাকতে লাগল।

সেই বীভৎস উচ্চরবে সকলেই দুর্লক্ষণ চিন্তায় সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন, ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ প্রভৃতি প্রবীণগণ 'স্বস্তি স্বস্তি' উচ্চারণ করলেন। সভাস্থ তাবৎ ব্যক্তি কিছুকাল বিমূঢ়ের মতো হতবাক হয়ে রইলেন।

সে কুস্বর শুনেছিলেন ধৃতরাষ্ট্র-মহিষী মনস্বিনী গান্ধারীও। এই মহাসতী অন্ধস্বামীর গৃহে আসার প্রস্তাবেই নিজের দুই আয়ত পদ্মপলাশ-সদৃশ চক্ষু চিরদিনের মতো আবরিত ক'রে স্বামীর জন্মদুর্ভাগ্য ভাগ ক'রে নিয়েছিলেন। স্বামীর অপেক্ষা কোন বিষয়েই তাঁর অতিরিক্ত সুযোগ না থাকে—সেই তাঁর তপস্যা। অতিশয় ধর্মপরায়ণা সাধ্বী তেজস্বিনী এই নারী বোধ করি সেই কারণেই কুরুকুলে সর্বশ্রেষ্ঠা রূপে স্বীকৃত হয়েছিলেন, আজও স্মরণীয়া হয়ে আছেন।

এই দ্যূতক্রীড়ার পূর্বে পিতা বা পুত্র কেউ তাঁর মত নেন নি, কারণ তিনি নিষেধ করলে এ কাজ করার সাহস হ'ত না তাঁদের। পরে অবশ্যই সংবাদ তাঁর কানে গিয়েছিল, তবু ক্রীড়াগৃহে এমন কদর্য কাণ্ড ঘটবে তা তিনি আশঙ্কা করেন নি, নিজের পূজাগৃহেই নিভৃত ইষ্টচিন্তায় রত ছিলেন। এখন এই বিকট

* যে গৃহে নিত্য হোম হয়, এবং সেজন্য হোমকুণ্ডের অগ্নি সতত প্রজ্বলিত থাকে।

রব কানে যেতে, পূর্বাপর সেদিনের ঘটনার বিবরণ শুনে এক ভৃত্যকে দিয়ে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে অনুনয় ক'রে পাঠালেন—অবিলম্বে নারী-নির্যাতন-রূপ মহাপাপ থেকে বিরত হতে এবং পাপ দ্যূতক্রীড়া বন্ধ করতে।

সম্ভবত এই ভয়ঙ্কর দুর্লক্ষণে ধৃতরাষ্ট্রও বিচলিত হয়ে থাকবেন। পরের সম্পদে ঐশ্বর্যশালী হওয়ার চিন্তা অপেক্ষা আত্মরক্ষার চিন্তাই তাঁর প্রবল হয়ে উঠেছিল। ভীমের বাহুবল, অর্জুনের শস্ত্রবল—কোনটাই তাঁর অজ্ঞাত নয়। ভীমের উভয় প্রতিজ্ঞাই তাঁর কর্ণগোচর হয়েছে। এই সমস্ত নানা দিক চিন্তা ক'রে তিনি এবার - এতক্ষণে—প্রতিবাদ ক'রে উঠলেন। দুর্যোধনকে কিছু তিরস্কার ক'রে - স্নুষা দ্রৌপদীকে সম্বোধন ক'রে বললেন, 'কল্যাণী, তুমি আমার বধূগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। তোমাকে যারা লাঞ্ছিত করছে সেই মূঢ়দের মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে তাতে সন্দেহ নেই। তুমি পূর্ণ মহিমায় স্বপুরে ফিরে যাও। কিন্তু ভাগ্যবতী, তার পূর্বে আমার কাছে কিছু বর প্রার্থনা কর। আমি তোমার প্রসন্নতা যাচ্ঞা করছি।'

দ্রৌপদী তাঁকে প্রণাম ক'রে করজোড়ে বললেন, 'যদি অনুগ্রহ ক'রে বর দেওয়াই মনস্থ ক'রে থাকেন—আর্যপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে মুক্তি দিন। আমার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রতিবিন্ধ্যকে লোকে দাসপুত্র বলবে, এ চিন্তাই আমার অসহ্য।'

'অবশ্য, অবশ্য।' ধৃতরাষ্ট্র যেন ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'তুমি আরও কিছু বর প্রার্থনা কর।'

'তাহলে আমার অবশিষ্ট চারজন স্বামীকেও মুক্তি দিন। আর কিছু আমার প্রার্থনা নেই।'

'না না। সে তো বটেই। পাণ্ডবরা শুধু মুক্ত নন, এই বিজিত ধনরত্ন—ক্রীড়ার সকল লভ্যই তাঁদের প্রত্যর্পণ করলাম। তাঁরা নিশ্চিন্ত মনে নিরাপদে ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন ক'রে ঐশ্বর্যাদি ভোগ করুন। তাঁদের কল্যাণ হোক, আমি তাঁদের আশীর্বাদ করছি।'

তারপর যুধিষ্ঠিরকে নিজ সামীপ্যে আহ্বান করলেন, 'পুত্র যুধিষ্ঠির, তুমি আমার সম্মুখে এস।'

যুধিষ্ঠির কাছে এসে দাঁড়াতে—শব্দেই তা অবগত হয়ে—অন্ধরাজা পুনশ্চ বললেন, 'অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির, তোমার মঙ্গল হোক, তুমি নির্বিঘ্নে স্বীয়পুরে ফিরে যাও। তোমার রাজ্য সম্পদ সবই আমি ফিরিয়ে দিলাম। আমি বৃদ্ধ হয়েছি, হয়ত বা পুত্রস্নেহে অযথা দুর্বলও—আমার ওপর ক্রোধ কি অভিমান রেখো না। তুমি যে ধর্মপথাবলম্বী হয়ে নীরব ও নম্র ছিলে, ধৈর্য হারিয়ে কটূক্তি করো নি,

কি ক্রোধ প্রকাশ করো নি—এতেই বুঝেছি তুমি নিরতিশয় বুদ্ধিমান। যেখানে বুদ্ধি সেখানেই ক্ষমা। তথাপি পুনঃপুনঃ বলছি, তুমি শান্তির পথেই থেকো, কদাচ জ্ঞাতিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ো না। দেখ, পাথরে কাঠুরিয়ার কুঠার প্রবিষ্ট হয় না, কাষ্ঠখণ্ডে অনায়াসেই হয়। যারা শত্রুর বৈরাচরণ মনে না রেখে তাঁদের যা কিছু সৎগুণের কথাই চিন্তা করেন, তাঁরাই উত্তম পুরুষ। বৎস, তুমি দুর্যোধনের নিষ্ঠুরতার কথা মনে স্থান দিও না, বৃদ্ধা গান্ধারী ও উপস্থিত এই অন্ধ পিতার কথা চিন্তা ক'রে তাকে মার্জনা ক'রো। তোমার কল্যাণ হোক, তোমরা সগৌরবে সমস্ত স্বজনসম্পদসহ ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে যাও।'

কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রর কথা শেষ হতে না হতে—কর্ণ যেন মর্মবিদারী ব্যঙ্গের আঘাতে সদ্য-আভাসিত শান্তির পরিবেশ ছিন্নবিচ্ছিন্ন ক'রে দিলেন।

বলে উঠলেন, 'অদ্যাবধি অনেক নারীর কাহিনী শুনেছি, কিন্তু আজ দ্রৌপদী যে কীর্তি স্থাপিত করলেন জগতে বোধ করি তার তুলনা নেই। পুরুষ এবং ক্ষত্রিয়, বীর বলে পরিগণিত—তাদের পরিত্রাণ করতে অবলা নারী এগিয়ে এলেন, তিনি ধন্য বৈকি !·· পাণ্ডবেরা তরণীভ্রষ্ট হয়ে অগাধ বিপদসাগরে নিমগ্ন হচ্ছিলেন, তাঁদের পত্নীই নৌকাস্বরূপা হয়ে তাঁদের বাঁচিয়ে দিলেন। আপৎকালে পাণ্ডু-পুত্ররা সর্বদাই পত্নীকে এগিয়ে দিয়ে নিজেরা পিছনে থাকেন—নিরাপদ ছত্রছায়ায়, এ বড় আশ্চর্য ব্যাপার।'

লৌহে প্রস্তরাঘাত হলে অগ্নিশিখাই উৎপন্ন হয়। ভীম আবারও অসহ্য ক্রোধে যেন ফেটে পড়লেন। বললেন, 'মহারাজ, আপনি আদেশ দিন, এই সভাস্থ সমুদয় শত্রুকে এখনই নিপাতিত করি। অপমানিতা ভার্যার লাঞ্ছনার প্রতিশোধ না নিয়ে পুত্রদের কাছে মুখ দেখাব কি ক'রে? তারা আমাদের পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করবে!'

অর্জুন তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'নীচ লোকে কত কি কটুবাক্য বলে, যাঁরা ধীমান, উত্তম পুরুষ, তাঁরা কখনও তাতে কর্ণপাত করেন না,—বিচলিত হন না। শত্রুরা বৈরাচরণ করলেও বীর প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণ তাদের যতদিন সম্ভব মার্জনা করেন। আমরা যথাসময়ে এই অপমানের প্রতিশোধ নেব, আপনি চিন্তা করবেন না। এই কর্ণকে আমি রণাঙ্গনে অবশ্যই বধ করব—আপনি নিশ্চিত জানবেন।'

কর্ণ নিকটে এসে দাঁড়ালেন এবার। তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ-ভীমের মতো তাঁরও সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন অগ্ন্যুদ্গীরণ করছিল। তাঁর সেই ভয়াল মূর্তি দেখে সকলেই সভয়ে পথ ছেড়ে দিল।

কর্ণ বিশেষভাবে অর্জুনের সম্মুখবর্তী হয়ে কঠোর শ্লেষের সঙ্গে বললেন, 'এসব শৌর্য এতক্ষণ কোথায় ছিল অর্জুন? প্রিয়তম ভার্যা এখন সভামধ্যে সহস্র দর্শকের সামনে লাঞ্ছিতা হলেন, তোমরা তার শোধ নেবে কোন-এক উত্তরকালে? পিতামাতার মৃত্যু ঘটলে অচিরেই তার সৎকার এবং বিধিমতো শ্রাদ্ধাদি করতে হয়; কেউ সুবিধা ও অবসর মতো কোন এক ভবিষ্যৎকালে তা করে না। কুলবধূর সম্মান পিতা-মাতৃগণের সম্মানের মতো সযত্নে রক্ষণীয়। অর্জুন, এককালে আমার একমাত্র উচ্চাশা ছিল, সম্মুখযুদ্ধে তোমাকে পরাজিত করব। এখন মনে হচ্ছে তোমার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াই আমার পক্ষে অপমানকর। তুমি যোদ্ধা? তুমি বীর? তুমি অপরাজেয় ধানুকী? এই বুঝি তার পরিচয়!…হায় কৌন্তেয়, তোমার শৌর্যে ধিক্, তোমার বীর্যে ধিক্, তোমার শস্ত্রজ্ঞানে ধিক্! তোমাকে যিনি রণবিদ্যায় শিক্ষা দিয়েছিলেন, সেই দ্রোণাচার্যকেও ধিক্, এক কাপুরুষকে তিনি এই দুর্লভ বিদ্যা দিয়েছেন। ধিক্! ধিক্!'

॥ ২৭ ॥

কর্ণের এই স্বভাববিরুদ্ধ রূঢ় আচরণের অর্থটাই সেদিন বুঝতে পারেন নি দ্রৌপদী। সেদিন কেন—আজও ওঁর কাছে এটা দুর্জ্ঞেয়, দুর্বোধ্য, দুরবগম্য হয়ে আছে—তাঁর এই অকারণ উত্তাপ ও তিক্ততার কারণটা; সকল দুঃখের সকল কর্মের মধ্যেও এই রহস্যটা অস্বস্তি সঞ্চার করে ওঁর অন্তরে; এমন কি সুদীর্ঘ বনবাসের নির্জন, লোভ-ক্রোধ-অসূয়াহীন শান্ত পরিবেশ ও মনস্তাপ-হরণকারী প্রাকৃতিক শোভার মধ্যেও সেটা ভুলতে পারেন না। এই প্রশ্নটা ওঁর তীব্র ক্ষোভ, অভিমান ও দুঃসহ বেদনার যেন স্থায়ী সঙ্গী হয়ে আছে মনে।

হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত পাণ্ডবদের বনবাসেই যেতে হয়েছিল।

দ্বাদশ বৎসরের জন্য মৃগচর্ম ধারণ ক'রে বনবাস ও আর এক বৎসর অজ্ঞাতবাস।

শর্ত—এই শেষ বৎসরটি কোন জনপদেই অতিবাহিত করতে হবে, জন-সমাজের মধ্যে, অথচ কেউ তাঁদের সত্য পরিচয় জানবে না। অন্তত এঁরা—কৌরবপক্ষের কোন লোক জানতে পারবেন না। এই এক বৎসর কালের মধ্যে

পরিচয় প্রকাশ পেলে আরও দ্বাদশ বৎসর বনে অতিবাহিত করতে হবে পাণ্ডবদের।

কর্ণ কিছু মিথ্যা বলেন নি—দ্যূতক্রীড়ার প্রথম পর্বে পাণ্ডবরা বস্তুত দ্রৌপদীর কল্যাণেই পরিত্রাণ পেয়ে গেলেন। অথবা বলা উচিত, দ্রৌপদীর অকথ্য অকল্পনীয় লাঞ্ছনার মূল্যে নিজেদের মুক্তি ও হৃত আর্থিকসম্পদ ক্রয় করলেন। কিন্তু সে স্বাধীনতা নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। ইন্দ্রপ্রস্থ পর্যন্তও পৌছতে পারলেন না পাণ্ডবরা, তার পূর্বেই পুনশ্চ হস্তিনাপুরীর অশুভ আহ্বান এসে পৌছল।

আবারও অক্ষক্রীড়ার আমন্ত্রণ—পূর্ব-নির্ধারিত, নির্দিষ্ট পণে।

এর পূর্বাপর ইতিহাসও দ্রৌপদী শুনেছেন—বনে আসার পরও তা শুনিয়ে যাবার লোকের অভাব ছিল না।

পাণ্ডবরা সদলবলে স্বপুরী অভিমুখে যাত্রা করতেই দুর্যোধন উদগ্র ক্রোধে ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন। সেই সঙ্গে দুঃশাসনও; তাঁর ক্ষোভের বা বিলাপের থেকে ক্রোধই বেশী।

তাঁদের বিশেষ দোষ দেওয়াও যায় না। সুদুর্লভ সৌভাগ্য, বহুদিনের ঐকান্তিক আশা ও কামনার বস্তু করায়ত্ত হবার পর যদি পরমুহূর্তেই হস্তচ্যুত হয় তাহলে এ মনোভাবগুলোও স্বাভাবিক। সে পরিতাপে এই প্রকার মনোবৈকল্য, অর্ধোন্মাদ দশা হবে—তাও।

দুঃশাসন তো প্রায় গালিগালাজই করতে লাগলেন পিতাকে, বার বার বলতে লাগলেন, 'এত কাণ্ড এত আয়োজন এত দুর্নাম সহ্য ক'রে যে শক্তি ও সম্পদ আয়ত্তে এল—তা ঐ এক মতিচ্ছন্ন বুদ্ধিভ্রষ্ট বৃদ্ধের জন্যই হারালাম! এই অতুল সম্পদ এতদিন জ্ঞাতিদের সম্পত্তি ছিল, আজ তা উনি শত্রুসাৎ ক'রে দিলেন। কারণ এ ঘটনার পর—ঐ জরাগ্রস্তবুদ্ধি বৃদ্ধ যতই অনুনয় করুন—পাণ্ডবরা আমাদের প্রতি বৈরিতার মনোভাব পরিত্যাগ করবে তা সম্ভব নয়। সে আশা ওঁর মতো পরবুদ্ধি পরিচালিত ভীমরথীপ্রাপ্ত বৃদ্ধ বা সদ্যোজাত শিশু ব্যতীত আর কেউ করবে না!'

সর্বনাশ আসন্ন হ'লে মানুষের হিতাহিত জ্ঞানই সর্বপ্রথম বিলুপ্ত হয়। কে তার যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী কে অনিষ্টকারী তা বুঝতে পারে না। দুর্যোধনও এই কুপরামর্শের প্রধান উদ্গাতা সৌবলেরই শরণাপন্ন হলেন আবার। প্রায় উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে বললেন, 'আপনি শীঘ্র কোন উপায় করুন, নচেৎ এর পর আর জীবন ধারণ করার কোন অর্থ থাকবে না। করতে পারবও না, যদি অতঃপর পাণ্ডবরা

সুখে-স্বচ্ছন্দে ওখানে রাজত্ব করতে থাকে তাহলে আমাদের বিনষ্টি অনিবার্য। অথবা ওদের ক্রীতদাসে পরিণত হয়ে, ওদের সেবা ক'রে বেঁচে থাকতে হবে। সে আমি পারব না।'

শকুনির চিত্ত ও চিন্তা কখনও সুপথ ধরে চলে না। তাঁর প্রতিভা কুবুদ্ধিতেই দীপ্যমান হয়ে ওঠে। আজও নিমেষ মাত্র বিলম্ব ঘটল না কুপরামর্শ দানে। তিনি বললেন, 'এখন আবার পূর্বের ন্যায় অক্ষক্রীড়ার প্রস্তাবে বৃদ্ধ কিছুতেই সম্মত হবেন না। তার চেয়ে মাত্র একদান খেলার এক প্রস্তাব দাও। একবারই অক্ষপাত হবে, একমাত্র পণ। যে পক্ষ পরাজিত হবে সে সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে দ্বাদশ বৎসরের জন্য বনে যাবে এবং তার পরও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে থাকবে। ঐ বৎসরকাল মধ্যে তাদের অবস্থান-স্থল জানা গেলে পুনশ্চ দ্বাদশ বৎসরের জন্য বনে যেতে হবে—এই পণ থাক।'

'তার পর?' দুর্যোধন তখনও ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারেন না, 'যদি আমরাই পরাজিত হই?'

'সে আশঙ্কা ক'রো না। পাণ্ডবরাই পরাজিত হবে। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। আমার প্রাণ পণ রইল। যদি পরাজিত হই—তোমাদের সম্মুখে প্রাণত্যাগ করব।'

দুর্যোধন হৃষ্ট ও নিশ্চিন্ত মনে পিতার কাছে গেলেন।

প্রথমটায়—যা আশঙ্কা করেছিলেন ওঁরা—ধৃতরাষ্ট্র অক্ষক্রীড়া শব্দটি শোনা মাত্র প্রবল আপত্তি ক'রে উঠলেন, 'না না, অনেক কষ্টে ওদের শান্ত করেছি, অনেক অনুনয়ে, বলবান ব্যক্তিকে বার বার উত্যক্ত ক'রে শত্রুতে পরিণত করা মূর্খের কাজ।'

দুর্যোধন বললেন, 'মহারাজ, শত্রু যা হবার তা হয়েই গেছে। বিষধর সর্পকে কুপিত ক'রে তাকে পদাঘাতে আহত করার পর তাকে বক্ষে ধারণ করলে সে বিষ সম্বরণ করে না, মিত্র হয় না। তাদের প্রতিজ্ঞা আপনি শুনেছেন—এর পর কিছুদিন নির্বিঘ্নে রাজত্ব করতে পেলে, আয়োজন সম্পূর্ণ হলে কোন এক সূত্র ধরে আমাদের সঙ্গে ওরা যুদ্ধ বাধাবে—এবং অনায়াসে বিনাশ করবে। সে সম্ভাবনাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে চাই। আপনি আমাদের প্রস্তাবটা শুনুন,—এবার আর ঐ ভাবে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে দেব না—আমি আপনার পাদস্পর্শ ক'রে শপথ করছি। একবারই মাত্র খেলা হবে, একটি মাত্র পণ রেখে। যে পরাজিত হবে—পাণ্ডবরাই হবে সে বিষয়ে আমাদের সংশয় মাত্র নেই—সে অজিন ধারণ ক'রে নিঃসম্বল অবস্থায় বনে যাবে, এবং তারও পরে এক বৎসর

অজ্ঞাতবাস করবে। যদি এই সময় তাদের সন্ধান পাওয়া যায় তো পুনর্বার দ্বাদশ বৎসর বনে থাকতে হবে। পিতা, এই ত্রয়োদশ বৎসরে তাদের এই কুবের-স্বপ্নাতীত ঐশ্বর্য আমাদের হস্তগত হলে আমরা যথেষ্ট শক্তিবৃদ্ধি এবং সৈন্য- ও শস্ত্রবৃদ্ধি করতে পারব। ওদের তখন যুদ্ধ করার মতো সামর্থ্য থাকবে না, সে প্রয়াস পেলেও ব্যর্থ হবে। আপনি দয়া ক'রে সম্মতি দিন, রাজলক্ষ্মী আমাদের গলায় মাল্যদান করতে উদ্যত, সে সৌভাগ্য-মাল্য আপনি হেলায় প্রত্যাখ্যান করবেন না।'

লোভ তো ছিলই, প্রচ্ছন্ন মাৎসর্যও। ধৃতরাষ্ট্র ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'তা— তাহলে তাই করো। সে ভাল। বোধ হয় এখনও তারা বেশীদূর যেতে পারে নি, দ্রুতগামী অশ্ব দিয়ে কোন বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান দূত প্রেরণ করো—তারা এই প্রস্তাব ও আমন্ত্রণ জানিয়ে পাণ্ডবদের ফিরিয়ে আনুক।'

সে রকম বিশ্বস্ত দূত পূর্বেই প্রস্তুত রেখেছিলেন দুর্যোধন, সে ওঁর দৃষ্টির ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র অশ্বচালনা করল।

এবার যথাসময়েই গান্ধারীর কাছে এ সংবাদ পৌঁছল।

তিনি এসে বেদনার্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, 'এ কী করলেন মহারাজ, আবার এক ঘোর অনর্থকে আবাহন করলেন! শুনেছি, কোন কোন প্রাণী আছে যারা স্বীয় সন্তানকে ভক্ষণ করে—আপনি মনুষ্য, তদুপরি জ্ঞানবান ও বিচক্ষণ হয়ে সেই আচরণেই প্রবৃত্ত হলেন! মহারাজ, বিদুরই আপনার সর্বাপেক্ষা হিতকামী, অথচ আপনি তার পরামর্শই চিরদিন অবহেলা করেন। আমার আবেদন, আপনি তার উপদেশ শুনুন, দুর্যোধনকে ত্যাগ করুন। ওর জন্মের সময় যখন ভূমিষ্ঠমাত্রই গোমায়ুর মতো রব ক'রে উঠেছিল তখনই বুঝে-ছিলাম এ কুল ধ্বংস করতে জন্মেছে। তখন আমিও আপনাকে—তার মাতা, গর্ভভারকাতরা জননী হয়েও এই অনুরোধ করেছিলাম, আজও অনুনয় করছি—জ্যেষ্ঠ পুত্রকে আপনি ত্যাগ করুন, তাকে বধ করার আদেশ দিন, না হলে কিছুতেই সর্বাত্মক কুলনাশ পরিহার করতে পারবেন না। এই পুত্রকে বাঁচতে দিলে, তার ইচ্ছায় চালিত হলে এ বংশে পিণ্ড দেবার মতো একটি শিশুও জীবিত থাকবে না। এখনও সময় আছে, কুরুবংশের মহাসর্বনাশ থেকে রক্ষা করুন।'

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, 'রাজ্ঞী, বিধাতা আমায় বহির্দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত করেছেন, কিন্তু সে অভাব পূরণ করেছেন অন্তর্দৃষ্টি প্রজ্ঞাদৃষ্টি দিয়ে। আমি স্পষ্ট দেখতে

পাচ্ছি এ বংশের বিনাশ আসন্ন অবশ্যম্ভাবী। এরা কোনমতেই রক্ষা পাবে না। নিদ্রিত অবস্থায় বিস্তীর্ণ স্থানব্যাপী মহাশ্মশানের স্বপ্ন দেখি, জাগ্রত অবস্থায় চিতাধূমের গন্ধ পাই। মহাদেবী, এ সর্বনাশের বন্যা রোধ করি, এমন সাধ্য আমার নেই। ওদের বাধা দেওয়া যাবে না। এখন তবু ওরা বাহ্য সম্মান রক্ষা ক'রে আমার সম্মতি নিচ্ছে; আমার আদেশ ওদের ইচ্ছার প্রতিকূল হলে আমার মত গ্রহণই বন্ধ করবে। আমি তাদের পিতা বটে—কিন্তু এ রাজ্যের সম্পদ, রাজশক্তি, শাসনব্যবস্থা সবই ওদের করায়ত্ত। আমি ওদের ইচ্ছাকে প্রতিরোধ করব কি উপায়ে? তারা আমার বাক্য অবহেলা ক'রে ইচ্ছামতো কার্য করবে। সে অপমান আমি স্বেচ্ছায় বরণ করতে যাই কেন? তো ব্যতিরেকেও—মহিষী, আমি জানি আমার জ্যেষ্ঠপুত্র অতিশয় পাষণ্ড, তার বিনাশ অনিবার্য ও আসন্ন—আরও সেই জন্যই তাকে ত্যাগ করতে পারব না। এই বিপদকালে তার একমাত্র বন্ধু তার পিতা তাকে ত্যাগ করবে কোন্ প্রাণে? সে হতভাগ্যের এই শেষ সম্বল পিতৃপ্রশ্রয় থেকে তাকে বঞ্চিত করতে পারব না।'...

এ প্রান্তে দ্রৌপদীও অনুরোধ আবেদন কম করেন নি। তিনি স্বভাবজ স্থৈর্য হারিয়ে ব্যাকুলতাই প্রকাশ করেছিলেন। সাম্প্রতিক দুঃসহ পূর্বস্মৃতি স্মরণ করিয়ে এ অশুভ ঈর্ষাপ্রণোদিত নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে বলেছিলেন, অর্জুনকে অনুনয় করেছিলেন মহারাজ-চক্রবর্তীকে বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করতে। অর্জুনও—অর্জুন কেন সব ভ্রাতাই কুটিলতর প্রতিহিংসাজাত অনিষ্টচিন্তা, তৎপ্রসূত উদ্ধারসম্ভাবনাহীন বিপদাশঙ্কার কথা চিন্তা ক'রে তাঁর মত পুনর্বিবেচনা করতে অনুরোধ করেছিলেন—কিন্তু কোন ফল হয় নি। যুধিষ্ঠির অবিচল দৃঢ়তায় উত্তর দিয়েছিলেন, 'এর মধ্যে নূতন ক'রে বিচার-বিবেচনার কোন কারণ নেই। বিধাতার বিধানে জন্মলগ্নেই জাতকের ভাগ্যের শুভাশুভ নির্দিষ্ট হয়। সেই ক্ষণের গ্রহসন্নিবেশের ফলেই প্রাণীগণ সুখ দুঃখ ভোগ করে। যদ্যপি এ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যানও করি, আমাদের অদৃষ্টলিপি তাতে ব্যর্থ, খণ্ডিত করা যাবে না। এ অবস্থায় পিতৃসম স্থবিরের আদেশ লঙ্ঘন ক'রে অপরাধী হব কেন? সুতরাং পুনশ্চ দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হওয়া ব্যতীত আমার কোন উপায় নেই।'

তারপর কিয়ৎকাল মৌন থেকে—অপরাহ্ণের সিন্দুরবর্ণ মেঘের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে দ্রৌপদীকে সম্বোধন ক'রে বলেছিলেন, 'প্রিয়ে, পাপ ও অনাচার চরমে না পৌঁছলে বোধ করি তার প্রতিবিধান হয় না। যে ধর্মপথে থাকে কিছুদিন হয়ত তাকে দুর্গতি কি দুঃখ ভোগ করতে হয়—পরিশেষে কিন্তু সে-ই

জয়ী হয়, স্থায়ী হয়। অথ রামচন্দ্রের মতো স্থিতধী প্রাজ্ঞ ব্যক্তিও স্বর্ণমৃগের পশ্চাতে ধাবিত হয়েছিলেন। তিনি কি জানতেন না যে ধাতুনির্মিত কোন জীবের পক্ষে জীবিত প্রাণীর সচলতা সম্ভব নয়? তবু তিনি গিয়েছিলেন—কারণ এই উপলক্ষে অনাচার চরমে না উঠলে রাবণের তপস্যাফল ক্ষয়প্রাপ্ত হত না, আর তা না হলে রক্ষতেজ ধ্বংস ক'রে পৃথিবীতে শান্তি আনয়ন করা যেত না।'

এ আপাতশান্ত কণ্ঠস্বরের সঙ্গে এঁদের সকলেরই পরিচয় ছিল। এ কাঠিন্যকে কিছুতেই অবদমিত করা যাবে না। সুতরাং আর বৃথা কালক্ষেপ করেন নি, হস্তিনাতেই ফিরে এসেছিলেন আবার। পরিণাম তো পূর্বেই জানা; অনুমান নয়, স্থিরনিশ্চয় হয়েই সর্বনাশের দিকে ফিরেছিলেন।...

শুধু ভার্যা কি অনুজরা নন, পথের দুদিকে সারিবদ্ধ নাগরিক—সভাস্থ আত্মীয়-কুটুম্বাদি সকলেই এই বিপদ সম্বন্ধে সচেতন করার চেষ্টা করেছিলেন, পাণ্ডবদের শ্রুতিগোচর ভাবেই আক্ষেপ করেছিলেন, 'হায় হায়! এমন হিতৈষী কি কেউ নেই যে এঁদের এই মৃত্যুতুল্য দুরবস্থা সম্বন্ধে সতর্ক ক'রে দেয়! পতঙ্গরা দীপ-শিখার দিকে ছুটে যায় তারা বুদ্ধিহীন, চিন্তাশক্তিহীন বলে। এঁরা তো নির্বোধ কি অবিবেচক নন, তবে কেন এই মহসর্বনাশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন?'

যুধিষ্ঠির বিষণ্ণ হাস্যে হস্তোত্তোলন ক'রে তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে—পার্শ্ববর্তী এক আত্মীয়কে বললেন, 'আমাদের নয়—কৌরবদেরই অমোঘ নিয়তি তাদের এই দুর্বুদ্ধিতে প্ররোচিত করছে। আমরা ওদেরই ভাগ্যচক্রে জড়িত হয়ে পড়ে নিমিত্তমাত্রে পরিণত হয়েছি।'...

এরপর রীতি-নিয়মমতো সর্বজনসমক্ষে পণের শর্ত জানিয়ে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হওয়া এবং পরাজিত হওয়া তো মাত্র এক দণ্ডের ব্যাপার। একবার মাত্র খেলা, একবার মাত্র অক্ষপাত—এক পলক সময়—শকুনি এদের যথাসর্বস্ব এবং পরমায়ুর ত্রয়োদশ বৎসর জিতে নিলেন।

এও পূর্ব-অনুমিত—সুতরাং এদের পরিতাপ বিলাপ কি বিক্ষোভ প্রকাশের কোন নতুন কারণ ছিল না। তা এঁরা করলেনও না। অবনত মস্তকে ভাগ্যের এই ছলনা মেনে নিলেন, নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। কিন্তু কৌরব-পক্ষের হর্ষোল্লাস সমস্ত শোভনতার সীমা অতিক্রম করল। ঈর্ষার কুৎসিত দংষ্ট্রা বিকশিত ক'রে নীচ মনের কদর্যতম রূপ প্রকাশিত হ'ল। সে প্রেততাণ্ডবে

সভাস্থ প্রবীণগণ মস্তক নত করতে বাধ্য হলেন, অনেকে সভা ত্যাগ ক'রে এই ঘৃণ্য পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার দায় থেকে অব্যাহতি পেলেন।

সর্বাপেক্ষা কলঙ্কজনক আচরণ করলেন দুঃশাসনই। এঁদের শ্রবণে কোন বাধা না থাকে এতাদৃশ উচ্চস্বরে পরিষদ ও বয়স্যদের সম্বোধন ক'রে বললেন, 'এইবার ধর্মপ্রাণ মহাত্মা দুর্যোধনের সাম্রাজ্য আরব্ধ হ'ল। কুরুবংশের ব্রণসদৃশ পাণ্ডুপুত্ররা তাদের যথাযোগ্য বিপত্তি লাভ ক'রে উপযুক্ত স্থানে গমন করছে। শত্রুগণ অপেক্ষা যে আমরা সর্ব বিষয়েই শ্রেষ্ঠ তা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে; বিজয়লক্ষ্মী ও রাজলক্ষ্মী আমাদের গলেই মাল্যার্পণ করেছেন।...ওরা দৈবাৎ অপরিমিত ধন পেয়ে অহঙ্কারে স্ফীত হচ্ছিল, আমাদের হাস্যাস্পদ ক'রে পরিহাসের পাত্র ক'রে—পরিহাস ক'রে তৃপ্তিলাভ করছিল। হায়! আজ তাদেরই অবনত বদনে অজিন-উত্তরীয় ধারণ ক'রে বনবাসে যেতে হচ্ছে। এই যথার্থ বিধাতার সুবিচার।...এই, কে আছিস, ওদের কিরীট উষ্ণীষ অলঙ্কার খুলে নে, রুরু-চর্মের পরিধেয়র সঙ্গে ওসব শোভা পায় না। লোকে দেখলে আমাদেরই রুচির নিন্দা করবে।'

তার পর কর্ণের দিকে চেয়ে—যেন সমর্থনের আশায়—একটি চক্ষু অর্ধমুদ্রিত ক'রে কৌতুকের ভঙ্গীতে বললেন, 'ওদের ধারণা ছিল ওদের মতো পুরুষ আর কেউ নেই। সে আত্মশ্লাঘার উপযুক্ত ফলই পেয়েছে। ঘ্যাখ, ঘ্যাখ—ভাল ক'রে চেয়ে ঘ্যাখ, দুই চক্ষু তৃপ্ত হোক। তপস্বীদের মতো অজিন ধারণ করলে কি হবে, ওদের যা চেহারা, অদীক্ষিত অনার্যদের মতোই দেখাচ্ছে না? কী দেখে যে রাজা দ্রুপদ এদের কন্যাদান করেছিলেন! যাজ্ঞসেনী, এই নিঃসম্বল, নিঃসহায়, গৃহহীন সামান্য অজিনাবৃত—সর্বদিক দিয়েই অযোগ্য পতিদের সঙ্গে তোমাকেও বনবাসে যেতে হচ্ছে দেখে আমি ক্লেশ অনুভব করছি। তুমি বরং এক কাজ করো, দীর্ঘকাল তো ঐ ক্লীবগুলোর সেবা করলে—এখন এই বীর্যবান ঐশ্বর্যসম্পন্ন কৌরবদের মধ্য থেকে মনোমত কাউকে পতি নির্বাচন করো, তুমি সুখে ও নির্বিঘ্নে থাকতে পারবে। ভেবে ঘ্যাখো—শস্যহীন তিল, চর্মমাত্রসার মৃগ ও তণ্ডুলহীন ধান যেমন—পাণ্ডবরাও আজ তেমনি অন্তঃসারশূন্য পুরুষে পরিণত হয়েছে, তাদের অনুগমন করা একান্ত নির্বোধের কাজ হবে।'

ভীমসেন আর সহ্য করতে পারলেন না। দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ ক'রে এগিয়ে এসে দুঃশাসনকে বললেন, 'মূর্খ—এই শকুনিটার জোরে কপটদ্যূতে জয়লাভ ক'রে তোর এত উল্লাস! ধর্মবদ্ধ বলে এখনই এর সমুচিত প্রতিফল দিতে পারলাম না। তবে তার অধিক বিলম্বও নেই। ত্রয়োদশ বর্ষ মানুষের জীবনে

এমন কিছু দীর্ঘকাল নয়, তা একদিন কেটেই যাবে। তোকে যেদিন সবান্ধবে সসহায়ে নিপাতিত ক'রে মর্মস্থল ছিন্ন ক'রে তোর রক্তপান করব সেদিনই এই অপমানের যোগ্য প্রত্যুত্তর পাবি!'

দুঃশাসন বর্তমান স্বার্থসিদ্ধির উল্লাসেই মত্ত, অপ্রীতিকর ভবিষ্যৎ চিন্তায় এ আনন্দ নষ্ট করবার পাত্র নন, 'চুপ কর্ গরু! গরু গরু! তুই গরু!' বলে দুই বাহু উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত ক'রে নৃত্য করতে লাগলেন।

কর্ণ এতক্ষণ নির্নিমেষ নেত্রে বিচিত্র দৃষ্টিতে পাঞ্চালীর দিকে চেয়ে ছিলেন, এখন এই কর্কশ ধ্বনি কানে যেতে দুঃশাসনের দিকে তাকিয়ে তাকে ঐ ভাবে সুরামত্ত নিষাদের মতো নৃত্যরত দেখে যেন ঘৃণাভরে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

কিন্তু শুধু দুঃশাসনই নন, দুর্যোধনও—বহুদিনের আশা, দুরাশাই বলা উচিত—অভাবনীয় ভাবে পূর্ণ হবার তৃপ্তিতে যেন জ্ঞান হারিয়ে ছিলেন। রাজবংশের মর্যাদা, আভিজাত্যের রীতি বিস্মৃত হয়ে, ভীমের পাশে পাশে তাঁর মাতঙ্গবৎ গতিভঙ্গীর বিকৃত অনুকরণ ক'রে চলতে লাগলেন এবং নিজের এই কুরুচি-পরিচায়ক কৌতুকে নিজেই হেসে সারা হলেন।

ভীম রোষে অরুণবর্ণ ধারণ ক'রে আরক্ত লোচনে কঠোর কণ্ঠে বললেন, 'যদি যুদ্ধ হয় তবে দেবতারা সাক্ষী থাকুন—এই পাপাত্মা দুর্যোধনকে গদাঘাতে নিপাতিত ক'রে সর্বজনসমক্ষে এর মস্তকে দুই পদ রক্ষা করব।'

অর্জুন তাঁর বাহুমূল ধরে আকর্ষণ ক'রে বললেন, 'ছিঃ! যথার্থ যাঁরা বীর মুখে আস্ফালন করা তাঁদের শোভা পায় না। এই পণের ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হলে যা ঘটবে তা মানবসমাজ প্রত্যক্ষই করবেন, ইতিহাসে লিখিত থাকবে। আপনার নিয়োগানুসারে আমি এই অসূয়াপরবশ অকারণ-বিদ্বেষী কটুভাষী কর্ণকে বধ করব। আপনি দুর্যোধন ও দুঃশাসনের রাক্ষসোচিত ব্যবহারের প্রতিফল দেবেন। এই পর-অনিষ্টবিলাসী ধূর্ত সৌবল, এদের অনুগামী—কেউ রক্ষা পাবে না। যদি কেউ আমাদের সহায় নাও হন, আমরা এই পাঁচ ভাই-ই যথেষ্ট—আজকের এ ঘটনার প্রতিশোধ নেবই। যদি হিমাচল ধূলিতে পরিণত হয়, সূর্য প্রভাশূন্য এবং চন্দ্র শৈত্যবিরহিত হয়—তথাপি আমার এ বাক্য নিষ্ফল হবে না।'

এসব কোন কথাই যুধিষ্ঠিরের কর্ণগোচর হয়েছে বলে মনে হ'ল না।

তিনি ধীরে ধীরে মহিমান্বিত ভঙ্গিতে অগ্রসর হয়ে ধৃতরাষ্ট্রের আসনসম্মুখে পৌছলেন। করজোড়ে বললেন, 'আমি ভরতবংশীয় সকলেরই যথাযোগ্য

সম্মাননা ক'রে বিদায় প্রার্থনা করছি। পিতামহ, দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা, অন্যান্য নৃপতি সকল, বিদুর ধৃতরাষ্ট্র, তদীয় পুত্রগণ, সঞ্জয় প্রভৃতি সভাসদগণ সকলে প্রসন্ন মনে আমাদের বিদায় দিন। বিধাতার ইচ্ছা হ'লে ত্রয়োদশ বৎসর পরে আবার আপনাদের কাছে এসে নমস্কার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাব।'

কিন্তু যাদের কাছে এই প্রার্থনা তাঁরা একটি উত্তরও দিতে পারলেন না, লজ্জাবনত শিরে স্থির হয়ে বসে রইলেন, এমন কি যাঁর চক্ষুলজ্জার কোন কারণ নেই—সেই জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রও মস্তক অবনত করলেন। শুধু বিদুরই প্রসারিত হস্তে আশীর্বাদ ও আশ্বাসের মুদ্রা ক'রে বললেন, 'বৎস, আর্যা কুন্তী বৃদ্ধা, চিরদিন সুখসেবিতা, অরণ্যবাসের কষ্ট তাঁর সহ্য হবে না। তাঁকে আমার কাছে রেখে যাও। আমি তাঁর যথাসাধ্য পরিচর্যা করব, তিনি আমার ভবনে পর্যাপ্ত সুখে না হোক, স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবেন।'

'যে আজ্ঞা', বলে যুধিষ্ঠির তাঁর বাক্যে সম্মান জ্ঞাপন ক'রে বললেন, 'ক্ষত্তা, চিরদিন আপৎকালে আপনি আমাদের যথাযথ উপদেশ ও সুপরামর্শ দিয়েছেন। বস্তুত আপনি আমাদের্ পুত্রতুল্য জ্ঞানে রক্ষা করার প্রয়াস পেয়েছেন। এখনও আপনার আশীর্বাদ ও উপদেশই আমাদের পাথেয় হবে—এই আশাই করি।'

বিদুর বললেন, 'বৎস, অধর্ম দ্বারা পরাজিত হলে সে পরাভবের জন্য ক্ষুব্ধ, লজ্জিত বা ব্যথিত হবার কোন কারণ থাকে না। তোমরা পাঁচ ভাই, পুরোহিত ধৌম্য ও বধূ দ্রৌপদী—তোমরা অশেষ গুণসম্পন্ন ও পরস্পরের প্রিয়কারী—তোমরা একত্র থাকলে তোমাদের বিশেষ অনিষ্ট কেউ করতে পারবে না। তুমি বুদ্ধিমান, তুমি ইন্দ্রের নিকট হ'তে বিজয় লাভের শক্তি, যমের ক্রোধ সম্বরণ ক্ষমতা, কুবেরের দানে আগ্রহ এবং বরুণের নিকট হ'তে সংযমের আদর্শ গ্রহণ করো। তোমরা জ্ঞানত কোন পাপ করো নি, সুতরাং তোমরা কৃতার্থ ও কল্যাণযুক্ত হয়ে পুনরায় শুভাগমন করবে এ সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত।'

সভাগৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে পাণ্ডবরা বিদুরের গৃহেই গেলেন—মাতা কুন্তীর পাদবন্দনা ক'রে বিদায় প্রার্থনা করতে। দেবী পৃথা ওঁদের দেখা মাত্র উচ্চরোলে কেঁদে উঠলেন। বললেন, 'অশেষ গুণশালিনী কর্তব্যপরায়ণ পুণ্যবতী পাঞ্চালীর এই বেশ ও দুর্দশা দেখার আগে আমার মৃত্যু হ'ল না কেন! ··তোমাদের পিতা আজ জীবিত থাকলে এর শোধ নিতে পারতেন। ভগ্নী মাদ্রী ভাগ্যবতী, এই সব দৃশ্য তাঁকে দেখতে হ'ল না।···পুত্র সহদেব আমার পঞ্জরাস্থি অপেক্ষা আপন, নিকট ও প্রিয়—তাকে ছেড়ে আমি কেমন করে থাকব? আমাকেও তোমরা বনে নিয়ে চলো, তোমাদের কাছে থাকলে কোন ক্লেশই আমাকে পীড়িত করতে

পারবে না।'

পাণ্ডবরা বহু কষ্টে তাঁকে শান্ত ও নিরস্ত করলে তিনি দ্রৌপদীকে আলিঙ্গন ও শিরশ্চুম্বন ক'রে বললেন, 'সাবধানে থেকো। আমি জানি আমার পুত্ররা তোমাকে যতদূর সম্ভব কষ্ট, অসম্মান ও বিপদ থেকে রক্ষা করবেন। তুমি স্বামীদের অনুবর্তিনী হচ্ছ—তোমার এ যশোগৌরব দীর্ঘকাল পর্যন্ত অপর নারীদের কাছে ঈর্ষার বস্তু হয়ে থাকবে। কন্যা, আমার সকল পুত্রকেই তোমার হস্তে অর্পণ করলাম, কিন্তু তবু অনুরোধ—সহদেব সম্বন্ধে একটু বিশেষ সচেতন থেকো। সে চিরদিন আমার স্নেহে ও প্রশ্রয়ে আবরিত, তা থেকে বঞ্চিত হয়ে মনঃপীড়া ভোগ করবে।'

অতঃপর দ্রৌপদী গেলেন কুরুকুলবধূদের কাছে বিদায় গ্রহণ করতে। দ্যূতক্রীড়ায় শোচনীয় পরিণাম প্রত্যক্ষ করা পর্যন্ত তাঁদের লজ্জা ও পরিতাপের অবধি ছিল না। এই অবস্থা দেখে তাঁরা সরবে রোদন করতে লাগলেন। সকলে সাশ্রুনেত্রে বার বার স্বামীদের হয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। যাঁরা একদিন পূর্বেও ওঁর সম্বন্ধে ঘোরতর ঈর্ষিত ও বিদ্বিষ্ট ছিলেন—তাঁরাই এখন পাণ্ডবমহিষীর এই দুর্দশায় অসম্মানে লজ্জাবনত, অনুতপ্ত। এমন কি ভানুমতীও নতবদনে এসে ওঁর দুটি হাত ধরে বললেন, 'তুমি আমাদের মুখ চেয়ে ওদের এই অমার্জনীয় বর্বর আচরণ, এই দুষ্কৃতি ক্ষমা করো। তুমি নারী—নারীদের ব্যথা বুঝবে। তোমার প্রতিটি বিন্দু অশ্রু এদের মহাপতনের এক একটি সোপান রচনা করেছে। তুমি ক্ষমা না করলে আমাদের মহা সর্বনাশ হবে। আমাদের জন্য না হোক, আমাদের পুত্রকন্যার মুখ চেয়েও অন্তত এদের মার্জনা করো।'

এঁদের এই অনুনয় ও অনুতাপে দ্রৌপদীর চক্ষু দুটিও বাষ্পার্দ্র হয়ে উঠল। তিনি করুণ বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন, 'ভগ্নী, আমার সে চোখের জল আর তো চোখে ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না। সম্ভব হলে তোমাদের মুখ চেয়েও হয়ত তা নিতাম। তার সব কটি বিন্দুই যে ধর্মের চরণে নিবেদিত, তাঁরই বিচারশালার ভাণ্ডারে রক্ষিত। এখন তাঁর যা অভিপ্রায় তাই হবে। তবে যদি কৌরবদের এখনও চৈতন্য হয়—তাঁরা অনুতপ্ত হয়ে এখনও সুবিচার করেন—তা হলে, আমার মনে হয় ধর্মের ধর্মাধিকরণে তাঁদের মুক্তিলাভ একেবারে অসম্ভব হবে না।'

পাণ্ডবরা বিদায় নিয়ে চলে গেলে শুধু যে ধৃতরাষ্ট্রের অন্তঃপুরেই শোক ক্রন্দনরোল উঠল তাই নয়—হস্তিনাপুরের রাজপথের দুদিকে সমাগত প্রজাদের

বিলাপ, পাণ্ডুপুত্রদের বনগমন স্থগিত রাখার জন্য অনুনয় এবং ধৃতরাষ্ট্রদের প্রতি অভিসম্পাতের ধ্বনিও সুদূর প্রাসাদাভ্যন্তরের নিভৃত কক্ষে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের কানে পৌঁছে তাঁকে উদ্বিগ্ন ও আশঙ্কার্ত করে তুলল।

তিনি অসহায়ভাবে নিজে নিজেই কিছুক্ষণ বিলাপ করার পর তাঁর একান্ত সচিব ও পার্শ্বচর সঞ্জয়কে দিয়ে বিদুরকে ডেকে পাঠালেন। তাঁকে ব্যস্ত ও ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'পাণ্ডবরা কি পুরীর বাইরে চলে গেছে? তাদের কি খুব কাতর দেখলে? কী ভাবে তারা গেল—আমার কাছে একটু বর্ণনা কর। আমি জানি আমার পুরীতে অনয় আসন্ন। আমার পাষণ্ড পুত্রদের প্রাণনাশ ও ধননাশের বিলম্ব নেই।...পাণ্ডবরা—যুধিষ্ঠির এদের অভিসম্পাত করছেন না তো?'

'মহারাজ, মনে হয় আপনি এখনও যুধিষ্ঠিরের সম্যক পরিচয় লাভ করতে পারেন নি। পাছে তাঁর দৃষ্টি অতিশয় বিষণ্ণ কি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং দৈবাৎ সে দৃষ্টি কৌরবদের প্রতি নিপতিত হয়ে তাদের অভিশপ্ত ক'রে তোলে তাই তিনি দুই চক্ষু আবরিত ক'রে নগরের পথ অতিক্রম করছিলেন।'

'আর? অবশিষ্ট চারজন? আমার বধূমাতা দ্রৌপদী?' ধৃতরাষ্ট্র কণ্ঠে উদ্বেগ গোপন করতে পারেন না।

'ওদের মধ্যে ভীম—ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হ'লে স্বীয় ভুজবলে আপনার সন্তানদের দুষ্কৃতির প্রতিশোধ নেবেন—যেন তারই ইঙ্গিত স্বরূপ দুই বিশাল লৌহকঠিন বলিষ্ঠ বাহু প্রসারিত ক'রে চলেছেন; কল্যাণীয় অর্জুন যুদ্ধের সময় যেভাবে অনর্গল শরবর্ষণ করবেন তারই পূর্বাভাস হিসাবে দুই হাতে বালুকা বিকীরণ করতে করতে যাচ্ছেন; নকুল ও সহদেব মুখে মৃত্তিকা লেপন করেছেন —তাঁরা উভয়েই অতিশয় রূপবান, রমণীমনোহর—মনে হয় এ অবস্থায় কোন জনপদবধূ না তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ধৈর্যচ্যুত হন—সেই কারণেই এ সতর্কতা।'

ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত অস্থির ও ব্যাকুল হয়ে উঠলেও তখনই কিছু বলতে পারলেন না। তারপর কিছু ইতস্তত করে বললেন, 'আমি যেন কিছু পূর্বে একটা ভূকম্পন অনুভব করলাম, মনে হ'ল একটা বজ্রপাতের শব্দও পাওয়া গেল। বিদুর—এ কি সত্য? তুমি কি এরকম কিছু প্রত্যক্ষ করেছ?'

'হাঁ আর্য। পাণ্ডবরা নগরপ্রাকার অতিক্রম করা মাত্র নগরীর প্রবেশ-তোরণে বজ্রপাত হ'ল, সেই সঙ্গে প্রবল ভূমিকম্প, তার ফলে স্থানে স্থানে অরণি ঘর্ষণ ব্যতিরেকেই অকারণে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। তাছাড়া প্রজাদের

বিলাপ ও ক্রন্দনধ্বনির সঙ্গে অকস্মাৎ বহু বায়স, গলিত-মাংসলোভী-গৃধ্র ও গোমায়ুর বিকট রব মিলিত হয়ে এক ভয়াবহ কোলাহলের সৃষ্টি করল।'

ধৃতরাষ্ট্র ললাটে করাঘাত ক'রে বললেন, 'আমি জানি আমার পুত্রদের আর রক্ষা নেই। হায় হায়! অত্যধিক অহঙ্কার, ঔদ্ধত্য ও ক্ষমতালোলুপতাই তাদের মহা অনর্থের কারণ হ'ল। কিন্তু আমি কি করব, তারা কেউই আমার বাধ্য নয়। আমিই বা নিজ পুত্রদের ত্যাগ ক'রে কি নিয়ে, কাদের নিয়ে থাকব?'

এই হাহাকার, এই ক্রন্দন কলরোল, এই কর্কশ অমঙ্গল রব কর্ণের প্রাসাদেও পৌঁছেছিল বৈকি! দ্রৌপদী প্রচুর-রুধিরাক্ত বস্ত্রে আলুলায়িত কুন্তলে অশ্রুমোচন করতে করতে যাচ্ছেন দেখার পর কর্ণ যেন কোন বিষাক্ত মর্মভেদী শায়কে বিদ্ধ হয়েছেন—এইভাবে দুই হাতে বক্ষ দমন ক'রে নিজের পুরে এসে অন্ধকার এক কক্ষে প্রবেশ ক'রে অর্গলরুদ্ধ করেছিলেন। তখন থেকে সেই ভাবেই নির্জনে আত্মগোপন ক'রে ছিলেন।

দ্রৌপদীকে ঐভাবে দুঃস্থা অনার্য রমণীর মতো যেতে দেখে পথিপার্শ্বের সমবেত জনতা সরবেই আলোচনা করছিল, 'এই ভাবেই ত্রয়োদশবর্ষ পরে কৌরবদের ভার্যারা পতিপুত্র-আত্মীয়-বান্ধবদের শোণিতে লিপ্ত ও মুক্তকেশী হয়ে হস্তিনার রাজপথে এমনি উন্মাদিনীবৎ পরিভ্রমণ করবে—এ আমরা দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।' আরও সেই কথাগুলোই গলিত সীসার মতো কর্ণে প্রবেশ ক'রে তীব্র এক যন্ত্রণার কারণ ঘটিয়েছে অঙ্গাধিপতির।

কিন্তু হাহাকার, বিলাপ ও অমঙ্গলসূচক শব্দেরও যেন বিরাম নেই। শেষে কর্ণ যেন আর স্থির থাকতে না পেরে উদ্‌ভ্রান্তের মতো নিজের প্রাসাদ থেকে নির্গত হয়ে পদব্রজেই দুঃশাসনের গৃহে পৌঁছলেন। দুঃশাসনও তখন কিছু ম্রিয়মাণ অবস্থায় একটি জনহীন সেবকহীন কক্ষে বসে ছিলেন। কিছু পূর্বের সেই উন্মত্ত আনন্দ, সে জয়গর্বের কোন উল্লাস যেন অবশিষ্ট নেই—তাঁর সুরাবিকৃত মস্তিষ্কেও এই অমঙ্গল-চিহ্ন ও প্রজাদের খেদোক্তি কিছুটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে।

কর্ণকে দেখে বোধ হ'ল তিনি মনে কিছু বল পেলেন। অর্ধশয়ান অবস্থা থেকে ঋজু হয়ে উঠে সম্মুখের পর্যঙ্ক দেখিয়ে বললেন, 'এসো এসো অঙ্গরাজ। তোমার কথাই চিন্তা করছিলাম।'

কর্ণ কিন্তু এসব সামাজিকতা ও সৌজন্যের ধার দিয়েই গেলেন না। অকারণ

ও আকস্মিক ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'আমরা কি চিরদিন দুর্যোধনের কিঙ্করের মতো কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁর আদেশ ও অভিপ্রায়ের অপেক্ষায় থাকব? আমাদের কি স্বাধীন ভাবে কিছুই করার অধিকার নেই? এমন কি তাঁর হিত—বা প্রিয়কার্যও না?··চল তাঁকে না জানিয়েই আমরা কয়েকজন এখনই পাণ্ডবদের পশ্চাদ্ধাবন করি। তারা অসতর্ক, অ-প্রস্তুত এবং নিরতিশয় ক্লান্ত ও অবসন্ন। এ অবস্থায় তারা কোনক্রমেই আমাদের মিলিত প্রচণ্ড আক্রমণকে প্রতিহত করতে পারবে না, আমরা অনায়াসে তাদের নিহত করতে পারব। শত্রুকে পুষ্ট হ'তে দিয়ে বল সংগ্রহ করতে দেওয়া নির্বোধের কাজ।···এখনই প্রকৃষ্ট সুযোগ—দুর্যোধনের অশান্তি ও দুশ্চিন্তার বিষবৃক্ষ নির্মূল করার। আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে বন্ধু দুর্যোধন নিশ্চিন্ত হয়ে রাজ্যভোগ করার ও মনোমত শাসন করার অবসর পাবেন, আমাদের প্রতি বিরক্ত না হয়ে ধন্যবাদই দেবেন।'

দুঃশাসনের মত্ততা অপনীত হওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই ক্লান্তি ও বিমর্ষতা দেখা দিয়েছে। কর্ণকে দেখে যেটুকু উৎসাহ বোধ করেছিলেন সেটুকুও অন্তর্হিত হয়ে তিনি আবারও যেন অবসন্নবোধ করলেন। পূর্ববৎ উপাধানে দেহ এলিয়ে ধীরে ধীরে বললেন, 'না অঙ্গাধিপতি, ওদের আমি চিনি, আজন্ম দেখছি। একই বৃক্ষের দুই শাখায় আমাদের জন্ম তা ভুলে যেও না। যতই দুর্বল ক্লিন্ন ও ক্লিষ্ট হোক—যতই অতর্কিতে আক্রমণ করি না কেন—ওদের পরাজিত করা অত সহজ হবে না। আমরা যদি চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হই, সকলের উপহাসাস্পদ হব, দুর্যোধন রুষ্ট হবেন,—এবং যদি নিহত হই,—অসহায় হয়ে পড়বেন।···শুনলাম কিছু পূর্বে স্বয়ং পিতামহ ব্যাসদেব এসে পিতৃদেবকে ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের এক ভয়াবহ বিবরণ শুনিয়ে গেছেন। সে চিত্র মানসপটে অঙ্কিত হওয়াতেও বিলম্ব ঘটে নি। পিতা অস্থির হয়ে উঠেছেন, আমাদের গালাগালি করছেন। এখন আর এসব হঠকারিতার প্রয়োজন নেই। আপনি শান্ত হোন, একটু বিশ্রাম করুন।'

'শান্ত!' বিচিত্র ভাবে হাসলেন কর্ণ, প্রদীপের স্বল্পালোকেও তা দেখে দুঃশাসন শিউরে উঠলেন; সে হাসি অশ্রুর থেকেও করুণ; বললেন, 'বিশ্রাম একেবারেই করব দুঃশাসন, রণক্ষেত্রে মৃত্যুর ক্রোড়ে। আর তখনই—তার হিমশীতল স্পর্শে—তখনই শান্ত হব। তার আগে ও দুটি শব্দের সঙ্গে পরিচয়ের কোন সম্ভাবনা নেই।'

॥ ২৮ ॥

দুঃখ-ক্ষোভ-ভারাক্রান্ত পাণ্ডবদের পদব্রজে হস্তিনাপুরীর সীমান্ত অতিক্রম করতে কিছু সময় লেগেছিল, শারীরিক ক্লান্তিও কম বাধা নয়। বিশেষ দ্রৌপদী, কিয়দ্দূর যাবার পরই তাঁর পদযুগল ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তার পর যে অভাবনীয় কাণ্ড হ'ল তাতে সে ক্লান্তি ক্ষোভ সমস্ত মুছে গিয়ে একটিই মাত্র মনোভাব তাঁদের আচ্ছন্ন অভিভূত করে রাখল—তা হ'ল বিস্ময়। শুধুই বিস্ময়! আরও বিস্ময়! এমন কি দ্রৌপদী সেই অপরিমাণ দুঃখ ও সহস্র ক্ষোভের মধ্যেও কিছুটা তৃপ্তিলাভ করলেন।

মহিমান্বিত ব্যক্তির পতনেও কিছু মহিমা ও মর্যাদা প্রকাশ পায়। ছিন্নমূল বনস্পতি যখন ভূপাতিত হয়, কিংবা প্রচণ্ড ঝঞ্ঝায় উৎপাটিত হয়ে পড়ে যায়—তখন বহুদূরবিস্তৃত ভূখণ্ড সে গুরুভার পতনের বেগ-তরঙ্গ অনুভব করে, বহুদূর পর্যন্ত জনপদ তজ্জনিত আলোড়ন ও প্রচণ্ড শব্দে সচকিত হয়। পাণ্ডবরা দীন বেশে লাঞ্ছিত বিতাড়িত ভিক্ষুকের মতো বনগমন করুক—দুর্যোধন ঈর্ষাবীজনির্গত এই অভিপ্রায়-তরুতেই নীচ-কৌশলবারি সিঞ্চন করেছেন, তাঁরা ওঁদের সেই দৈন্যদশা ও অসহায়তা দেখে ব্যঙ্গ-উপহাস ক'রে আনন্দ উপভোগ করবেন এই আশায়। এই জন্যই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছিলেন, নগর প্রাকার পর্যন্ত সংবাদ সংগ্রাহক পাঠিয়েছিলেন সেই উপভোগ্য দুর্দশার বিবরণ প্রত্যাশায়। কিন্তু সে ব্যক্তি যে সংবাদ আনয়ন করল তাতে তৃপ্ত হতে পারলেন না—সদ্যদ্যূতযুদ্ধবিজয়ী স্বয়ংঘোষিত নূতন সম্রাট।

পাণ্ডবদের এই ভাগ্য বিপর্যয়ের সংবাদ ব্যাপ্ত হ'তে বেশ কিছু সময় লেগেছিল। কিন্তু ওঁদেরও—গুরুজন জ্ঞাতিদের কাছে বিদায় নিয়ে, শুভার্থীদের সান্ত্বনা দিয়ে প্রাসাদ থেকে নির্গত হতেও কম সময় লাগে নি। তদুপরি ধীর বিলম্বিত গতিতে নগরতোরণ পর্যন্ত পৌঁছবার মধ্যেই সে দুঃসংবাদ ঝঞ্ঝাবাহিত ধূলির মতো বহুদূর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। তার ফলে ব্রাহ্মণ থেকে শূদ্র, ক্রীতদাস পর্যন্ত—গৃহস্থ থেকে তাদের সেবকরা—ছুটে এলেন ওঁদের সন্ধানে। সকলেরই এক কথা—'পাণ্ডবরা যেখানে যাবেন আমরাও সেখানেই যাব। ওঁদের ছেড়ে কৌরবদের রাজ্যে কিছুতেই থাকব না আমরা।'

তাঁরা প্রকাশ্যেই, অকুতোভয়ে, কৌরব এবং ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ বিদুর প্রভৃতিকে ধিক্কার দিতে লাগলেন। তাঁদের মত এই—এ পাপিষ্ঠদের শাসনকালে তাঁদের

আচার-ধর্ম-কুল-গো-গৃহ-ধনরত্ন কিছুই নিরাপদ নয়, সুতরাং কোন্ আগ্রহ বা আসক্তিতে পড়ে থাকবেন তাঁরা ?

'এই দুর্যোধনকে আমরা জানি। সে গুরুদ্বেষী, আচারভ্রষ্ট, সুহৃত্ত্যাগী, অর্থলোভী, গর্বিত, নীচ ও নির্দয়-প্রকৃতি! এ ব্যক্তি রাজা হ'লে প্রজাদের দুর্গতি অনিবার্য! অতএব এ স্থল ত্যাগ ক'রে জিতেন্দ্রিয় কীর্তিমান, দয়া-ধর্ম ও আচার-পরায়ণ, সহানুভূতিসম্পন্ন পাণ্ডবদের অনুগমন করাই শ্রেয়। তাঁরা অরণ্যে থাকলে সেই অরণ্যই আমাদের কাছে সুখস্বর্গ হয়ে উঠবে।'

আর যাই হোক—এই বিপুল জনসমাগম আর এদের এই আর্তি—এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না পাণ্ডবরা। তাঁরা আবেগাভিভূত হয়ে পড়লেন। যুধিষ্ঠির জোড়-করে বার বার সকলের কাছে অনুরোধ করতে লাগলেন স্ব-স্ব গৃহে প্রত্যাগত হ'তে। কিন্তু তাঁরা ওঁর বাক্যে কর্ণপাত তো করলেনই না—উপরন্তু সহস্র যুক্তিপ্রয়োগ ও মিনতি করতে লাগলেন—এই অন্যায় দ্যূতক্রীড়াজনিত পণের দাবি উপেক্ষা ক'রে ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়ে রাজশক্তি পরিচালনা করতে। শৌর্যে বা বীর্যে কৌরবরা ওঁদের পরাজিত করতে পারবেন না সেটা তো নিশ্চিত।

জনসাধারণের এই কাকুতি-মিনতিতে দ্রৌপদীর চোখে জল এসে যেতে লাগল বার বার। ওরা তাঁর পায়েও পড়ছে, উচ্চরবে তাঁদের জয়ধ্বনি ও কৌরবদের নিন্দাবাদ করছে। এবং পুনঃ পুনঃ দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করছে যে পাণ্ডবরা যদি নিজেদের পুরে ফিরে না যান—ওরাও আর ফিরবে না, তাঁদের সঙ্গে বনেই চলে যাবে।

অসহায় ব্যাকুল যুধিষ্ঠির অনন্যোপায় হয়ে প্রধান সারথি ইন্দ্রসেনকে ইঙ্গিত করলেন। সে পূর্বেই কিছু কিছু পরিজন ও অন্তঃপুরিকাদের নিয়ে কয়েকটি রথে এঁদের অগ্রগমন করেছিল। সে এখন আরও তিনটি রথ উপস্থিত করল। পাণ্ডব-ভ্রাতারা কোন এক অবসরে একটু বিচ্ছিন্ন হয়ে রথে আরোহণ করলেন। তেজস্বী অশ্ব যেন নিমেষকাল মধ্যে ওঁদের বহন করে বহু দূর গিয়ে পড়ল। পাণ্ডবরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

কিন্তু হায়! তখনও তাঁরা তাঁদের প্রজাসমূহের প্রীতির প্রগাঢ়তা পরিমাণ করতে পারেন নি, তাঁদের অন্তর-বেদনার সম্যক পরিচয় পান নি।

পাণ্ডবরা যাত্রা করেছিলেন অপরাহ্ণে। কিছুদূর যাওয়ার পরই সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। সম্মুখে বিপুলা নদী! সে রাত্রে সবাইকে নিয়ে পার হওয়া দুঃসাধ্য। অগত্যা ওঁরা সেখানেই যাত্রা স্থগিত রেখে নদীতে স্নান করে সারাদিনের অনাহার

ও মনোকষ্টের ক্লান্তি কিছুটা অপনোদন করলেন। ইতিমধ্যে এক বিশাল বটবৃক্ষ পাওয়া গিয়েছিল, তারই পত্রছায়ায় রাত্রি অতিবাহিত করা স্থির হ'ল। আহার্যের কোন ব্যবস্থা নেই, আহার্যে প্রবৃত্তিও নেই কারও, অঞ্জলিবদ্ধ নদীজল পান করেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করলেন।

কিন্তু নদীতীরের সে স্থান জনবিরল হলেও জনশূন্য নয়। অরণ্য তো নয়ই। পাণ্ডবদের ভাগ্য-বিপর্যয় ও সেখানে অবস্থানের কাহিনী প্রচারিত হ'তেও বিলম্ব হ'ল না। দেখতে দেখতে বহু সাধু-তপস্বী এসে সমবেত হলেন। তাঁরা ওঁদের ভোজন বা শয্যার কোন ব্যবস্থা করতে পারলেন না বটে কিন্তু ওঁদের ঘিরে বেদগান, স্তোত্রপাঠ ও হোম ইত্যাদি করে তাঁরাও সারারাত জেগে রইলেন।

আর ইত্যবসরে—সাধারণ গৃহস্থ বা কৃষক প্রজারা প্রতিনিবৃত্ত হলেও বহু ব্রাহ্মণ সারা রাত পথ চলে এসে আবারও পাণ্ডবদের সঙ্গে মিলিত হলেন।

অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরের দুঃখের সঙ্গে দুশ্চিন্তা যোগ হ'ল। যদি সত্যই এতগুলি লোক ওঁদের অনুগামী হন—তাঁদের খাওয়াবেন কি ?

পূর্ব রাত্রের সমাগত তপস্বীদের মধ্যে বিখ্যাত শৌনক মুনিও ছিলেন। যুধিষ্ঠিরকে নিরতিশয় উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল দেখে তিনি এসে সান্ত্বনা দিলেন। বললেন, 'মহারাজ, মানুষের জীবনযাত্রায় সহস্র শোকস্থান ও শত শত ভয়স্থান আছে। এগুলি মূর্খকেই আকুল ও অবসন্ন করে। জ্ঞানী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিকে তা কদাচ অবদমিত করতে পারে না। বুদ্ধি হচ্ছেন সর্বদুঃখবিঘাতিনী, সেই অষ্টাঙ্গ বুদ্ধি ও জ্ঞান আপনার মধ্যে অবস্থিত আছেন। আপৎকালে শারীরিক কি মানসিক দুঃখে বিষণ্ণ হওয়া আপনাতে শোভা পায় না। জ্ঞানী ব্যক্তিরা অসন্তোষ ও অভাববোধকে কখনও প্রশ্রয় দেন না। আসক্তি বা প্রিয় বস্তুতে অতিরিক্ত স্পৃহাই মানসিক দুঃখের মূল। আপনি ধর্ম ব্যতীত তাবৎ বস্তুতেই স্পৃহা ত্যাগ করুন—শান্তি লাভ করবেন।'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'মুনিবর ! আমার নিজের জন্য আমি অর্থ বা বস্তুতে স্পৃহা কি অভাববোধ প্রকাশ করছি না। এই অতিরিক্ত প্রীতিপরায়ণ সহগামীদের জন্যই অর্থ বা সম্পদের কথা চিন্তা করছি। এঁদের আহারের ব্যবস্থা কী হবে ?'

শৌনক বললেন, 'মহারাজ, যে ভাগ্য আপনাকে অকস্মাৎ সর্বরিক্ত নিঃস্ব করেছে, সেই ভাগ্যই এতগুলি অনুগামীকে প্রেরণ করেছে—আপনাকে পরীক্ষা করার জন্য। অদৃষ্ট প্রবল, মানুষ বিত্ত বা শাস্ত্র দিয়ে তার বিধান খণ্ডন করতে পারে না। সে তার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে পারে মাত্র। আপনারা এই অপ্রত্যাশিত অতিথিদের সেবার জন্য আপনাদের যথাসাধ্য করুন, সে-ই

যথেষ্ট। এঁরা আপনার নিমন্ত্রিত নন, ভোগবিলাস-পরিপূর্ণ প্রাসাদেও বাস করতে আসেন নি। শারীরিক কষ্টের জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছেন। ওঁরাও খাদ্য সংগ্রহে উদাসীন থাকবেন না। শুনেছি মনস্বিনী দ্রৌপদী সুগৃহিণী, সংসার-কর্মের সকল দিকেই তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, তিনি পরিশ্রমপরায়ণাও। মহারাজ, সুগৃহিণীর হস্তে সংসারের দায়িত্ব ন্যস্ত করার সুযোগ পাওয়াই মহা সৌভাগ্যের কথা। আপনি সেই সুদুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী। আপনি অকারণেই ব্যস্ত ও চিন্তান্বিত হচ্ছেন। আপনার ভ্রাতাদের উপরেই মাংস প্রভৃতি খাদ্য সংগ্রহের ভার অর্পণ করুন, অতিথিদের আনুকূল্য গ্রহণ করতেও কুণ্ঠা বোধ করবেন না—দ্রৌপদী তাঁদের ভোজনের সুব্যবস্থা করবেন, আপনার অরণ্যবাস নিশ্চিত রূপেই নির্বিঘ্ন ও সুযাপিত হবে।'

যুধিষ্ঠির স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'আমি ধন্য যে আপনি অযাচিত ভাবে এসে আমাকে নিশ্চিন্ত করলেন।'

শৌনক পুনশ্চ বললেন, 'আপনি বনবাস থাকাকালীন প্রত্যহ সূর্যস্তব করবেন। সূর্যই সকল শক্তির আদি কারণ, তিনি আপনাকে এই দুঃসময় উত্তরণের শক্তি দান করবেন।'...

সে রাত্রি অতিক্রান্ত হলে এঁরা প্রত্যুষেই আবার যাত্রা আরম্ভ করলেন। সেখান থেকে পদব্রজে তিন দিনের পথ কাম্যক বন। হিংস্র শ্বাপদ ও বর্বর রাক্ষস-সমান অরণ্যচারী কিছু মানুষ থাকা সত্ত্বেও ওঁরা সেই বনেই অবস্থান শ্রেয় বলে বোধ করলেন। শিকার-যোগ্য পশু অসংখ্য, অর্থাৎ খাদ্যের অভাব হবে না। তা ব্যতীত প্রয়োজন মতো সেখান থেকে আত্মীয় বান্ধব ও স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে। রাজধানীর বার্তা পাওয়াও কঠিন হবে না।

সেই মতো তাঁরা কাম্যক বনেই গিয়ে বসবাসের যোগ্য পর্ণকুটিরাদি নির্মাণে ব্রতী হলেন। এ কাজে সমাগত অনুরক্তজনেরা প্রচুর সহায়তা করতে লাগলেন। ভীম ও অর্জুন যতদূর সম্ভব হিংস্র পশু ও হিংস্রতর মানুষ বধ করে অরণ্যকে নিরাপদ করে তুলতে লাগলেন।

এ পর্যন্ত বাসুদেবের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয় নি, তাঁর সংবাদও পান নি এঁরা। মাসাধিককাল পরে অকস্মাৎই একদিন তিনি সদলবলে এসে উপস্থিত হলেন। ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয়গণ তাঁদের এই দুর্দশার সংবাদ পেয়ে ব্যস্ত ও ব্যাকুল হয়ে সংবাদ নেওয়ার জন্য যাত্রা করেছেন—ঠিক তার

অব্যবহিত পূর্বে বাসুদেব শাল্ব বধ করে প্রত্যাবৃত্ত হলেন এবং বিশ্রামের চেষ্টা মাত্র না করে তন্মুহূর্তে তাদের সঙ্গ নিলেন। যাদবদের সঙ্গে আরও এসে মিলিত হলেন দ্রৌপদীর পিতৃগৃহের আত্মীয়গণ, শিশুপালের পুত্র চেদীরাজ ধৃষ্টকেতু এবং কেকয় রাজপুত্ররা।

পাণ্ডবদের দুরবস্থার সংবাদ শুনেই ওঁরা এসেছেন, তবু বোধ করি ঠিক এতখানি নিঃস্বতা, সর্বাঙ্গীণ দৈন্য ও ক্লেশ-ভোগের দৃশ্য দেখার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। সকলেই ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন।

কিন্তু সর্বাধিক উত্তেজিত দেখা গেল বাসুদেবকে। তিনি প্রচণ্ড রুষ্ট হয়ে যেন তৎক্ষণেই সর্বলোক দগ্ধ ও ধ্বংস করবেন—এইরূপ বোধ হ'তে লাগল। বললেন, 'রণভূমি দুরাত্মা দুর্যোধন দুঃশাসন কর্ণ ও শকুনির শোণিত-সিক্ত না হওয়া পর্যন্ত আমার শান্তি নেই। অনাবশ্যক বিলম্বে প্রয়োজনই বা কি? চল আমরা এখনই যুদ্ধযাত্রা করে ওদের সবংশে সপরিজনে নিহত করি। পাণ্ডবদের তাদের স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করি।'

বলদেব প্রভৃতি যাদবরা তো প্রস্তুতই, তবু তাঁর সেই কালানল-সন্নিভ ক্রোধবহ্নি প্রজ্বলিত দেখে একটু ভীতও হলেন। নিদারণ ভীত বোধ করতে লাগলেন অন্যান্য ব্যক্তিরা।

অর্জুন তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা ক'রে বললেন, 'বাসুদেব, আমরা পণে বদ্ধ—এখন যুদ্ধযাত্রা করলে প্রতিজ্ঞাভঙ্গের পাপ হবে, প্রজাদের চোখে আমরা লুব্ধ ও সেই কারণে হেয় প্রতিপন্ন হব। বিশেষ আর্য যুধিষ্ঠির মিথ্যাচারী বলে গণ্য হবেন। যুধিষ্ঠির তা কদাচ সহ্য করবেন না। এ কার্য সম্ভব হলে আমরা তন্মুহূর্তেই ঐ পাপিষ্ঠদের বধ করতাম। এই আয়ুক্ষয়কারী মনোক্ষোভ সহ্য করার কোন কারণ থাকত না। তুমি শান্ত হও, তুমি সর্বশক্তিমান, তুমি ক্রুদ্ধ হলে জগৎ-সংসার ধ্বংস হয়ে যাবে।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'অর্জুন, তুমি আর আমি অভিন্নাত্মা। যুগযুগান্তর ধরে, জন্মজন্মান্তরে আমরা বন্ধু ও আত্মীয়। তোমার কেউ কোন অনিষ্ট বা ক্ষতি করলে সে ক্ষতি আমারই করা হয়। ওদের শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত আমি শান্ত হতে পারব না।'

অর্জুন বললেন, 'কাল মনের মতোই প্রায় দ্রুতগামী, ত্রয়োদশ বর্ষ অতিবাহিত করা এমন কিছু কঠিন বা দুঃসাধ্য হবে না। তারপর তুমি ও আমি এই সমস্ত দুঃখের শোধ নেব। তুমি ততক্ষণ ধৈর্য ধরে থাক, আমি মিনতি করছি।'

যুধিষ্ঠির বিষণ্ণ বদনে বললেন, 'বাসুদেব, তোমার সঙ্গে পরিচয় হওয়া পর্যন্ত বিপদে সম্পদে তোমার উপদেশ পেয়ে আসছি। কখনও তোমার পরামর্শ উপেক্ষা করি নি। কিন্তু ভাগ্য এমনই বিরূপ যে এই ঘোর দুর্দিনে তোমার উপদেশ নির্দেশ থেকে বঞ্চিত হলাম। কোন রূপেই তোমার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা গেল না। আমি বায়ুগতি অশ্ব প্রেরণ করেছিলাম, সে বহু চেষ্টা করেও তোমার অবস্থিতি-স্থান অবগত হতে পারল না। এতেই বোধ করছি আমাদের এ দুঃখ-ভোগ নিতান্তই অবধারিত অদৃষ্টলিপি।'

শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁর অভ্যস্ত অপূর্ব শব্দজাল-রচনা ও বর্ণনাকৌশলে তাঁর অনুপস্থিতির (একরূপ অজ্ঞাতবাসই বলা চলে) কারণ বিস্তার করলেন। শাল্ব যে কী পরিমাণ পাপাচারী ক্রূর ও নিষ্ঠুর, অকারণেই শত্রুতাবদ্ধ; বাসুদেবের ইন্দ্রপ্রস্থ অবস্থানকালে কী ভাবে দ্বারকার উৎসাদন, পুরবাসীদের নিগ্রহ এবং অন্তঃপুরিকাদের অবমাননা করেছে; তার বর্বর সৈন্যদল বালিকা-বয়স্কা নির্বিশেষে সম্ভ্রান্ত যাদব নারীদের সতীত্বনাশ ও তাদের উপর অকথ্য নির্যাতন করেছে—তার বাস্তব দৃশ্যমান বিবরণ দিয়ে বললেন, 'সে দানব বা পিশাচবৎ আচরণ ও দুরাচারের প্রতিফল না দেওয়া পর্যন্ত আমি গৃহে প্রত্যাবর্তন বা বিশ্রাম করব না এই প্রতিজ্ঞা করেই দ্বারাবতী থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিলাম। অপর কোন যোদ্ধা বা শূর হ'লে আমার বিলম্ব হ'ত না—কিন্তু শাল্ব মায়াবী, কূটকৌশলী, শৌর্য বা যুদ্ধরীতিতে অবিশ্বাসী; উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য কোনো অনাচার বা ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বনেই দ্বিধাবোধ করে না। সে দক্ষ যান্ত্রিকও, সে এমন এক নভোচর যান নির্মাণ করেছিল—ভূমিতলে এমন কি জলেও যার অবাধগতি। তার সৈন্যদের নিগৃহীত বা পরাজিত করা কঠিন হয় নি কিন্তু সে দুরাত্মাকে বধ করতে আমার বহু কালক্ষয় হয়েছে। সে নানাবিধ মায়া বিস্তার করে আমাকে বহু দূরে সাগর-তীরবর্তী নির্জন প্রদেশে নিয়ে গিয়েছিল, সেখানে সমুদ্রের উপর শূন্যে অবস্থিত সৌভবিমানে আত্মগোপন ক'রে অদৃশ্য থেকে অবিরাম অস্ত্র বর্ষণ করতে লাগল। আমার বিখ্যাত শার্ঙ্গধনু থেকে নিক্ষিপ্ত অস্ত্রও অত ঊর্ধ্বে তার বিমান স্পর্শ করতে পারল না। তখন আমি উগ্র ভয়ঙ্কর ও সুদূরগামী অস্ত্র সকল প্রয়োগ করলাম। তার বিমান নগরীর তুল্য বৃহৎ, দুর্গের ন্যায় সুদৃঢ় কিন্তু আমার সেই সকল অস্ত্রাঘাতে তার অনেকাংশ বিনষ্ট হ'ল এবং ওপক্ষের বহু যোদ্ধা আর্তনাদ করতে করতে মহার্ণবে নিপতিত হ'ল।'

শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা-কৌশলে সকলে মুগ্ধ, চিত্রার্পিতবৎ এই কাহিনী শুনছিলেন, তিনি এখন ঈষৎ এক মুহূর্ত দূরাবস্থিতা পাণ্ডবমহিষীর দিকে তাকিয়ে নিয়ে পুনশ্চ

কাহিনীর সূত্র অবলম্বন করলেন, 'এবার ঐ দুরাত্মা দানব অন্য কৌশল অবলম্বন করল। বোধ হয় পূর্বেই সে এ পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত হয়ে ছিল, উগ্রসেনের এক ভৃত্যকে প্রচুর উৎকোচে বশীভূত করে তাকে এই কুকার্যে প্রবৃত্ত করেছিল, সে ব্যক্তি আমাকে এসে সংবাদ দিল যে বসুদেব নিহত হয়েছেন, যাদব-প্রধানগণ অধিকাংশই বন্দী এবং দানব সৈন্যরা দ্বারকা অধিকার করেছে। আমি যেন অবিলম্বে সেখানে প্রত্যাবর্তন করি। লোকটি আমার পরিচিত, পুরাতন সেবক। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই আমি বিহ্বল হয়ে পড়লাম। কিন্তু কাল যখন পূর্ণ হয় তখন নিয়তি দুর্মতি রূপে আত্মপ্রকাশ করে। অতি কৌশল ও অধিক ব্যগ্রতাই শাল্বর নিয়তি রূপে তার বিনাশে অগ্রসর হ'ল, সহসা দেখলাম আমার পিতা বসুদেব হস্তপদ প্রসারিত করে বিমান থেকে সমুদ্রে নিপতিত হচ্ছেন। তখনই বুঝলাম এ মায়া, মিথ্যা। নিশ্চয়ই নিষ্ঠুর ক্রূর শাল্ব বসুদেবের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়ে কোন অনুচরকে এই ভাবে নিক্ষেপ করল—নিশ্চিত মৃত্যু-মুখে। বসুদেব দ্বারকায় নিহত হলে সে দেহ এ বিমানে আসবে কিরূপে? তখন আমি—এ পাপকে অধিকতর অগ্রসর হতে দেওয়া উচিত নয় এই বোধেও বটে —এবং অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হয়েও—সাক্ষাৎ কৃতান্ত-তুল্য আমার মন্ত্রঃপূত সুদর্শন চক্রাস্ত্র ত্যাগ করলাম। সে অস্ত্র তৎক্ষণাৎ প্রলয়কালীন সহস্রগুণতেজসম্পন্ন সূর্যের ন্যায় গগনপথে উত্থিত হয়ে ক্রকচ* যেভাবে কাষ্ঠকে বিদারিত করে সেই-ভাবেই বিশাল সৌভবিমানকে দ্বিখণ্ডিত ও শাল্বকে বধ করল। সেই অবিশ্বাস্য নিদারুণ ঘটনা প্রত্যক্ষ করার পর ওর পাপ অনুচরদের আর মনোবল রইল না। তারা ভীত হয়ে—করাল মৃত্যু তাদের পশ্চাতে ধাবমান এই কল্পনায় হাহাকার করতে করতে পলায়ন করল।'

শাল্বর সঙ্গে যুদ্ধের এই লোমহর্ষক বিবরণ সমাপ্ত ক'রে বাসুদেব বললেন, 'এই কারণেই আপনার দূত আমার কাছে উপস্থিত হতে পারে নি। আমি ও সংবাদ পেলে অবশ্যই আপনাকে নিবৃত্ত করতাম। শেষ পর্যন্ত, প্রয়োজন হলে বলপ্রয়োগ করেও এ কপট ক্রীড়া বন্ধ করতাম।···সবই দৈব। এক্ষণে যা ঘটবার তা তো ঘটেই গিয়েছে, আপনার অঙ্গীকৃত স্বীকৃত পণের ত্রয়োদশ বর্ষ অতিবাহিত হলে যে ভয়ঙ্কর কাণ্ড সংঘটিত হবে—তা বহুকাল পর্যন্ত পাপীদের মনে ত্রাসের কারণ হয়ে থাকবে।'

পাণ্ডবদের আশ্বস্ত ও তাঁদের গোপন অভিমান প্রশমিত ক'রে বাসুদেব নত

* করাত।

বদনে পাঞ্চাল-তনয়ার কাছে এসে ওঁরই অজিনাসনের একপার্শ্বে উপবেশন করলেন।

দ্রৌপদী এতক্ষণ স্থির ও নীরব হয়ে ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের অত্যাশ্চর্য শাল্বনিগ্রহ বিবরণ* উপস্থিত সকল শ্রোতাকে অভিভূত করলেও—মনে হ'ল তাঁর সেই অপূর্ব বর্ণনা-কৌশল দ্রুপদনন্দিনীকে বিশেষ বিচলিত করতে পারে নি। বরং অতি সূক্ষ্ম এক হাস্যরেখা ওঁর অধরোষ্ঠে আবদ্ধ থেকেও এক ধরনের কৌতুকানুভূতিই প্রকাশ করছিল।

এবং—অপাঙ্গদৃষ্টিনিক্ষেপকারী সে ঈশ্বরাত্মা কথকও সে সম্বন্ধে অনবহিত ছিলেন না। নত দৃষ্টি সেই কারণেই। বালকের কৌশল অবলম্বনের স্থূল প্রচেষ্টা অভিভাবকের কাছে স্পষ্ট হয়ে পড়ার অপ্রতিভতার মতোই একটু সলজ্জ হাসিও ফুটে উঠেছিল বোধ করি বিশ্ববিমোহন তাঁর সে মুখে।

দ্রৌপদী এই নিভৃত ক্ষণটিরই অপেক্ষা করছিলেন।

বাসুদেব মৃদু স্বরে 'প্রিয় সখী' বলে সম্বোধন করতেই তিনি সক্ষোভে সরোদনে বলে উঠলেন, 'লোকে বলে তুমি সর্বভূতের ঈশ্বর, সর্বজ্ঞ সর্বত্র বিরাজমান। তুমি আমাকে সখী সম্বোধন করেছ সেই অভিমানেই আমার মনোদুঃখ তোমাকে নিবেদন করছি। আমি বিশ্বত্রাস মহাবল পাণ্ডবদের ভার্যা, তোমার প্রিয়সখী, অনলাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগ্নী—তৎসত্ত্বেও দুঃশাসন আমাকে অনায়াসে কুরুসভায় টেনে নিয়ে গেল। একমাত্র-বস্ত্র শোণিতাক্ত, সেই অবস্থার কথাও কেউ চিন্তা করল না। লজ্জায় ক্ষোভে রোষে কম্পমানা আমাকে দেখে ধৃতরাষ্ট্রের দুর্মতি পুত্রগণ কৌতুকহাস্য করল এবং নানাবিধ কদর্য ইঙ্গিত করতে লাগল। পাঞ্চাল ও বৃষ্ণি বংশ জীবিত থাকতেও এ দুর্গতি রোধ হ'ল না! ধার্তরাষ্ট্রেরা নির্ভয়ে আমাকে দাসীরূপে সম্ভোগ করতে চাইল। সে সময় তোমার সুদর্শন কোথায় ছিল? কোথায় ছিল তোমার এ আস্ফালন ও মহাবীর্য?···ধিক্ তোমার সে দৈব অস্ত্র, ধিক্ ভীমসেনের গদা, ধিক্ অর্জুনের গাণ্ডীব ধনু! তাঁদের ধর্মপত্নীকে নীচজনে পীড়ন করতে লাগল, তাঁরা স্থাণুবৎ বসে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। দীনতম প্রজার কুলনারীর মর্যাদা রক্ষা করাও রাজার কর্তব্য—তাই না? স্বামী দুর্বল হলে স্ত্রীকে রক্ষা করার জন্য প্রাণ দেয়—গুরুজনদের মুখে শুনেছি এ-ই সনাতন ধর্ম! ধর্মরাজ নামে খ্যাত আমার স্বামী আমাকে রক্ষা করার কোন চেষ্টাই করলেন না। সকলের সামনেই দুঃশাসন আমার কেশাকর্ষণ করল, বিবস্ত্র করতে চাইল! সেই দিনই বুঝেছি আমার

* এখানে তার সার মর্ম মাত্র দেওয়া গেল।

কেউ নেই।'*

শ্রীকৃষ্ণ এবার মুখ তুলে এক প্রকারের গভীর দৃষ্টি দ্রৌপদীর দৃষ্টিতে নিবদ্ধ করলেন। বললেন, 'মনস্বিনী, তুমি যাদের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছ, তারা ইতিমধ্যেই মৃত্যুপুরীর দ্বারপথে পৌঁছে গেছে। সাক্ষাৎ যমরাজ ইচ্ছা করলেও আর তাদের রক্ষা করতে পারবেন না। তোমার এক এক বিন্দু অশ্রু কৌরবরমণীদের সহস্র বিন্দু অশ্রুর কারণ হয়ে রইল। আমি এই সত্য প্রতিজ্ঞা করছি তুমি আবার পূর্ণ গৌরবে ভারত-সম্রাজ্ঞী রূপে সিংহাসনে উপবেশন করবে। যদি আকাশ ভূলুণ্ঠিত হয়, হিমালয় চূর্ণ হয়, পৃথিবী ধূলিকণায় পরিণত হয়, সমুদ্র মরুভূমি হয়ে যায় তথাপি আমার বাক্য মিথ্যা হবে না।'

দ্রৌপদীও স্থির নিশ্চল দৃষ্টিতে তাঁর চোখের দিকে চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে বললেন, 'বাসুদেব, তুমি আর যার মনেই প্রতীতি সঞ্চার ক'রে থাকো, যত শব্দঝঙ্কারগুঞ্জিত অপূর্ব বাগ্‌জালই বিস্তার করো—আমাকে প্রতারিত করতে পারবে না, পারো নি। আমি জানি তোমার ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হয় নি, তোমার অজ্ঞাতসারে এ সব ঘটনা ঘটে নি। তুমি ইচ্ছাপূর্বক দূরে গিয়েছিলে।···আমার বিশ্বাস তুমি আমার এই দুর্গতিতে খুশী হয়েছ। সত্য ক'রে বলো।'

'হ্যাঁ, তা হয়েছি।' নির্দ্বিধায় উত্তর দিলেন শ্রীকৃষ্ণ, 'তোমার কাছে গোপন করব না। এর প্রয়োজন ছিল।'

দ্রৌপদীর অনুমানই সত্য প্রতিপন্ন হ'ল, তবু বোধ হ'ল এ উত্তরের জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। সবিস্ময়ে বলে উঠলেন,প্রয়োজন ছিল? প্রয়োজন! আমার এই দুঃসহ কষ্টের এই অবর্ণনীয় লাঞ্ছনার 'প্রয়োজন ছিল? এই অকারণ অঘটিতপূর্ব অবমাননার? তার অর্থ? আমি কি অপরাধ করলাম?'

বাসুদেব হাসলেন, বহুপরিচিত সেই মধুর দুর্জ্ঞেয় হাসি। বললেন, 'প্রিয়সখী, রথ যখন বন্ধুর উপলাস্তৃত পথে ধাবিত হয়, তখন পথের কর্কশ প্রস্তরে ঘর্ষিত হয়ে তার চক্র-যুগলের কত ক্লেশ হয় ভাবো দেখি! তাদের লৌহ-বেষ্টনীও প্রতিমুহূর্তে ক্ষয় পেতে থাকে। সে তীব্র দ্রুত ঘর্ষণে যে বহ্নিস্ফুলিঙ্গ নিক্ষিপ্ত হয়

* মৃদুভাষিণী কৃষ্ণা পদ্মকোষতুল্য হস্তে মুখ আবৃত ক'রে সরোদনে বললেন, 'মধুসূদন, আমার পতি নেই, পুত্র নেই, বান্ধব ভ্রাতা পিতা নেই—তুমিও নেই। ক্ষুদ্রেরা আমাকে নির্যাতিত করেছে, তোমরা শোকশূন্যের ন্যায় তা উপেক্ষা করেছ। তখন কর্ণ যে আমাকে উপহাস করেছিল সেই দুঃখও আমার দূর হচ্ছে না। কেশব আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক আছে, তোমার যশোগৌরব আছে, তুমি সখা ও প্রভু (নিগ্রহ অনুগ্রহ সমর্থ)—এই চার কারণে আমাকে রক্ষা করা তোমার উচিত।' [মহাভারত রাজশেখর বসু]

দুই দিকে—তাতে কত না কীটপতঙ্গাদি দগ্ধ হয়। এদের অপরাধ কি বলতে পারো? যাত্রার প্রয়োজন সেই চিন্তাটাই রথী সারথির মনে অগ্রগণ্য হয়ে থাকে, রথ কিংবা তার নেমি কি চক্রের কথা কে মনে রাখে? অশ্বদের শষ্পশষ্প দেয়, পানীয় দেয়—মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম করায়—সেও ঐ যাত্রারই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য, অশ্ব সুস্থ না থাকলে রথ আকর্ষণ করবে কে? চক্র একেবারে ভগ্নদশা প্রাপ্ত হলে সেখানে অপর চক্র সন্নিবিষ্ট করে--তার পূর্ব পর্যন্ত চক্রের অস্তিত্বই কারও মনে থাকে?'

'তুমি আমাকে সামান্য রথচক্রের সঙ্গে তুলনা করলে?'

দ্রৌপদী সাভিমানে ক্ষুণ্ণস্বরে প্রশ্ন করলেন।

শ্রীকৃষ্ণর দুই নেত্র তখন অর্ধ নিমীলিত হয়ে গেছে, গম্ভীর গদগদ কণ্ঠে তিনি উত্তর দিলেন, 'সাধ্বী, মহাকালের বিজয়রথ ধাবিত হয়েছে তুমি দেখতে পাচ্ছ না, আমি প্রত্যক্ষ করছি। তুমি তার চক্রও নও। অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। শুভ বুদ্ধি ও দৃঢ় সঙ্কল্পই তার দুই চক্র। তবে যে বিরাট উদ্দেশ্যে এই মহান যাত্রা, তাতে সে রথের ক্ষুদ্রতম অংশ হওয়াও গর্বের কথা। ভামিনী, দুঃখ-লাঞ্ছনা তো তুচ্ছ—তোমার প্রাণ নিলেও যদি সে উদ্দেশ্য সাধিত হয়—তা নিতেও মুহূর্ত-মাত্র দ্বিধা করব না।'

বলতে বলতে তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর মুখমণ্ডল এক অবর্ণনীয় দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সেদিকে চেয়ে থাকা যায় না—মুগ্ধ বিস্ময়ে কিছুটা বা শঙ্কিতভাবে চেয়ে থাকার চেষ্টা ক'রে দ্রৌপদী বললেন, 'কী সে বিরাট মহান উদ্দেশ্য তা জানবারও কি অধিকার নেই আমাদের? শুধুই পিষ্ট হব, ঘর্ষিত হব—হয়ত বা বিনষ্ট হব?'

'না। এ আমার সাধনা—সাধনার কথা গোপন রাখতে হয়। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে সমগ্র বিশ্ববাসীই তা জানবে, অনুভব করবে—সে সময় তুমিও জানবে। হয়ত আরও বিস্তর দুঃখের মূল্যেই তা জানতে হবে। কিন্তু উপায় কি?'

তারপর যেন কিছুটা সহজ হবার স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টাতেই ঈষৎ কৌতুক-স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে দ্রৌপদীর মুখের দিকে চেয়ে বলেন, 'এই যে রথে চড়ে অরণ্যময় বন্ধুর পথে এসেছিলে—তখন তুমি কি চক্রের, অশ্বের বা রথের অনুমতি নিয়েছিলে?…শোন দ্রৌপদী, একটা কথা তোমাকে বলতে পারি, আমিও এই নির্মম মহা-যাত্রার প্রয়োজনেই এসেছি, আমার এ তপস্যা বা সাধনাও তাই পূর্বনির্দিষ্ট। আমিও যন্ত্র, যন্ত্রী নই। নইলে কংসের কারাগারে জন্মগ্রহণ করে জীবনের সেই প্রথম দণ্ডেই জাতিভেদের সংস্কার ছিন্ন করতে হবে কেন? ক্ষত্রিয়-

পিতা বসুদেব কারাগৃহের দ্বার উন্মুক্ত পেয়েও পলায়ন করতে বা কোন ক্ষত্রিয় গৃহে রাখতে সাহস করেন নি কেন? কেন বৈশ্যের অন্নে প্রতিপালিত হবার জন্য গোপগৃহে রেখে এলেন? কিশোর বয়সে একাকী, নিরস্ত্র—সেই কংসকে বধ করার সাহস পেলাম কি রূপে? অলস, আসবাসক্ত স্বভাবভীত যাদবদের সংহত ক'রে স্বল্পমাত্র সহশক্তির দ্বারা অষ্টাদশবার জরাসন্ধের প্রচণ্ড শক্তি প্রতিহত করার প্রেরণা কে দিল আমাকে? নিতান্ত বালক বয়সে ইন্দ্রের স্বেচ্ছা-চারিতার প্রতিবাদ ও প্রতিকার করার শক্তি পেলাম কেমন ক'রে? মাত্র দুটি লোক নিয়ে জরাসন্ধের পুরপ্রবেশ করলাম কোন্ অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে? পাঁচটি তরুণ অনভিজ্ঞ ভিক্ষুক রাজনন্দিনীকে লাভ ক'রে অত্যল্পকাল মধ্যে সমগ্র ভারতের সম্রাটরূপে, একছত্র অধিপতিরূপে স্বীকৃত হলেন— এর মধ্যে কি সেই বিশ্বচিন্তা, নিয়তি বা মহাকালের অদৃশ্য হস্ত দেখতে পাও নি? আজ সেই নিয়তিই যদি অকথ্য লাঞ্ছনার আয়োজন ক'রে থাকেন, সেই মহারাজ-চক্রবর্তীদের অরণ্যবাসী ভিক্ষুকে পরিণত করেন আবার—তাতে বিস্মিত কি ক্ষুব্ধ হও কেন? শুধু জোড়-করে নিমীলিত নেত্রে তাঁর বিরাট ইচ্ছার কাছে মাথা নত করো, ভীষণা নির্বৃতিকে প্রণাম ক'রে তাঁর দ্বারা পিষ্টদলিত হবার, তাঁর প্রয়োজনে প্রাণ দেবার জন্য প্রস্তুত হও।'

॥ প্রথম পর্ব সমাপ্ত ॥

শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের [illegible] ছিলেন যখন সবাই
[illegible] প্রকাশের
[illegible] সেই শ্রীকৃষ্ণ [illegible] জন্মেছিলেন এবং
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় [illegible] প্রধান নায়ক—
তখন ব্যক্ত করে যে যুদ্ধের [illegible] অধর্মের অভ্যুত্থান
ভারতবর্ষই ঘটেছিল, [illegible] অভ্যন্তরে প্রাকারে
দ্বারে কণ্ঠে কাঁটা হয়ে উঠেছিল [illegible] যথা ক্ষাত্রশক্তি
ক্ষোভ অসূয়া দ্বেষ হিংসা [illegible] অহংকার ও আত্মনাশা
বুদ্ধিতে আচ্ছন্ন, [illegible] হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ কি
ভারতকে শুধু [illegible] থেকে
উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন? চেয়েছিলেন কি [illegible]
মদগর্বিত নির্বোধ নিকৃষ্ট [illegible] হাত থেকে দেশের
শাসনক্ষমতা কেড়ে নিয়ে শূদ্র, কৃষিজীবী এবং মানুষের হাতে
দেশের ভার তুলে দিতে? বর্ণাশ্রম বা গোষ্ঠীস্বার্থের
অপেক্ষা সাধারণ মানুষের কল্যাণ ও হিতসাধনকে শাসন-
ক্ষমতার প্রধান লক্ষ্য করে তুলতে চেয়েছিলেন কি শোষিত
নিপীড়িত মূক [illegible] সেই সব সাধারণ মানুষদেরই সংঘ-
শক্তিকে শাসন-শক্তিতে রূপান্তরিত করতে? এইজন্যই কি
তাঁর বিখ্যাত যোধক শঙ্খের অন্য কোনো নাম না দিয়ে
পাঞ্চজন্য রাখা হয়েছিল? সেইজন্যই কি তিনি রাজসূয়
যজ্ঞে সাধারণ মানুষদের পাদ প্রক্ষালনের ভার নিয়েছিলেন?